BIR

আনন্দবাজার পত্রিকা সংকলন

কাশ্মীর

ভূমিকা

ভারত-পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সংঘর্ষ সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকা প্রতিষ্ঠান একটি বই প্রকাশ করছেন জেনে আনন্দিত হলাম। তাঁদের আমি অভিনন্দন জানাই। যুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য, প্রতিদিনের নানা ঘটনা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সমস্যার বিবরণসহ এমন একটি পুস্তক প্রকাশের প্রয়াস নিশ্চয় উৎসাহযোগ্য। বাঙালী পাঠকদের জন্য আনন্দবাজার পত্রিকা যা করছেন, সে-কাজ ভারতের অন্যান্য ভাষাঞ্চলের পাঠকদের জন্যও করা প্রয়োজন।

তেইশটি ঘটনাকীর্ণ দিনের ইতিহাস অবশ্যই প্রতি ভারতীয়ের পুংখানুপুংখরূপে জানা দরকার। শুধু তা-ই নয়, সেইসঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের আগেকার ঘটনা-প্রবাহ সম্পর্কেও আমাদের স্পষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। আমাদের জানতে হবে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য কীভাবে আমরা বার বার অপর পক্ষের নিকট আবেদন জানিয়েছিলাম, কীভাবে সমানে আমরা শান্তিরক্ষার চেষ্টা করে গিয়েছি। পাকিস্তান কিন্তু তার রণসজ্জা এবং অস্ত্রশক্তির উপর ভরসা করে তার মরজি আমাদের উপর চাপাতে চেয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সীমানা লঙ্ঘন করে আমাদের দেশের উপর আক্রমণ করেছে। লাহোর অভিমুখে আমাদের সৈন্যবাহিনীর অভিযান অতএব জরুরী হয়ে পড়েছিল।

পাকিস্তানের কোনও অঞ্চল আত্মসাৎ করবার এতটুকু বাসনা কোনও আমাদের ছিল না। আমাদের লক্ষ্য ছিল সীমাবদ্ধ। পাকিস্তানের সমর-শক্তির উপর আমরা আঘাত হানতে চেয়েছিলাম যাতে পাকিস্তানী রণ-যন্ত্রবাহিনী আমাদের দেশের মাটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারে। যে-সব খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হল, সেগুলিতে আমাদের সৈন্যবাহিনী অসামান্য গৌরবময় বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। সাহস, দৃঢ় মনোবল এবং উন্নত রণকৌশলের মাধ্যমে তারা পাকিস্তানী রণোপকরণ এবং সৈন্য-শক্তির উপর গুরুতর আঘাত হেনেছে। তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ।

এখন এক ধরনের যুদ্ধ-বিরতির অবস্থা চলছে। কিন্তু পাকিস্তান এখনও তার উদ্দেশ্য এবং মতলবে কোনও পরিবর্তনের প্রমাণ দেয়নি। তার সেনাবাহিনী ছদ্মবেশী সৈন্যরা যুদ্ধ-বিরতির শর্ত ভংগ করেই চলেছে। আমাদের তাই সতত সতর্ক থাকতে হবে। যে-কোনও অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতিও চাই।

এই বিষয়গুলি প্রতি ভারতীয়কে অবশ্যই জানতে হবে। এ-সবই অবশ্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী সংসদে এবং অন্যান্য জনসভায় বার বার বলেছেন। তবু জনসাধারণের ঘটনার সমগ্র পবিপ্রেক্ষিতটি সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা উচিত। আশা কবি, এই পুস্তকটি সেই ব্যাপাবে তাঁদেব সাহায্য কববে।

মুখবন্ধ

আঠারো বছর আগে সারা বিশ্বের নজর হঠাৎ একদিন পড়ে কাশ্মীরে। আঠারো বছর পরে আবার। তাকে নিয়ে বিস্ময় উত্তেজনার অন্ত নেই, সংবাদ-পত্রের শিরোনামায় নিয়ত তার প্রস্থান ও প্রবেশ। কাশ্মীর-উপাখ্যান এবার আলোড়ন সৃষ্টি করেছে আরও বেশি। ভারতের এই অঙ্গরাজ্যটিকে উপলক্ষ্য করে অবশেষে ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে সশস্ত্র যুদ্ধ পর্যন্ত হয়ে গেল। বাইশ দিনের যুদ্ধ, কিন্তু ইতিহাসে এই বাইশটি দিন যুগান্তকারী হয়ে থাকবে। জন্মের পর ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে এই প্রথম সশস্ত্র সংঘাত। তাৎপর্যে এই ঘটনা ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিক আমাদের তরুণ সৈনিক এবং বৈমানিকের গৌরব-কাহিনীও। ভারতীয় জওয়ানেরা পায়ে পায়ে লাহোরের কাছাকাছি এগিয়ে গিয়েছিলেন। পাকিস্তানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এখনও সগৌরবে আমাদের পতাকা উড়ছে। ১৯৬৫ সালের কাশ্মীর, অতএব অন্য সময়ের কাশ্মীর থেকে স্বতন্ত্র,—প্রতিটি ভারতীয়কে ডেকে শোনাবার মত।

শোনার মতও। কাশ্মীর ভারতের উত্তরপ্রান্তে একটি রাজ্য। স্মরণাতীত কাল থেকে অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক। কিন্তু অনেকের ধারণা, যেন কাশ্মীরের যত খ্যাতি, সব তার নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর জন্য। স্বভাবতই কাশ্মীরের রাজনৈতিক দৃশ্যপটটিও অনেকের কাছে কুয়াশাচ্ছন্ন। শুধু বিদেশীরাই নন, কাশ্মীরের আজকের এই তথাকথিত রাজনৈতিক জটিলতার কার্যকারণ সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতাও ক্ষেত্রবিশেষে পর্বতপ্রমাণ। দূরের দর্শকদের ক্ষেত্রে হয়ত সেটা অপরাধ নয়,—একাংশ তাদের ইচ্ছাবশতই অন্ধ; অন্যরা অনেকে তথ্যের অভাবে শত্রুপক্ষের প্রচারের স্রোতে ভাসমান। কিন্তু স্বদেশের মানুষের নিস্পৃহ দর্শকের ভূমিকা নিলে চলে না; সেটা অপরাধ। ১৯৬৫'র কাশ্মীর-কাহিনী প্রসঙ্গে তাই কিছু কিছু পূর্বকথাও যুক্ত করা হয়েছে এই সংকলনে; যুদ্ধের আগে, পরে এবং মধ্যে যে-সব রাজনৈতিক কথা তাও বাদ দেওয়া হয়নি। কেননা কাশ্মীর কেবল সামরিক সমস্যা নয়।

'আনন্দবাজার পত্রিকা' বিরোধের সূচনা থেকেই কাশ্মীর সমস্যার বিশেষ রূপটি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছে। এ-গ্রন্থ সে-ই নিরবচ্ছিন্ন উদ্যমেরই সম্প্রসারণ। প্রধানত ইতিপূর্বে প্রকাশিত নিবন্ধ এবং প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণাদির সংকলন হলেও বিস্তর নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে কয়েকটি মূল্যবান নতুন রচনাও। বইটি দেশবাসীর কাশ্মীর-বোধে সাহায্য করেছে জানলেই আমরা পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

লেখক :

সুবোধ ঘোষ
সন্তোষকুমার ঘোষ
গৌরকিশোর ঘোষ
শ্রীপান্থ
অমিতাভ চৌধুরী
রণজিৎ রায়
খগেন দে সরকার
মতি নন্দী
আনন্দবাজার
পত্রিকার
সামরিক পর্যবেক্ষক

অনুবাদক :

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
মতি নন্দী
নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
ধীরেন্দ্র দেবনাথ

প্রচ্ছদ ও নামপত্র :

অলোক ধর

মানচিত্র :

অর্ধেন্দু দত্ত

জননী ॥ জন্মভূমি ॥ জওয়ান

পটভূমি

কাশ্মীর!

চেনারের বনে ঝড়ো হাওয়া। হ্রদ উত্তাল। সারি সারি মৌন পাহাড়গুলো আর ঘুমিয়ে নেই। বন আর পর্বত কাঁপিয়ে গর্জন করে চলেছে ট্যাংক-কামান, -ন্যাট-হানটার। "ভূস্বর্গে" আবার হানাদার। ১৯৬৫'র কাশ্মীর আবার তামাম দুনিয়ার ভাবনা। দিকে দিকে দুশ্চিন্তা, উল্লাস, উত্তেজনা,—ফিসফাস।

১৯৬৫'র কাশ্মীর আরও আকর্ষণীয়, কারণ আগুন এবার আরও দাউ দাউ, আরও ব্যাপ্ত। আগষ্টের ৫ তারিখে হানাদার এসেছিল রাত্রির অন্ধকারে; নিঃশব্দ পায়ে, তস্করের মত। হাতে আধুনিক অস্ত্র থাকলেও উর্দি ছিল না তাদের গায়ে। তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজারের সেই "জিব্রালটার-ফৌজ" কবরস্থ হওয়ার মুখে মুখোস ছেড়েই এগিয়ে এসেছিল আসল শত্রু। ১লা সেপ্টেম্বর ৭০টি ট্যাংক আর এক ব্রিগেড সুসজ্জিত পদাতিক সৈন্য নিয়ে দুঃসাহসীর মত আন্তর্জাতিক সীমানা পার হয়ে ভারত আক্রমণ করেছিল পাকিস্তান। ভারত তার জবাব দিয়েছিল খাস পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে পা বাড়িয়ে। বাইশ দিন যুদ্ধের পব ক্ষত-বিক্ষত মুমূর্ষু পাকিস্তান আনত মস্তকে যুদ্ধবিরতি মেনে নিয়েছিল। কিন্তু কাশ্মীর-উপত্যকা থেকে এখনও সে তার লুব্ধ দৃষ্টি সরিয়ে নেয়নি। এখনও তার মুখে উদ্ধত আস্ফালন,—দরকার হয় হাজার বছর যুদ্ধ চালিয়ে যাবে পাকিস্তান! এখনও সগর্ব প্রতিজ্ঞা—দরকার হয় পাকিস্তান ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরতরে মুছে যাবে, কিন্তু তবুও কাশ্মীরের দাবি ছাড়বে না। যুদ্ধ, অতএব থামেনি। আগুন আপাতত ধিকিধিকি জ্বলছে মাত্র।

শত্রুর প্রস্তুতি চলছে। সেই সঙ্গে অন্যদের কানাকানি,—মন্ত্রণা, গুঞ্জনও। ১৯৬৫'র কাশ্মীর নিয়ে বিশ্বে উত্তেজনার অন্ত নেই।

উত্তেজনা ঝিলমের তীরে যত, তার চেয়ে অনেক বেশি টেমস-এর ধারে, ডাল বা উলার হ্রদের চেয়েও অনেক বেশি তরঙ্গ-ভঙ্গ লেক-সাকসেস-এ, এবং অন্যত্র। কাশ্মীর ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য। দৈর্ঘ্য—৩৫০ মাইল, প্রস্থ—২৭৫ মাইল। উত্তরতম সীমান্তের এই রাজ্যটি ভারতের অন্যতম রাজ্য। আয়তনে কাশ্মীর ৮৪,৪৭১ বর্গমাইল। ভৌগোলিক দিক থেকে মোটামুটি তিনটি স্বতন্ত্র এলাকায় ভাগ করা যায় একে। লাদাক-গিলগিট অঞ্চল বা উত্তরের এলাকা, মধ্যবর্তী খাস কাশ্মীর উপত্যকা আর দক্ষিণের জম্মুর সমভূমি অঞ্চল। ই. এ. নাইট একদা কাশ্মীরের নাম দিয়েছিলেন- "তিন সাম্রাজ্যের মিলন স্থল",—"হোয়ার থ্রী এমপায়ারস মীট্"। কাশ্মীর আজ বিশ্বের চোখে তার চেয়েও গুরুতর স্থান। এখানে জনবসতি খুবই কম। ১৯৪১ সনে জন-গণনায় দেখা গিয়েছিল এই বিশাল রাজ্যটিতে মাত্র ৪০,২১,৬১৬ জন মানুষের বাস। তার মধ্যে মুসলমান শতকরা ৭৭ ১১ ভাগ, হিন্দু ২০·১২ ভাগ, শিখ এবং বৌদ্ধ—২·৭৭ ভাগ। ১৯৬১ সনের আদমসুমারী অনুযায়ী কাশ্মীরের জনসংখ্যা ৩৫,৬০,৯৭৬। তার মধ্যে মুসলমান ২৪,৩২,০৬৭, হিন্দু—১০,১৩,১৯৩, শিখ--৬,৩০৬৯, বৌদ্ধ—৪,৮৩৬০, খৃষ্টান—২৮৪৮ এবং জৈন—১,৪২৭৫ জন। দেশ বিভাগ, হানাদার, যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা— ইত্যাদির ফলে কাশ্মীরের জনসংখ্যা কুড়ি বছর আগেকার তুলনায় আজ আরও কম। তবুও কাশ্মীর নিয়ে দিকে দিকে এমন আগ্রহ, কারণ, তিন সাম্রাজ্যের মিলনস্থল কাশ্মীরের চার দিক ঘিরে আজ পাঁচ পাঁচটি দেশ। দক্ষিণে পাঞ্জাব তথা ভারত এবং পাকিস্তান, পশ্চিমে পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং আফগানিস্থান, উত্তরে পামির মালভূমি, চীন এবং রুশ তুর্কীস্থান, পূবে—তিব্বত তথা আবার চীন। কাশ্মীর নিয়ে অতএব বিশ্ব ভাবিত হবে বই কি! ব্রিটেন বা আমেরিকার অবশ্য কাশ্মীরের সঙ্গে ভৌগোলিক যোগ নেই। কিন্তু রাশিয়া এবং চীনের অবস্থিতির ফলে তাঁরাও কাশ্মীর উপলক্ষ্যে অন্যতম মনোযোগী দেশ। কাশ্মীর পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে পারলে, কিংবা একান্তই যদি তা না পারা যায় তবে কাশ্মীরকে "স্বাধীন" রাখতে পারলে তাদের বড়ই সুবিধে! দেশ-বিভাগের দিন থেকেই সুদূর ভারতের একটি রাজ্যকে নিয়ে বিশ্বের নানা রাজধানীতে তাই অতিশয় "উদ্বেগ",—সরকারীভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিদায় নিতে না নিতেই, সীমান্তের ওপার থেকে ঢেউয়ের পর ঢেউ হানাদার।

সেদিন ২২শে অক্টোবর, ১৯৪৭।

ফুলের-দেশে হঠাৎ হানাদার। অ্যাবোটাবাদ-ডোমেল রোডের পথে হাজার হাজার লুঠেরা এসে হাজির হয়েছে কাশ্মীরে। ক্রুর তাদের চেহারা। হাতে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, মুখে জেহাদের আহ্বান। দেখলেই বোঝা যায় তারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নানা উপজাতির লোক। পাকিস্তান ওদের কাশ্মীর-বিজয়ে পাঠিয়েছে। কাশ্মীরের মুসলমানদের মনোজয়ের অনেক চেষ্টা করেছেন জিন্না, হাওয়ার গতি পাল্টাবার জন্য বিস্তর সাধনা করেছে মুসলিম লীগ। কাশ্মীর তবুও অনড়। সুতরাং, এবার এই নব-বিধান।

কাশ্মীর মুসলমানের দেশ হয়েও লীগ-পন্থী হতে পারেনি সেদিন, কারণ রাজনৈতিক ঐতিহ্য তার সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। মুসলিম প্রধান রাজ্য, কিন্তু রাজা হিন্দু। গরীবের দেশ। দেশের ঐশ্বর্য বলতে যা সেকালে বলতে গেলে তার সবটুকুই প্রায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের দখলে। রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায়ও তারাই প্রধান। তারই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে ১৯৩১ সনের গ্রীষ্মে হঠাৎ গণবিদ্রোহ,—দাঙ্গা। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার চেহারা নিলেও ওই বিদ্রোহ আসলে ছিল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রজা আন্দোলন। কাশ্মীরে সে-ই প্রথম রাজনৈতিক চেতনার জন্ম। তার পরের বছরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাজ্যের প্রথম রাজনৈতিক দল,—মুসলিম কনফারেন্স। ভারতময় তৎকালে জাতীয় আন্দোলন। তার ঢেউ পৌঁছাল কাশ্মীরেও। সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান মুসলিম কনফারেন্স তার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করার সাধনায় ব্রতী হল। '৩৬ সনে অ-মুসলমানদের জন্যও দুয়ার খুলে দেওয়া হল তার। '৩৯ সনে মুসলিম কনফারেন্স নাম পাল্টে পুরোপুরি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। নাম হল তার—ন্যাশনাল কনফারেন্স। লক্ষ্যে ও আদর্শে ন্যাশনাল কনফারেন্স তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস থেকে অভিন্ন। অন্যান্য দেশীয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলনের মতই কাশ্মীরের জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। জিন্না-সাহেব সেখানে কেউ না।

'৩১ সনের আন্দোলনের পর মহারাজা শাসন-সংস্কারের জন্য কমিশন বসিয়েছিলেন একটা। জি. বে. গ্ল্যানসির অধিনায়কত্বে সে কমিশনের পরামর্শ-মত রাজ্যে আইন সভা প্রতিষ্ঠিত হল (১৯৩[illegible])। জাতীয়তাবাদীরা তাতে [illegible] পেলেন। দশ বছর পরে, ১৯৪৪ সনে রাজ্যে প্রথম জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা। সেখানেও দুজন মন্ত্রী ছিলেন ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রতিনিধি হিসেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের পদত্যাগ করতে হয়। কারণ রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী তখন কুখ্যাত রামচন্দ্র কাক। দেশে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর কোন আগ্রহ নেই। ন্যাশনাল কনফারেন্সের জাতীয়তাবাদী নায়কদের জব্দ করার জন্য তিনি সেদিন যা করেছিলেন তার তুলনা নেই। আগেই বলা হয়েছে কাশ্মীরের প্রথম গণ-

আন্দোলন শুরু হয়েছিল হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার মধ্য দিয়ে। দেশে সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম নেতারাও ছিলেন। ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর উদার জাতীয়তাবাদকে কোন দিনই তাঁরা সমর্থন করতে পারেননি। তাঁরা মুসলিম লীগের অনুকরণে ১৯৩২ সনেই কাশ্মীরে একটি সাম্প্রদায়িক দল গড়েছিলেন। নাম ছিল তার—আজাদ কনফারেন্স। '৩৯ সনে ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রতিষ্ঠিত করার সঙ্গে সঙ্গে আজাদ কনফারেন্স নাম নিল—মুসলিম কনফারেন্স। কাশ্মীরের জনসাধারণের ওপর কোনদিনই বিশেষ প্রভাব ছিল না তার। সেখানে সর্বেশ্বর ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। '৪০ সনে সীমান্ত গান্ধী এবং জওহরলাল গিয়েছিলেন কাশ্মীর পরিদর্শনে। কাশ্মীরের জনসাধারণ বিপুল উদ্দীপনায় অভ্যর্থনা জানিয়েছিল তাঁদের। '৪৫ সনে নেহরু, আজাদ এবং সীমান্ত গান্ধী আবার পা দিয়েছিলেন এই দেশীয় রাজ্যটিতে। কাশ্মীর সেদিনও সানন্দে স্বাগত জানিয়েছিল তাঁদের। তবুও মুসলিম লীগ কাশ্মীরকে ভুলতে রাজি হয়নি। মুসলিম কনফারেন্সকে দিয়ে সে তার মতলব হাসিল করার জন্য একের পর এক চেষ্টা চালিয়ে গেল। '৪৪ সনের জুনে স্বয়ং জিন্না এলেন কাশ্মীর উপত্যকায় "বিশ্রাম নিতে"। মুসলিম কনফাবেন্সের বার্ষিক সভায় দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করলেন—মুসলিম কনফারেন্সই কাশ্মীরী মুসলমানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। ন্যাশনাল কনফারেন্স একটি গুন্ডার দল। রামচন্দ্র কাকও প্রকারান্তরে তাই প্রমাণ করতে চাইলেন। ১৯৪৬ সনের ৬ই মে শুরু হল ন্যাশনাল কনফারেন্সের উদ্যোগে ব্যাপক গণ-আন্দোলন—কুইট কাশ্মীর!—ডোগরা-রাজ কাশ্মীর ছাড়! কাক উত্তর দিলেন জাতীয়তাবাদী নায়কদের গ্রেফতার করে। এমনকি তাঁর হাত থেকে সেদিন জওহরলাল নেহরুর পর্যন্ত নিস্তার নেই। কাক তাঁকেও গ্রেফতার করেছিলেন। এই "গুন্ডা দলকে" শায়েস্তা করতে গিয়ে কাক সেদিন জিন্নার মতই তাঁর অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন মুসলিম কনফারেন্সকে। এই প্রতিষ্ঠানটিই সেদিন রামচন্দ্র কাকের প্রধান সমর্থক। পুরানো আইনসভা, রাজ্যের প্রজা-সভা ভেঙ্গে দেওয়া হল। ন্যাশনাল কনফারেন্সের বিকল্প হিসেবে কাক নতুন রাজনৈতিক দল গড়লেন;—"অল কাশ্মীর স্টেট পিপলস কনফারেন্স"—গালভরা নাম তার। '৪৬ সনের ডিসেম্বরে নতুন করে নির্বাচন হল রাজ্যে। ন্যাশনাল কনফারেন্সের নায়কেরা কারাগারে। কর্মীরা নির্বাচন বয়কট করলেন। তারই মধ্যে আবার "গণরাজ" প্রতিষ্ঠিত হল কাশ্মীরে। প্রধান তার—পণ্ডিত রামচন্দ্র কাক। সমর্থক জিন্না সাহেব এবং মুসলিম লীগের অনুচরদল—মুসলিম কনফারেন্স।

জিন্নার আশা ছিল মুসলিম কনফারেন্স কার্যোদ্ধার করতে পারবে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সংখ্যালঘু মুসলিম লীগ রাতারাতি পাঠানদের দেশ

জয় করে নিয়েছে, কাশ্মীরেও ওরা বিফল হবে না। বিশেষত স্থানীয় রাজ-সরকারের সংগে যখন ওদের সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক। ভারত তখন স্বাধীনতার দুয়ারে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত কাশ্মীরেও প্রবল উত্তেজনা। মুসলিম কনফারেন্স জানাল—কাশ্মীরের পক্ষে স্বতন্ত্র থাকাই ভাল। কাকও মনে মনে যেন তা-ই চান। তাঁর মতিগতি বোঝা দুষ্কর। দেশে আবার আন্দোলন। বাধ্য হয়েই মহারাজাকে আসরে অবতীর্ণ হতে হল। তিনি রামচন্দ্রকে বিদায় দিলেন। সেদিন ১০ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সন। ঐতিহাসিক পনরই আগষ্ট আসতে আর মাত্র পাঁচদিন বাকি। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, '৪৮ সনে কাশ্মীরের জনপ্রিয় সরকার আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন পণ্ডিত রামচন্দ্র কাককে। বিচারে দু'বছর জেল হয়েছিল তাঁর। অবশ্য পুরো দু'বছর জেলে কাটাতে হয়নি তাঁকে। তার আগেই ছাড়া পেয়েছিলেন রামচন্দ্র।

কাক গেলেন। কিন্তু কাক-তন্ত্র তৎক্ষণাৎ লুপ্ত হল না। ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারত পরশাসন মুক্ত হল। সেই সংগে ভূমিষ্ঠ হল নতুন রাষ্ট্র—পাকিস্তান। অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগুলোর মত কাশ্মীরের ভারত কিংবা পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রের কোন একটিতে যোগ দেওয়ার কথা। কিন্তু কাশ্মীরেব মহাবাজা কালহরণ করতে চান। তিনি ঘোষণা করলেন—দুই রাষ্ট্রের সংগেই আমি এক "স্থিতাবস্থা" চুক্তি করতে চাই। পাকিস্তান রেডিও জানাল,—থ্যাঙ্ক্ ইউ! আমরা তাতে সম্মত। ভারত বলল—আমরা এ জাতীয় চুক্তি অনুমোদন করতে পারি না। ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রধান নায়কেরা তখনও কারাগারে। কেউ কেউ পলাতক, সরকারী চোখের আড়ালে।

পাকিস্তানের ধারণা ছিল "স্থিতাবস্থা" চুক্তি ল কাশ্মীবের রাতারাতি ভারত-ভুক্তি ঠেকান গেছে। এখন একটু চাপ দিলেই মহারাজা পাকিস্তানে যোগ দেবেন। সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার যখন একমাত্র রাজ্যের রাজার তখন তাঁকে বেশি ঘাটানো সংগত নয়। বিশেষত, পাক-সমর্থক কাক নেই। "কুইট কাশ্মীর" আন্দোলন থেকে এক পাশে সরে দাঁড়াবার ফলে মুসলিম কনফারেন্স আরও দুর্বল হয়ে গেছে। তার অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। পাকিস্তান তাই অন্য চাল চালল। "স্থিতাবস্থা" চুক্তির সুযোগ নিয়ে সে কাশ্মীরের ডাক এবং তার বিভাগ দখল করে বসল। তারপর শুরু হল ওর নব নব চাপ।

তৎকালে উত্তর থেকে কাশ্মীরে আসা যায় একটি মাত্র পথে। সেটি গিলগিট। দক্ষিণে দুটি মাত্র পথ। দুটিই গিয়েছে পাকিস্তানে। আজ আর অবশ্য তা নয়। পাকিস্তান প্রথমে কাশ্মীবে জিনিষপত্র পাঠান বন্ধ করে দিল। পেট্রোল, তেল, খাদ্যশস্য, চিনি, নুন, কাপড়—কাশ্মীরে কিছুই পাওয়া যায় না। অবরোধের ফাঁকে ফাঁকে চলল সাম্প্রদায়িকতার প্রচার। পাঞ্জাবে তখন ব্যাপক দাঙ্গা চলছে। পাকিস্তান বেডিও কাশ্মীরীদেরও ক্রমাগত উস্কানি দিয়ে চলল

জেহাদ ঘোষণা করতে। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে শ্রীনগরে আসবার পথে পাকিস্তানীদের হাতে একদল কাশ্মীরী খুন হয়ে গেল। কাশ্মীরের সীমান্ত জুড়ে ক্রমাগত অশান্তি। রাজ্যে বলতে গেলে প্রায় অচলাবস্থা। বাধ্য হয়েই সেপ্টেম্বরের ২৯ তারিখে মহারাজা শেখ আবদুল্লাকে মুক্ত করে দিলেন। আবদুল্লা তাঁর প্রথম ভাষণেই ঘোষণা করলেন—কাশ্মীরে দাঙ্গা-বাজী চলবে না। আমরা দুই জাতির তত্ত্ব মানি না। জিন্না সাহেব আজ আমাদের পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। আমরা কাশ্মীরী মুসলমানরা যখন স্বাধীনতার জন্য লড়াই কর্বাছলাম তখন কোথায় ছিলেন তিনি? তিনি আরও ঘোষণা করলেন—কাশ্মীর কার সঙ্গে যোগ দেবে সে প্রশ্ন পবে। আগে আমরা মহারাজার শাসনের অবসান চাই। মহারাজা তখনও স্বাধীন কাশ্মীরের স্বপ্নে বিভোর। কাকের আসনে প্রধান-মন্ত্রী হয়ে এসেছিলেন ঠাকুর জনক সিং। '৪৭ সনের অক্টোবরে "পাঁচ বছরের জন্য" নতুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন—বিচারপতি মেহেব চাঁদ মহাজন। তাঁর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিয়েছেন -কাশ্মীর আপাতত কোন রাষ্ট্রেই যোগ দিচ্ছে না। তিনি আরও বলে দিয়েছেন—"কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা ভাল নয়। সুতরাং, এখানে আমি সে জাতীয় কিছু ঘটতে দিচ্ছি না। কাশ্মীরীরা এখনও শাসন পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করেনি।"

পাকিস্তান এই গোলমালের সুযোগে তার শেষ চাল চালল। পাক-সরকারেব তরফ থেকে দুজন প্রতিনিধি এসে নামলেন শ্রীনগরে। তাঁরা আবদুল্লা তথা ন্যাশনাল কনফারেন্সের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চান। কথাবার্তা শ্রীনগরেই শেষ হল না। সেখান থেকে রাওয়ালপিণ্ডি। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে লাহোর। আলোচনা ব্যার্থ হল। তবুও আর এক দফা চেষ্টায় দোষ নেই। পাকিস্তানের তরফ থেকে আবদুল্লাকে সেখানে আমন্ত্রণ জানান হল। শেখ জানালেন—পাকিস্তানে যেতে তাঁর আপত্তি নেই, কিন্তু তার আগে একবার তাঁর দিল্লি যাওয়া দরকার। সেখানে সর্বভারতীয় দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনেব স্ট্যাণ্ডিং কমিটিব বৈঠক। তারপর আর সময় নষ্ট করার অর্থ হয় না! দিল্লি সম্মেলনের তারিখ ছিল ১৮ই অক্টোবর। ২২শে অক্টোবর লুব্ধ পাক হানাদারের দল হাজির হল কাশ্মীরে। তাদের হাতে জ্বলন্ত মশাল।

হানাদার কাশ্মীরে নতুন নয। কাশ্মীর ইতিহাসে এক আশ্চর্য নায়িকা। তার নামে যুগ থেকে যুগান্তরে লালসার আগুণ জ্বলে।

– কাশ্মীর!—কাশ্মীর!

কাশ্মীর থেকেই প্রমোদ ভ্রমণ শেষে লাহোরে ফিরছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। পথে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। দেখতে দেখতে অবস্থা তাঁর আরও অবনতির দিকে। মৃত্যুপথযাত্রী সম্রাটের কানে কানে তাঁর শেষ বাসনা জানতে চাওয়া হল। জাহাঙ্গীর ফিস ফিস করে উত্তর দিয়েছিলেন নাকি —কাশ্মীর!--শুধু কাশ্মীর!

জাহাঙ্গীর নিঃসঙ্গ বিলাসী নন। কাশ্মীর যুগের পর যুগ অসংখ্য সম্রাট আর লোভাতুর সেনানায়কের একমাত্র বাসনা। উপত্যকার চারদিকে সাজানো মৌন পাহাড়গুলোর মতই প্রাচীন এই রাজ্যের ইতিহাস। লৌকিক উপকথা বলে : আজ যেখানে কাশ্মীর উপত্যকা একদিন সেখানে ছিল একটি বিশাল হ্রদ। নাম ছিল তার—"সতী সার" বা পার্বতীর সাগর। সেই সাগরে জলোদ্ভব নামে এক অত্যাচারী দৈত্য ছিল। তার পীড়নে প্রজাদের দুঃখের শেষ নেই। তাদের কান্না শুনে সতীসারের তীরে এসে হাজির হলেন কশ্যপ মুনি। তিনি স্বয়ং ব্রহ্মার পৌত্র, তদুপরি সিদ্ধ ঋষি। জনসাধারণের দুঃখ মোচনের জন্য হাজার বছর তপস্যায় মগ্ন হলেন তিনি। ঋষির সাধনা ব্যর্থ হল না। "হরি" বা ময়নার রূপে দেবী শারিকা এসে আবির্ভূত হলেন তাঁর সামনে। মুখে তাঁর এক টুকরো নুড়ি। জলদেওয়ের মাথায় সেটি নিক্ষেপ করা মাত্র সে একটি বিশাল প্রস্তরখণ্ডে রূপান্তরিত হল। সেই পাথরটিই নাকি আজকের হরি-পর্বত। মুনি কাশ্যপ হ্রদকে ফুলে-ফলে শোভিত উপত্যকায় পরিণত করেছিলেন; তাঁর হাতে গড়া নতুন দেশের নাম হল তাই—কাশ্যপ মীর (বা মার)। সেই থেকেই কাশ্মীর।

কাশ্মীরের জ্ঞাত ইতিহাস শুরু হয়েছে বলা চলে সম্রাট অশোকের কাল থেকে। অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে। কিন্তু তার আগেও যে কাশ্মীর ছিল এবং সেখানে যে এক উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল গবেষকরা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। নৃতাত্ত্বিকেরা বলেন—কাশ্মীরের বাসিন্দারা আদিতে ছিলেন আর্য। মধ্য এশিয়া থেকে তাঁরা এসে এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। ধর্মে তাঁরা ছিল বৈদিক ধর্মাবলম্বী, অর্থাৎ হিন্দু। আশপাশের পাহাড়িয়া উপজাতিগুলো থেকে তাঁরা একান্ত ভাবেই স্বতন্ত্র। অন্তত বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক জর্জ ক্যামবেল-এর তাই অভিমত। পিকক লিখেছেন—কাশ্মীরী ব্রাহ্মণেরা আদিতে গ্রীক এবং পারসিক। একজন আধুনিক গবেষক বলেন—খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের প্রথম দিকে ইন্দো-গ্রীকরা কাশ্মীর আক্রমণ করেছিল হয়ত, কিন্তু তারা এখানে বসবাস শুরু করেছিল বলে মনে হয় না। (এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : আর্লি হিষ্ট্রি এন্ড কালচার অফ কাশ্মীর, ডঃ সুনীলচন্দ্র রায়।) তবে একটি বিষয়ে সবাই একমত; জিন্না সাহেব বা আয়ুব-ভুট্টো প্রথম অভিযাত্রী নন, ঢেউয়ের পর

ঢেউ অভিযাত্রী এসেছে কাশ্মীরে। ইতিহাসের নির্মম নিয়তিকে মেনে অনেকেই আবার ফিরে গেছে যে যার দেশে। কিন্তু কাশ্মীর মুছে যায়নি। উত্তর এবং পশ্চিম ভারতের মতই "শক হূন দল পাঠান মোগল" এখানকার আদি আর্য-দেহে লীন।

আদি হিন্দু-আমলের পরে দীর্ঘ বৌদ্ধ-যুগ। তারপর আবার হিন্দু রাজত্ব। ইসলাম কাশ্মীরে অনেক পরের ঘটনা। শ্রীনগর শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নাকি রাজা প্রভার সেন। সে অশোকের কালেরও আগের ঘটনা। মাত্তানের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন রাজা রামদেব। তিনিও খৃীষ্ট জন্মের বহু আগেকার নরপতি।

মৌর্য আমলের শেষ দিকে এসেছিল তুর্কী হানাদাররা। তারপর কনিষ্ক তথা কুষান-আমল। কাশ্মীর তখন ভারতে বিশিষ্ট বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্র। কনিষ্কের বিখ্যাত তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসম্মেলন এখানেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কুষাণদের পরে খৃীষ্টীয় পঞ্চম শতকে এল হানাদার হূনেরা, ষষ্ঠ শতকেও কাশ্মীরে তাদেরই প্রতিপত্তি। কুষাণ নায়কদের মধ্যে কাশ্মীরের ইতিহাসে সবচেয়ে কুখ্যাত মিহিরকুলের নাম। বৌদ্ধ ধর্মকে মুছে দেওয়ার জন্য সেদিন তিনি এক উন্মাদ সমর নায়ক। হারওয়ান-এ বৌদ্ধ মঠের ধ্বংসস্তুপ তাঁরই বর্বর হাতের কীর্তি। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সেদিন অনেকেই আশ্রয় নিয়েছিলেন তিব্বতে। তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মাচারে তাঁদের অবদান অনেক।

অষ্টম-নবম শতকে আবার হিন্দু রাজত্ব। এই অধ্যায়ে কাশ্মীরের ইতিহাসে স্মরণীয় দুটি নাম—ললিতাদিত্য (৭১৫-৫২ খৃীষ্টাব্দ) আর অবন্তী বর্ণম (৮৫৫-৮৩ খৃীষ্টাব্দ) কাশ্মীরময় আজও অনেক স্মৃতি ছড়িয়ে আছে এঁদের। তার মধ্যে অন্যতম মার্তণ্ডের মন্দির, আর, সূর্যপুর ও তার কাহিনী। মার্তণ্ডের বিশাল মন্দিরটি তৈরী করেছিলেন ললিতাদিত্য। সূর্যপুর বলে জায়গাটার নাম হয়েছে অবন্তী বর্ণমের বিখ্যাত স্থপতি সূর্যের নামে। ঝিলমকে বশে এনেছিলেন তিনি! ললিতাদিত্য শুধু কাশ্মীরকে সুখী রাজ্যে পরিণত করেই তুষ্ট হতে পারেননি। সমগ্র উত্তর ভারত তখন তাঁর দখলে। শুধু তাই নয়, তুরস্ক, এমনকি মধ্য এশিয়ার একাংশেও তখন কাশ্মীর-রাজের আধিপত্য।

অভিযাত্রী ভারতীয় সভ্যতার কাছে কাশ্মীর তৎকালে মধ্য এশিয়ার দুয়ার। ভারতীয় ধর্ম আর সংস্কৃতি এখান থেকেই আলোক বিস্তার করেছিল চীন আর কাসপিয়ানের মাঝামাঝি বিস্তীর্ণ এলাকায়। কাশ্মীর সেকালে বৌদ্ধ-ধর্ম, শৈবধর্ম, এবং সংস্কৃত সাহিত্যের এক বিস্ময়কর হ্রদ,—নানা রঙের পদ্ম ফুটে আছে সেখানে। ভারতের নানা প্রান্ত থেকে বিদ্যার্থীরা সমবেত হতেন সেখানে। অলঙ্কার শাস্ত্র ছাড়াও কাশ্মীরে সংস্কৃত সাহিত্যের বহুমুখী চর্চা,

অতুলনীয় স্ফূর্তি। ক্ষেমেন্দ্র, দামোদর গুপ্ত, বিহলন, কহলন, 'কথা সরিৎ সাগর'-রচয়িতা সোমদেব—ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যে কাশ্মীরী নাম অনেক।

পরবর্তী কালে কাশ্মীরের হিন্দু রাজারা অবশ্য এত প্রতিপত্তিশালী ছিলেন না। কিন্তু নানা উপজাতীয় আক্রমণের মধ্যেও মোটামুটি চতুর্দশ শতক অবধি কাশ্মীর হিন্দুর দেশই ছিল। ১৩১৪ সনে ঘোড়ার খুরে বরফ চূর্ণ করে এলেন তুর্কী যোদ্ধা জুলফি কাদির খান। ওরফে কুখ্যাত দালচু। শুরু হল কাশ্মীরে বলপূর্বক ধর্মান্তিকরণ। দালচু এবং তাঁর সৈন্যদল কাশ্মীরেই কবরস্থ। ৫০ হাজার ব্রাহ্মণ বন্দীকে নিয়ে ঘরে ফেরার সময় নিষ্ঠুর প্রকৃতি প্রতিশোধ নিয়েছিল তাঁকে বরফ চাপা দিয়ে। তারপর এলেন মোহম্মদ গজনভী। কাশ্মীর কোন দিনই কোন আক্রমণকারীকে বিনা প্রতিরোধে মেনে নেয়নি। সিংহাসনে তখন একজন রানী। নাম তাঁর—রানী দিদ্যা। তিনি হানাদারদের বিতাড়িত করেন। স্বদেশের মান রক্ষা করতে গিয়ে আর এক রানী বীরাঙ্গনার মৃত্যু বরণ করেছিলেন। তাঁর নাম কুটি রানী। তাঁর মন্ত্রী ছিলেন একজন মুসলমান। তিনি হঠাৎ নিজেকে কাশ্মীরের অধীশ্বর বলে ঘোষণা করেন। নাম তাঁর—শাহ মীর। শোনা যায়, রানী আত্মহত্যা করে নিজের ইজ্জত রক্ষা করেন, কিন্তু কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠিত হল মুসলিম রাজত্ব।

শাহ মীরের পরে অনেক মুসলমান নরপতিই রাজত্ব করেছেন কাশ্মীরে। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত সুলতান জয়নুল আবদীন (১৪২০-৭৪), সবচেয়ে কুখ্যাত সিকেন্দর (১৩৯৪-১৪১৬)। সিকেন্দরের কাজ ছিল হিন্দু মন্দিরাদি ধ্বংস করা, এবং হিন্দুদের জবরদস্তি করে ধর্মান্তরিত করা। জয়নুল আবেদীন উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ভাঙ্গা হিন্দু মন্দির তিনি আবার মেরামত করেছিলেন। কাশ্মীরের শিল্প সাহিত্য ধর্ম—তাঁর আমলে সর্বত্র আবার নবজীবনের হাওয়া।

মুঘলেরা কাশ্মীরে আধিপত্য বিস্তার করেন আকবরের কালে। কাশ্মীর তখন উপজাতীয় ছকদের অধিকারে। আকবরের বাহিনী তাদের পরাজিত করে কাশ্মীর উপত্যকার অধীশ্বর হল। জাহাঙ্গীরের মতই আকবরও ভালবেসেছিলেন কাশ্মীরকে। হরি-পর্বতের দুর্গটির তিনি সংস্কার করেছিলেন। জাহাঙ্গীর বলতে গেলে কাশ্মীর প্রেমে উন্মাদ। ভেরিনাগ, আছিবল, নাসসীম, শালিমার- কাশ্মীরের অধিকাংশ বাগিচা তাঁরই কীর্তি। কিংবা নুরজাহানের। ওঁরাই নাকি চিনার গাছ এনেছিলেন কাশ্মীর উপত্যকায়। শ্রীনগরের পাথর-মসজিদটি নুরজাহানের দান।

মুঘলের পরে পাঠান। মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তিম কালে নতুন হানাদার কাশ্মীর উপত্যকায়। এবার (১৭৫০) এসেছে আহমদশাহ দুরাণির নেতৃত্বে পাঠানেরা। আবার হিন্দু-হত্যা, ধর্মান্তরকরণ। দীর্ঘ ষাট বছর চলেছিল এই

অরাজকতা। পাঠানেরা স্থানীয় মুসলমানদেরও রেহাই দেয়নি। হিন্দু মুসলমান এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য আবেদন পেশ করলেন পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংয়ের কাছে। কাশ্মীরে তখন জব্বর খাঁ আফগান গভর্ণর। রাজা গুলাব সিংয়ের অধিনায়কত্বে শিখবাহিনী কাশ্মীর আক্রমণ করলেন। সে ১৮১৯ সনের কথা। কাশ্মীরে পাঠান শাসনের অবসান হল।

রণজিৎ সিং ১৮৩৯ সনে মারা গেলেন। ১৮৪৬ সনে পাঞ্জাব ইংরেজের হাতে এল। '৪৬ সনের ১৬ই মার্চ বিখ্যাত আমৃতশর-চুক্তি। তার আগে ৯ই মার্চ তারিখে আরও একটি চুক্তি হয়ে গেছে। ইংরেজেরা ঘোষণা করলেন জম্মু আর কাশ্মীরের অধীশ্বর হলেন এবার থেকে ডোগরা রাজা গুলাব সিং এবং তাঁর বংশধরেরা। আধুনিক কাশ্মীরের তখনই জন্ম।

গুলাব সিং সাধারণ একজন সামন্ত হলেও জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। পানিকর লিখেছেন—উনিশ শতকের ভারতে গুলাব সিং এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। মহারাজা ছিলেন হরি সিং তাঁরই বংশধর। তাঁর আমলেই ১৯৪৭ সনের পাক আক্রমণ,—কাশ্মীরে হানাদার।

হানাদার।

রাজতরঙ্গিনীর দেশে ঢেউয়ের পর ঢেউ হানাদার। একদল এল অ্যাবোটা-বাদের পথে। আর একদল কোহাল্লা দিয়ে। সেখানে মহারাজার একদল সীমান্তরক্ষী ছিল। তারাও যোগ দিল হানাদারদের সঙ্গে। দেখতে দেখতে দুষমনেরা এগিয়ে গেল ডোমেল অবধি। সেখান থেকে মুজাফরাবাদ। পথে দুধারে যা পড়ল নিমেষে তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। যেন ঘূর্ণিবাত্যা। আরও নির্মম এই বর্বরের দল। হত্যা, লুঠ, ধর্ষণ, আগুন;—পায়ে পায়ে ওদের মধ্যযুগীয় কাহিনী। কোহাল্লা-শ্রীনগর রোডের একটি বিন্দুতে উরি। রাজ্য সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং সেখানে দু'দিন ঠেকিয়ে রাখলেন ওদের। ২৫শে উরির পতন হল। তারপর মাহোরা পাওয়ার হাউসের। রাজ্যের একমাত্র বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র সেটি। শ্রীনগর এবং উপত্যকার অন্যান্য শহরে অন্ধকার নেমে এল। ২৬শে অক্টোবর বরমুলা শহর শত্রুর হাতে চলে গেল। বরমুলা কাশ্মীরের তৃতীয় বৃহৎ শহর। শ্রীনগর থেকে দূরত্ব তার মাত্র চৌত্রিশ মাইল। মহারাজা শ্রীনগর ছেড়ে আশ্রয় নিলেন জম্মু শহরে। শ্রীনগরের একমাত্র ভরসা ন্যাশনাল কনফারেন্সের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী,—"বাঁচাও ফৌজ।"

শেখ আবদুল্লা আবার দিল্লি ছুটলেন। ২৪শে অক্টোবর মহারাজা নিজেই সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন ভারতের কাছে। ২৫শে ন্যাশনাল কনফারেন্সের তরফ থেকে দিল্লি পৌঁছালেন আবদুল্লা। ২৬শে গভর্নর

জেনারেলের নামে মহারাজার অনুরোধ-পত্র : আফ্রিদিরা আসছে। প্রথমে পুঞ্চ এলাকায়, তারপর শিয়ালকোট অঞ্চলে,—তারপর হাজরা জেলায়,—এবং এখন রাজকোটেও। রাজ্যময় বর্বর হানাদারের দল। ভারত সাহায্য না করলে রাজ্য সরকারের পক্ষে এদের ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। অথচ আমি জানি, কাশ্মীর ভারতে যোগ না দিলে ভারতের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। আমি সেই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করলাম।...চিঠির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মেহের চাঁদ মহাজনও এসে হাজির হলেন দিল্লিতে। ভারত সরকার মহারাজা এবং জনসাধারণ—দুই তরফের অনুরোধ বিবেচনা করলেন। ২৭শে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে মাউণ্টব্যাটেন উত্তর দিলেন মহারাজাকে : ভারত কাশ্মীরের ভারত-ভুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করল। সেদিনই বেলা ৯টায় ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর প্রথম দলটি এসে নামল শ্রীনগর বিমান বন্দরে। কাশ্মীরের চারদিক ঘিরে তখন আগুন।

সেদিনই মাত্র কিছুক্ষণ আগে বরমুলার পতন হয়েছে। চৌদ্দ হাজার মানুষের শহর বরমুলা। আজ সে দু'হাজারের কোন প্রেতপুরী যেন। কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি হানাদারের দল। ২৬০টি ট্রাক বোঝাই করে লুঠের মাল নিয়ে গেছে তারা। তার মধ্যে ছিল শত শত তরুণী। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কাউকে বাদ দেয়নি ওরা। বরমুলার বিখ্যাত সেণ্ট জোসেফ কনভেণ্টে হানা দিয়ে সেখানেও মেয়েদের ওপর অত্যাচার করেছে বর্বরের দল। আর সকলের সঙ্গে য়ুরোপীয় মেয়েদেরও লুঠের মাল হিসেবে ট্রাকে তুলে নিয়ে গেছে। শত শত হিন্দুকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। অসংখ্য ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল কনফারেন্সের কর্মীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। সার তেজবাহাদুর সপ্রু হিসেব করেছিলেন বরমুলায় নিহতের সংখ্যা কমপক্ষে চার হাজার।

অন্যত্রও একই সংবাদ। শ্রীনগর থেকে মাত্র ২৮ মাইল পশ্চিমে মনোহর গুলমার্গ। সেখানে যা ছিল সবই লুঠ হয়ে গেল। অ্যাঙ্গলিকান গির্জাটিও লোভের আগুন থেকে বাদ গেল না। সোপুর, পাত্তান, বন্দিপুর, হান্দওয়ারা, উরি, থিটওয়াল এবং জম্মুর অসংখ্য নগর গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। মুঘলদের কাশ্মীর আসা-যাওয়ার সুপ্রাচীন পথের ধারে সুন্দর জনপদ নওশেরা। সেখানে নিহতের সংখ্যা ২০ হাজার, অপহৃতা নারীর সংখ্যা ২ হাজার। হত্যা, লুঠ, ধর্মান্তরকরণ, ধর্ষণ আর আগুন। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান নেই—হানাদারের কাছে সেদিন সব এক। .ক নাগোরতা শিবিরেই উদ্বাস্তু জমেছিল ৪০ হাজার! জম্মুতে উদ্বাস্তু আশ্রয় নিয়েছিল ৪৩ হাজার!

সাকুল্যে হানাদার নামান হয়েছিল ৫০ হাজার। হয়ত তার চেয়ে বেশি বই কম নয়। নেহরু জানিয়েছিলেন (২রা জানুয়ারি, ১৯৪৮) ৫০ হাজার হানাদার যদি কাশ্মীরে প্রবেশ করে থাকে তবে আরও ১ লক্ষ তৈরী হচ্ছে পাকিস্তানে।

নিরাপত্তা পরিষদে শ্রীশীতলবাদ জানিয়েছিলেন—আক্রমণকারীরা সংখ্যায় ৬০ হাজার। ১৯৪৮ সনের ৫ই মার্চ ভারত সরকার একটি হোয়াইট-পেপার প্রকাশ করেছিলেন। তাতে বলা হয় জেহাদে নিযুক্ত এই পাকিস্তানী পাঠানদের সংখ্যা ৮৬ থেকে ৮৮ হাজার। প্রতিদিন দলে তারা আরও ভারি হচ্ছে।

ওরা প্রধানত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপজাতীয় সম্প্রদায়ের লোক। ২৪৯৮৬ বর্গমাইলের রুক্ষ পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দা। এই এলাকার জনসংখ্যা তখন ২৩ লক্ষ ৭৮ হাজার। তাদের মধ্যে আছে—মাসুদ, ওয়াজির এবং আফ্রিদি। ওরা চেহারায় যেমন প্রবল, সভ্যতা সংস্কৃতিতে তেমনই দুর্বল। ইংরাজ সরকার ওদের বশে রাখতেন নগদ অর্থের বিনিময়ে। সেই ঘুষের টাকার নাম ছিল—'হাস্ মনি'। জিন্না সাহেব তাদের অন্যভাবে কাজে লাগালেন। তার জন্য এই বর্বর বাহিনী সাজিয়েছিলেন সীমান্ত প্রদেশের লীগ নেতা- আবদুল কায়ুম। এক ঢিলে একাধিক পাখি মারাই ছিল তাঁদের মতলব। প্রথমত, বিনা খরচে কাশ্মীর অধিকার করা যাবে। ন্যাশনাল কনফারেন্স জব্দ হবে। দ্বিতীয়ত এই সব দস্যুতুল্য উপজাতিগুলোকে তুষ্ট করা যাবে। ইংরেজের বকশিস বন্ধ হয়ে গেছে। পাকিস্তানের তহবিলে এমন অর্থ নেই যে যত্রতত্র সে টাকা ছিটিয়ে বেড়াতে পারে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তময় ধূমায়িত অসন্তোষ। কাশ্মীর লুঠের অধিকার পেলে ওরা নিশ্চয় তৃপ্ত হবে। তাছাড়া আরও একটি কাজ হবে। আবদুল গফফর খানের অনুচররা পাখতুনিস্তান চাইছে। কাশ্মীরের "ধর্মযুদ্ধ" হয়ত তাদেরও মতি পরিবর্তনে সাহায্য করবে। ১৯৬৫-তেও সন্দেহ নেই, এই মতলবগুলো কাজ করছে। রাওয়ালপিণ্ডির চক্রীরা শুধু কাশ্মীর চায় না, সীমান্তের পাঠানদের আন্দোলনকেও নষ্ট করতে চায়।

ভারতীয় ফৌজ যখন শ্রীনগরে নামছে "মুজাহিদ"রা তখন "জেহাদ" প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছে। হানাদাররা শ্রীনগর থেকে মাত্র পাঁচ মাইল পশ্চিমে বাদগাম পৌঁছে গেছে। ব্যস, ওই পর্যন্ত। পলকে হাওয়া বদল। তেরো দিনের মধ্যে বরমুলা মুক্ত হল। তারপর ক্রমে একের পর এক শহর, গ্রাম। নভেম্বরের মধ্যেই গান্দারবল এলাকা শত্রুমুক্ত হল। তৎসহ বিহামা, তুল্লামুল্লা, লার, নুনার এবং অন্যান্য আরও কয়টি অঞ্চল। বাদগাম, সুমবল, সাদিপুর দখলে এল,- মাহোরা পাওয়ার-হাউসও। দেখতে দেখতে ৮৪ মাইল দীর্ঘ এবং ৩০ মাইল চওড়া উপত্যকায় আবার শান্তি ফিরে এল। ভারতীয় ফৌজ এবার অন্যদিকে পা বাড়াল।

কোথাও বোমা-বর্ষণ, কোথাও সম্মুখ-সমর—ভারতীয় বাহিনী প্রবল পরাক্রমের সঙ্গে এগিয়ে চলল। ১৯৪৮ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে দেশরক্ষা মন্ত্রী সর্দার বলদেব সিং পার্লামেণ্টে জানান—পাঠানকোট থেকে লে পর্যন্ত ৬০০ মাইল বিস্তৃত রণাঙ্গনে ভারতীয় জওয়ানেরা লড়াই করছে। অফিসার

এবং সৈন্য মিলিয়ে ভারতীয় পক্ষে হতাহতের সংখ্যা ৯৫১ জন। শত্রুপক্ষের হতাহতের পরিমাণ প্রায় ১৫ হাজার। স্তূপীকৃত হানাদারের মৃতদেহ সেদিন ভারতীয় ফৌজের পেছনে।

শুধু একটিমাত্র ভুল। প্রত্যাশা ছিল সুবিচার পাওয়া যাবে; ভারত তাই নিরাপত্তা পরিষদের দরবারে অভিযোগপত্র নিয়ে হাজির হয়েছিল। সেদিন ১৯৪৮ সনের ১লা জানুয়ারি। কাশ্মীর সেদিন থেকেই এক আন্তর্জাতিক চক্রান্তে। সৈন্যরা যখন একের পর এক শত্রু ঘাটি দখল করছে, নিরাপত্তা পরিষদের কমিশন তখন মীমাংসার নামে চক্রান্ত জাল বুনে চলেছেন। অবশেষে তারই জের টানা হল "যুদ্ধ-বিরতি" প্রস্তাবে। দীর্ঘ ৪৩২ দিন লড়াই শেষে বিজয়ের চূড়ান্ত মুহূর্তে হাতের অস্ত্র আবার পিঠে তুলে নিতে হল ভারতীয় বীর সৈনিকদের। যুদ্ধ-বিরতি কার্যকর করা হয় ১৯৪৯ সনের ১লা জানুয়ারি, অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদে মামলা দায়ের করার পুরো এক বছর পরে।— কূটনৈতিক দাবা খেলার পক্ষে যথেষ্ট সময়!

খেলা ছাড়া আর কী! নিরাপত্তা পরিষদ কাশ্মীর নিয়ে যা করেছেন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার তুলনা মেলা ভার। ভারতের অভিযোগ ছিল হানাদারদের কাশ্মীরে পাঠিয়েছে পাকিস্তান। শুধু তাই নয়, তাদের পিছু পিছু পাকিস্তানী সৈন্যদলও কাশ্মীরে এসে হাজির হয়। পাকিস্তান অভিযোগ বেমালুম অস্বীকার করে। নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধি দল তথা "কাশ্মীর কমিশন" '৪৮ সালের জুলাইয়ে করাচী থেকে ঘুরে গিয়ে জানালেন - পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিজের মুখে স্বীকার করেছেন কাশ্মীরে তিন ব্রিগেড পাক সৈন্য রয়েছে। কিছুকাল পরে "কমিশনের" বদলে বিখ্যাত আইনবিদ সার ওয়েন ডিকসন মনোনীত হয়েছিলেন রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধি। তিনি তাঁর রিপোর্টে স্পষ্ট লিখে গেছেন : '৪৭ সনের অক্টোবরে হানাদারদের কাশ্মীর সীমান্ত পার হতে দিয়ে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে। পরের বছর মে মাস থেকে নিয়মিত পাকবাহিনীকেই পাঠান হয়েছে কাশ্মীরে। সেটাও নিঃসন্দেহে বে-আইনি আচরণ। পাকিস্তান তবুও পররাজ্য আক্রমণকারী বলে ঘোষিত হয়নি। পরিবর্তে ভারতকে দিয়ে রাজ্যে গণভোটের একটি প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সত্য বটে ১৯৪৭ সনের নভেম্বরে জওহরলাল নেহরু এক বেতার ভাষণে গণভোটের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তৎকালে পাকিস্তানের দাবি—ন্যাশনাল কনফারেন্স জনতার কেউ নয়, কাশ্মীরী মুসলমান আসলে জিন্না এবং পাকিস্তানের সমর্থক। নেহরু তাদের এই মিথ্যা প্রচারকে চিরতরে নস্যাৎ করতে চেয়েছিলেন হয়ত। তখন

নিরাপত্তা পরিষদ বা পাকিস্তান আসরে কেউ নেই। এ প্রতিশ্রুতি একান্ত ভাবেই ভারতের নিজস্ব ব্যাপার. সেই সূত্র ধরেই প্রথমে ১৯৪৮ সনের ১৩ই আগস্টের প্রস্তাবে, তারপর যুদ্ধবিরতির পরক্ষণে ১৯৪৯ সনের ৫ই জানুয়ারি নিরাপত্তা পরিষদ ভারতের কাছ থেকে গণভোট বা জনসাধারণের মতামত যাচাই করার প্রতিশ্রুতি আদায় করে। ভারত তাতে অসম্মত হয়নি। কারণ কথা ছিল তার আগে নিরাপত্তা পরিষদ প্রস্তাবের অন্য অংশগুলো পূর্ণ কববে। তার কয়েকটি : (ক) গোটা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকবে ভারতের হাতে (খ) যুদ্ধ-বিরতি রেখার ওপারেও যে জম্মু এবং কাশ্মীর সরকারের পূর্ণ সার্বভৌম অধিকার সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন তোলা হবে না। (গ) "আজাদ-কাশ্মীর" সরকার নামে কোন সরকারকে আইনসম্মত বলে মেনে নেওয়া হবে না (ঘ) অধিকৃত কাশ্মীরের কোন অংশ পাকিস্তান নিজ রাজ্যের সঙ্গে এক করতে পারবে না (ঙ) উত্তরে পাক-অধিকৃত অঞ্চল থেকে পাকিস্তানকে সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে এবং সেখানকার নিবাপত্তার ভার গ্রহণ করবেন ভারত সরকার। (চ) জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য পরিচালনায় পাকিস্তানের কোন রকমের কোন অধিকার থাকবে না, গণভোটে তো নয়ই। (ছ) যদি কোন কারণে গণভোট অনুষ্ঠান সম্ভব না হয় তবে অন্য কোন উপায়ে জনসাধারণের মতামত জানা হবে। (জ) পাকিস্তান যদি অতঃপর তার কর্তব্য পালন না করে তবে ভারতের পক্ষে গণভোটের বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

নিরাপত্তা পরিষদ তথা বিশ্ব জানে পাকিস্তান একটি প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করেনি। সার ওয়েন ডিক্সন (১৯৫০) এবং তাঁর পবে ডাঃ গ্রাহাম (১৯৫১-৫৩) অনেক সাধ্য-সাধনা করেছেন। কিন্তু পাকিস্তান তবুও অধিকৃত কাশ্মীর ছেড়ে যেতে রাজি হয়নি। শুধু গণভোট কেন, ভারতের তরফে বোধহয় কোন বিষয়েই অতঃপর কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। ভারত তবুও কাশ্মীরের জনসাধারণের মতামত সরকারীভাবে যাচাই করতে ইতস্ততঃ করেনি। ভারত মহারাজার প্রস্তাব গ্রহণ কবে ২৭শে অক্টোবর। ২৮শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী মেহের চাঁদ ঘোষণা করেন—কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সম্পূর্ণ। ৩০শে জরুরী মন্ত্রীসভা গঠিত হল রাজ্যে। ন্যাশনাল কনফারেন্স রাজ্যের অধিকার পেলেন। তারপব সাধারণ নির্বাচন। একবার নয় তিন তিনবার। পাকিস্তানী জনসাধারণও সে গণতন্ত্র ভোগ করার সুযোগ পাননি কোনদিন। শুধু তাই নয়, কাশ্মীর গণ-পরিষদ গড়েছে। দীর্ঘ বিচার বিতর্ক শেষে ১৯৫৬ সনের ১৭ই নভেম্বর কাশ্মীরী জন-প্রতিনিধিরা নিজেদের শাসন-তন্ত্র গ্রহণ করেছেন। পরের বছর, ১৯৫৭ সনের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে সে শাসনতন্ত্র চালু হয়েছে। তার মধ্যে একটি ধারায় স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে—জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই ধারাটির পরিবর্তনের অধিকার নেই কারুও।

শুধু তাই নয়, ১৯৪৯ সনের মে মাস থেকে কাশ্মীরের প্রতিনিধিরা ভারতের শাসন ব্যবস্থায়ও তাদের ন্যায্য অধিকার ভোগ করে আসছেন। ভারতীয় সংবিধানে কাশ্মীর সংক্রান্ত ধারাগুলো যখন রচিত হয় তখন কাশ্মীরী সদস্যরাও ছিলেন। ইদানীং ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের মিলনকে আইনের দিক থেকে সম্পূর্ণ করার জন্য যে সব পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে সেগুলোও কাশ্মীর রাজ্য বিধানসভার সম্মতির ভিত্তিতেই কার্যকর করা হচ্ছে। বলা যেতে পারে, কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ শাসনে গত আঠারো বছরে দু' একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। শেখ আবদুল্লা গ্রেফতার হয়েছেন, বক্সী গোলাম মোহম্মদও আপন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত নেই। ঘটনাগুলো সত্য। ভারত এবং আর দু'চারটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে পৃথিবীতে ক'টি দেশ পাওয়া যাবে যেখানে একই ব্যক্তি দশকের পর দশক সমান মহিমা নিয়ে আপন আসনে প্রতিষ্ঠিত আছেন। কাছেই উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাকিস্তান। শুধু সরকার অদল বদল নয়, খুনখারাপি থেকে শুরু করে ক্যুদেতা'র পর ক্যুদেতা' হয়ে গেছে সেখানে। দেশের ভূতপূর্ব প্রধান-মন্ত্রীর কারাবাসও পাকিস্তানে অজ্ঞাত ব্যাপার নয়। তাই বলে কী একথা বলা চলে—পাকিস্তানী জনসাধারণ ভারতে যোগ দেওয়ার জন্য পাগল!

কাশ্মীরী জনসাধারণ যে মোটেই পাক-প্রণয়ী নয়, '৪৭-'৪৮ সনের ঘটনাবলী তা নির্ভুলভাবে প্রমাণ করেছিল। '৬৫'-র কাশ্মীরও আবার একই কথা রক্তের অক্ষরে লিখে দিল। কাশ্মীর বিশ্বকে আবার জানিয়ে দিল জেহাদের ধ্বনি তুলে অস্ত্র হাতে যারাই আসুক, কাশ্মীর হবে তাদের গোরস্থান।

আশ্চর্য, তবুও আসে।

ব্যর্থ পাকিস্তান আবার বেছে নিয়েছে মধ্যযুগীয় পথ। '৬৫তে আবার ঝাঁকে ঝাঁকে হানাদার নেমে এসেছে কাশ্মীরে। সঙ্গে তাদের পাকিস্তানী ফৌজ। কিন্তু ইতিহাস তবুও এবার অন্য রকম হতে বাধ্য। মহারাজা হরি সিং আজ আর কাশ্মীর-রাজ নন। ১৯৫২ সনেই তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন। '৬১ সনের ২৬শে এপ্রিল শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন কাশ্মীর-রাজ। রাজ-তরঙ্গিনীর দেশ কাশ্মীরে এখন পরিপূর্ণ জনতার রাজত্ব। ক'বছর আগেও যিনি ছিলেন "যুবরাজ", আজ তিনি রাজ্যের "রাজ্যপাল" মাত্র। কাশ্মীরের ইতিহাসে এতদিনে এই প্রথম গণতন্ত্র। প্রজাসাধারণের রাজত্ব। এতদিন পরে আবার নতুন করে আবার স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে বিশাল ভারত আর তার চিরকালের অঙ্গ কাশ্মীরের মধ্যে। জনৈক ভুট্টোর সাধ্য কি আবার হাজার বছরের এই ইতিহাসকে জং-ধরা তলোয়ারের মুখে অন্য পথে নিয়ে যান। এটা বিশ শতক।

কাশ্মীরের শেরের আখের

॥ এক ॥

এই তো মাত্র কিছুদিন আগে, ৮ই এপ্রিল (১৯৬৪), জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কাশ্মীরী শের শেখ আবদুল্লা শ্রীনগর এসে পেঁৗছেছিলেন, তখন কমসে কম আড়াই লক্ষ লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে বিমান বন্দরে ভিড় করে এসেছিল। আর সেই শেখ সাহেবেরই সঙ্গে একই বিমানে আমি ৩০শে আগস্টের (১৯৬৪) সকালে শ্রীনগরের বিমান ঘাটিতে গিয়ে পেঁৗছলাম। তখন দেখি, এরই মধ্যে সব ভোঁ ভোঁ।

তবু আমি কান পেতে রেখেছিলাম এবং সত্যি বলতে কি শেখ আবদুল্লার নামে জয়ধ্বনিও শুনেছিলাম। কিন্তু সেই ধ্বনিতে সাগরের বা মেঘের গর্জন আদৌ ছিল না। সে ধ্বনি যেন পাহাড়ী কোন ঝোরার তিরতিরে ধারার স্তিমিত আওয়াজ।

বিমান ঘাটির বাইরে ১২ খানা ভাড়া-করা বাস দাঁড়িয়েছিল। বিনি পয়সায় বাসে চড়াবার লোভ দেখিয়ে শেখ সাহেবের চেলারা তাঁর সম্বর্ধনার জন্য এই বাসগুলো বোঝাই করে লোক এনেছিল। কিন্তু তারাও এর বেশি লোক আমদানি করতে পারেনি। কী অবিশ্বাস্য দ্রুততায় যে শেখ আবদুল্লার ফেনিল জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়ে গিয়েছে, নিজের চোখে না দেখলে আমার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত হত।

কাশ্মীরের রাজনীতিতে শেখ আবদুল্লার পায়ের নিচে থেকে যে মাটি সরে গিয়েছে, এই নিষ্ঠুর সত্যটি সম্ভবত সবার আগে শেখের নিজের চোখেই ধরা

পড়ে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর শ্রীনগর থেকে প্রায় চার মাইল দূরে সওরায় তাঁর গ্রামের বাড়িতে শেখের সঙ্গে আমার যখন দেখা হল, তখন তাঁর অস্থির পদচারণা আর চোখে মুখে ফুটে ওঠা ক্লান্তি আর হতাশার বলিরেখা এই কথাই মনে করিয়ে দিল, তিনি এখন কক্ষচ্যুত গ্রহ। শেখ আবদুল্লা এখন নিঃসন্দেহে ভেকধারী শের।

শেখ সাহেবের বৈঠকখানার দেওয়াল জুড়ে তাঁর বিগত কীর্তির অনেক রকম ফটো। পুরু পর্দার বাধা সরিয়ে সকালের আলো যথেষ্ট আসতে পারেনি। তাই কি ফটোগুলোকে এত স্তিমিত লাগছিল? ১৯৫৩ সালের এক ছবি—নেহরু ও আবদুল্লা পরস্পর আলিঙ্গনে আবদ্ধ। সেই সময় আবদুল্লা কাশ্মীরী ভাষায় যা বলেছিলেন, তার অর্থ "আমরা হৃদয়ের বন্ধনে বাঁধা পড়েছি। এ বন্ধন ছিন্ন করে এমন সাধ্য কারও নেই।" তারই পাশে বার্ধক্যভারে অবনত নেহরুর সাম্প্রতিক আরেকখানি ছবি, ছবিতে একটা মালা ঝুলছে। আর সুদৃশ্য ম্যাণ্টলপিসের উপব পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর হৃষ্টপুষ্ট ছবিখানা ।শ্বর অথচ স।ন্দহজড়িত চোখে চেয়ে আছে। আবদুল্লা যেখানে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বসলেন, সেখান থেকে নেহরুর দূরত্ব বেশি, আয়ুব নিকটে।

টুরিসট প্রসঙ্গে শেখ বললেন, পাকিস্তান থেকে লোক যতদিন না আসতে পারবে, ততদিন পর্যন্ত কাশ্মীরের টুরিজ্‌ম্‌ ব্যবসার একটা অঙ্গ পঙ্গু হয়ে থাকবে। তিনি বললেন, ভারত থেকে বাণিহাল গিরিপথ হয়ে কাশ্মীরে আসার পথের উপর অতটা ভরসা রাখা যায় না। এই রাস্তাটা কাঁচা ভিতে তৈরি। "পিণ্ডি থেকে শ্রীনগরের পথ অনেক বেশি স্টেব্‌ল্‌। ওটাই খানদানী পথ।"

প্রায় এক ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে কথা হল। বার বার বলা কথার ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি। শেষ পর্যন্ত যা বললেন, তার মো া কথাটি হল, "আমাকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করে, বিনা বিচারে আটক রেখে ভারত সরকার যে মসীময় দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন, তাতে ভারতীয় গণতন্ত্রের উপর কাশ্মীরী মুসলমান মাত্রেরই আর কোনও ভরসা নেই। এখন তারা আত্মনিয়ন্ত্রণ চায়।"

স্পষ্টতই বোঝা গেল, সংবাদপত্রের গলাধঃকরণের জন্যই এই মন্তব্যটি শেখ আবদুল্লার একটি সুপরিকল্পিত টোপ। এই শেখ আবদুল্লাই কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গ মহলে বলে বেড়িয়েছেন, শেখ সাহেবের জেলে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর জন্য তিনি বা তাঁর সরকার দায়ী নন, দায়ী তাঁর কোন এক বিশ্বস্ত সহকর্মীর গাফিলতি।

ন্যায় নীতি সম্পর্কে শেখ আবদুল্লার মাপকাঠি পাত্রভেদে বহুবার বদল হয়েছে। এবং এত বদলেছে বলেই আজ শেখ সকলের কাছেই এক দুর্জ্ঞেয় চরিত্র। এবং তিনি সকলকেই হতাশ করেছেন।

শেখ আবদুল্লার মুক্তির পরে দেশে ও বিদেশে এমন একটা আশার সৃষ্টি হয়েছিল যে, এই বুঝি কাশ্মীরের জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। যেন

শেখ আবদুল্লাই কাশ্মীর। যেন তাঁর মতামতই কাশ্মীরের মতামত।

শেখ আবদুল্লার মুক্তি এই কাল্পনিক 'সোনার হাঁস'টিকে জবাই করেছে। তাই আজ শেখ আবদুল্লার প্রতি পাকিস্তান বীতশ্রদ্ধ, ভারত সন্দেহগ্রস্ত আর কাশ্মীরের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষেরা রীতিমত বিরক্ত। শুধু তাই নয়, শেখ যে-গণভোট ফ্রন্টের নেতা, আজ সেখানেও তাঁকে নিয়ে ভাঙ্গন ধরেছে।

কাশ্মীরে এবার নানাকারণে টুরিসটদের সমাগম কম। হোটেলওয়ালা, হাউস-বোটের মালিক, শিকারার মাঝি, টাঙ্গাওয়ালা, দোকানদারদের চোখে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। তাদের এই দুর্ভাগ্যের জন্য তারা আজ একবাক্যে শেখ আবদুল্লাকে দায়ী করছে। "দেখুন, শেখ সাহেবকে ছেড়ে দিয়ে সরকার ভালো করেননি।"—এক শিকারার মাঝির মুখে প্রথম যখন এই ক্রুদ্ধ উক্তি শুনি, তখন আমি বিস্ময়ে রীতিমত চমকে উঠেছিলাম। পরে আরও অনেকের মুখে এই একই কথা বার বার শুনেছি।

শেখ আবদুল্লার স্ফীত অবয়ব থেকে এত তাড়াতাড়ি হাওয়া বেরিয়ে যাওয়ার কারণ কী এই প্রশ্নেরই উত্তর খুজতে কাশ্মীরের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আলোচনা করেছি।

এবং এই আলোচনার ফল একটি কথাতেই প্রকাশ করা যায় . শেখ আবদুল্লা নতুন কিছু দিতে পারেননি।

"আসলে শেখ কী চান?" কাশ্মীরের জনৈক তরুণ অফিসার এক সন্ধ্যায় হঠাৎ মুখ খুললেন, "আমাদের পক্ষে বোঝা শক্ত।" গণভোট? গণভোট কিসের জন্য?

শেখ সাহেব স্পষ্ট করে এ বিষয়ে কিছু বলছেন না। এদিকে আওয়ামী অ্যাকশন কমিটি—যার সঙ্গে তিনি রাজনীতির গাঁটছড়া বেঁধেছেন—পরিষ্কার-ভাবে জানিয়ে দিয়েছে, কাশ্মীরের সামনে দুটো পথ। হয় ভারতে থাক, নয় পাকিস্তানে যাও। এবং একথা কে না জানে, অ্যাকশন কমিটির নওজওয়ান নেতা মৌলানা ফারুকের টান পাকিস্তানের দিকে।

প্রতিটি জনসভায় মৌলানা ফারুক আবদুল্লার আদ্যশ্রাদ্ধ করছেন। এবং এই বিষয় নিয়ে শেখ আর মৌলানার সমর্থকদের মধ্যে নিত্য চোরাগোপ্তা লড়াই চলেছে। তিরিশ বছর আগে জওয়ান আবদুল্লা ফারুকের কাকার হাত থেকে কাশ্মীরের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। আজ চব্বিশ বছরের জওয়ান ফারুক কি তার বদলা নিতে এগিয়ে আসছে?

ফারুক ঘোর সাম্প্রদায়িকতাবাদী, একজন শিক্ষিত কাশ্মীরী সন্তান। তবু তাকে বোঝা যায়, তার চিন্তায় গোজামিল নেই। গণভোট হলে সে প্রাণপণে কাশ্মীরকে পাকিস্তানে ঠেলে দেবার চেষ্টা করবে। আজ কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লার চেয়ে ফারুকের মাটি বরং শক্ত।

"স্বাধীন কাশ্মীরের ধ্বনি তোলা যে আজকের জগতে অবান্তর, শেখ সাহেব তা মানতে না চাইলেও কাশ্মীরের প্রতিটি শিক্ষিত লোকই তা বোঝে। তাই এ বিষয়ে তাদের ভড়কি দেওয়া শক্ত।" একজন মুসলমান অফিসার জোর দিয়ে বলে উঠলেন।

সমস্যাটা খুবই জটিল। এক এক করে আলোচনা করা যাক। একদিকে ভারত, একদিকে পাকিস্তান, একদিকে চীন, একদিকে রাশিয়া। এই তো কাশ্মীরের চৌহদ্দি। কে তাকে স্বাধীন থাকতে দেবে? কাশ্মীর কি অর্থ-নীতির দিক থেকে আত্মনির্ভর কখনো হতে পারে? দ্বিতীয়ত গণভোটের কথাই ধরুন। কিভাবে গণভোট নেওয়া হবে? গণভোট গ্রহণের প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে পাকিস্তান কাশ্মীর থেকে সৈন্য সরিয়ে নেবে। এই শর্ত প্রতিপালন করতে কে তাকে বাধ্য করবে? ভারত যে মুহূর্তে সৈন্য সরিয়ে নেবে, সেই মুহূর্তে চীন যে কাশ্মীরকে কুক্ষিগত করে ফেলবে না, এ গ্যারাণ্টি কে দিতে পারে? ইউ এন ও পারে? শেখ আবদুল্লা পারেন? তৃতীয়ত কার তত্ত্বাবধানে গণভোট গৃহীত হবে? রাজনীতিতে পৃথিবীতে এমন মহা-মানব কে আছেন, যিনি নিঃস্বার্থ? চতুর্থত গণভোটের রায় ভারতের পক্ষে গেলে পাকিস্তান তা মেনে নেবে, এরই কি কোনও গ্যারাণ্টি আছে? রাজনৈতিক দুরাত্মার কি ছলের অভাব হয়? পঞ্চমত যদি উল্টোটাই হয়, যদি কাশ্মীর পাকিস্তানের পক্ষেই রায় দেয়, তাহলে কাশ্মীরী হিন্দুদের অবস্থা কি দাঁড়াবে? লাদকী বৌদ্ধদের? তাঁরা ভিটেমাটি ছেড়ে আবার উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে যাবেন? ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার ভিতে যে প্রচণ্ড আঘাত পড়বে, তার ফলে কয়েক কোটি ভারতীয় মুসলমানের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত [illegible] পড়বে। এই জুয়াখেলার দায়িত্ব পাকিস্তান কি নিতে প্রস্তুত? সবশেষে, গণতান্ত্রিক ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে থাকায় কাশ্মীরী জনসাধারণ যে গণতান্ত্রিক অধিকারটুকু ভোগ করছে, পাকিস্তানের সামরিক একনায়কত্ব কি তা হরণ করবে না?

আজ পর্যন্ত শেখ আবদুল্লাকে এই কঠোর বাস্তব প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন হতে দেখা যায়নি। কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী জনাব সাদিকও এক সন্ধ্যায় ধীর-স্থিরভাবে এইসব সমস্যার আলোচনা আমাদের সঙ্গে করলেন। বললেন, "সমস্যাটা এখন ডালপালা গজিয়ে এত জটিল হয়ে পড়েছে যে উত্তেজনা ছড়িয়ে তার সমাধান বের করা সম্ভব নয়। আমার কাছে কাশ্মীরের অর্থনৈতিক সমস্যাটাই জরুরী। লোকের পেট খালি থাকলে মগজ অস্থির হয়ে উঠে।"

উঁচু মহলের একজন আমাকে বললেন, "শেখ সাহেব নিজের জালেই জড়িয়ে পড়েছেন। কাশ্মীর এবং ভারত সরকার শেখ সাহেবকে শহীদ হবার সুযোগ আর যাতে না দেন, আমাদের এখন কর্তব্য হবে সেইদিকে লক্ষ্য রাখা।

শেখ সাহেবের সামনে এখন দুটি মাত্র পথই খোলা আছে, হয় শহীদ হওয়া আর না হয় ভূদান আন্দোলনে যোগ দেওয়া।"

॥ দুই ॥

শেখ মহম্মদ আবদুল্লা ভূদান আন্দোলনে যোগ দেননি। তিনি "শহীদ" হবার পথই বেছে নিয়ে আবার কারাবরণ করেছেন। কাশ্মীরের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ থেকে যাতে সরে না যান, সেইজন্যই শেখ সাহেবের এই মরীয়া প্রচেষ্টা। হজ্ করতে বেরিয়ে পাকিস্তানী দূতাবাসের মদতে তিনি ভারতের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে প্রচারে নেমেছিলেন। কারণ ভারতে ফিরে এসে কারারুদ্ধ হবার এর চেয়ে ভাল রাস্তা তিনি আর উদ্ভাবন করতে পারেননি।

তাঁর সাম্প্রতিক বিদেশ সফরে পাকিস্তানী দূতাবাসগুলোর সঙ্গে দহরম মহরম আর ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারে অনেকেই ভেবেছিলেন, শের-ই-কাশ্মীর বোধ হয় আর ভারতে ফিরবেন না। কাশ্মীরের স্বরাষ্ট্র দফতরের এক মুখপাত্রের কাছে দিল্লিতে এই সন্দেহের কথা ব্যক্ত করতেই তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন, "আবদুল্লা দুগ্ধপোষ্য বালক নন, তিনি ঝানু পলিটিশিয়ান। পাকিস্তানে তাঁর স্থান কোথায়, তা তাঁর চেয়ে ভালো কেউ জানে না। ভারত ছাড়া তাঁর গতি কোথায়? এখনও তিনি আশা রাখেন, কাশ্মীরে তাঁর আধিপত্য আবার স্থাপিত হবে।"

"তাহলে," একজন সাংবাদিক প্রশ্ন তুলেছিলেন, "শেখ সাহেবের ভারত-বিরোধী এইসব আচরণ কি তাঁর পক্ষে আত্মহত্যার সামিল নয়? এখানে এলেই তো তিনি গ্রেপ্তার হবেন।"

--"আবদুল্লা যে এইটাই চাইছেন না, তা কে বলতে পারে? স্বাধীনতা সংগ্রামে কারাবরণ করাটাকে আমাদের নেতৃবৃন্দ কি শক্তি সঞ্চয়ের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন নি?"

আবদুল্লা কি পাকিস্তানী চর? উগ্রতর ভারতীয় জনমত এই প্রশ্নের জবাবে যে একবাক্যে "হ্যাঁ" বলবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রশ্নের আমার উত্তর স্পষ্টতই "না।" যদিও এই বৃদ্ধ বয়সে জনপ্রিয়তা অর্জন করার জন্য আজ আবদুল্লাকে সভা-সমিতিতে ভাষণ দেবার আগে কোরাণের বয়েৎ আওড়াতে হয়, তবু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, কাশ্মীরে রাজনীতি থেকে ধর্মান্ধ মোল্লাদের প্রভাব খর্ব করার ব্যাপারে আবদুল্লার দান সব থে

বেশি। তেমনি কাশ্মীরকে পাকিস্তানের গ্রাস থেকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারেও।

"আমরা স্থির করেছি, ভারতের সঙ্গে কাজ করব, ভারতের জন্যই মরব।" এই উক্তি কাশ্মীরের শেরেরই। ১৯৪৮ সালে ৬ মার্চ দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি এই ঘোষণা করেছিলেন। বলেছিলেন, "আমাদের এই সিদ্ধান্ত অকটোবর (১৯৪৭) মাসেই নেওয়া হয়নি, নিয়েছি ১৯৪৪-এ, জিন্নার প্রেম নিবেদন আমরা তখনই প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। আমাদের সেই প্রত্যাখ্যান ছিল সুনিশ্চিত।"—(স্টেটসম্যান, ৭ মারচ, ১৯৪৮ থেকে অনূদিত) তিনি আরও বলেছিলেন :

Ever since, the National Conference had attempted to keep the State clear of the "pernicious" two-nation theory while fighting "the world's worst autocracy".

এই আবদুল্লাই অধুনা যে উগ্র ভারতবিরোধী তার কারণ পাকিস্তানপ্রীতি নয় কাশ্মীরের রাজনীতিতে সর্বেসর্বা হবার তাঁর আকাশচুম্বী অভিলাষ। আর এর জন্য পাকিস্তান আদৌ দায়ী নয়। "শেখ আবদুল্লাই কাশ্মীর" এই ধারণা পাকিস্তানের নয়, ভারতেরই সৃষ্টি। ক্ষমতাই শুধু নয়, ক্ষমতার স্বপ্নও মানুষকে (তিনি যদি সেকুলারও হন, গণতন্ত্রীও হন) ভ্রষ্টচরিত্র করে, শেখ মহম্মদ আবদুল্লা তার শোচনীয় এক সাক্ষী। আবদুল্লা যেদিন থেকে বুঝতে পারলেন, নেহরুর ভদ্রতা, উদারতা, অন্ধ স্নেহ এবং দুর্বলতা তাঁর দুর্বার আকাঙ্ক্ষা (আবদুল্লাই কাশ্মীর) চরিতার্থ করার পথে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না, সেদিন থেকেই তিনি সুর পালটালেন। "নতুন কাশ্মীর" পালায় শেষ রজনী ঘটিয়ে "স্বাধীন কাশ্মীর" পালার সূচনা করলেন। আর তার ধুয়া হল গণভোট।

আবদুল্লার এ খেয়াল পর্যন্ত রইল না যে, কাশ্মীরে গণভোট নেওয়ার বিরোধিতা করে শেষ কথা তিনি বলে দিয়েছেন। ১৯৪৯ সালের মে মাসে শ্রীনগর থেকে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য তিনি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে এই কথা বলেছিলেন :

"আমরা আমাদের জনসাধারণের জন্য যা চাই, তা হল শান্তি আর সমৃদ্ধি। স্বাতন্ত্র্যকে মনোহর ধারণা বলে মনে হতে পারে এবং তা তাই-ই। কিন্তু এ সম্পর্কে আমি আগেও যে প্রশ্নটি তুলেছি : এটা কি বাস্তবও? এর পিছনে কি প্রয়োজনীয় সমর্থন এবং এটা রক্ষা করার গ্যারাণ্টি পাওয়া গিয়েছে? কাশ্মীরের মত ছোট্ট একটা দেশ, সীমাবদ্ধ সামর্থ্য নিয়ে তা রক্ষা করতে পারবে কি? অথবা সংশ্লিষ্ট দেশগুলো তাদের স্বাভাবিক রাজনৈতিক মেজাজে বর্তমানে স্বেচ্ছায় এ বিষয়ে সম্মতি দেবে? শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক-ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার দ্বারা আমরা কি নীতিজ্ঞানহীন কোনও শক্তিশালী দেশের শিকার হয়ে উঠব না?"—(হিন্দু, ১৮ মে, ১৯৪৯)

এখন ভাবতেই অবাব লাগে যে এই উক্তি শেখ আবদুল্লার, অবাক লাগে যে তিনি, স্বয়ং আবদুল্লা, স্বাধীন কাশ্মীরের প্রস্তাবকে "শুধুমাত্র তাত্ত্বিক" বা "অকার্যকর"ই আখ্যা দেননি, "অর্থহীন" বলেও উড়িয়ে দিয়েছেন। এবং বলেছেন :

Recently, during the Srinagar Convention, Kashmir reiterated its faith in accession to India. Need the National Conference and the people of Kashmir give any further proof of their firmness for the ideal they have chosen for themselves?"—(Hindu, May 18, 1949)

কাশ্মীরের 'মুক্তি'র জন্য পাকিস্তানের এত মাথাব্যথা কেন, এই প্রশ্নেরও সব থেকে ভাল জবাব শেখ আবদুল্লাই দিয়েছেন। ১৯৪৮ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী নয়া দিল্লির আজাদ পারকের এক সভায় আবদুল্লা বলেছিলেন, জিন্না কেন যে পাকিস্তানকে কুক্ষিগত কবতে চান তাব কারণ খুব স্পষ্ট।

'১৯৪৪ সালে জিন্না সাহেব আমাদেরকে তাঁর দলে ভেড়াবাব জন্য, তাঁর দুই-জাতিতত্ত্বে আমাদের সমর্থন আদায় করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। অবিশ্যি ভারতের অন্যান্য অংশে এ বিষয়ে তিনি সফল হন এবং পাকিস্তান কায়েম হয়। পাকিস্তান হল অথচ কাশ্মীর মুসলমানদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তার বাইরে থাকল— এইটাই তাঁর তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করে দিল। যে নীতির ভিত্তির উপব পাকিস্তান গড়ে উঠল কাশ্মীর তারই সারবত্তাকে চ্যালেন্‌জ করল। সুতরাং মিষ্টি কথা বলে তিনি যা পেতে ব্যর্থ হলেন, তরোয়ালের জোবে তা আদায় করতে এগিয়ে এলেন।'— (ষ্টেটসম্যান, ২০ ফেবরুয়ারী, ১৯৪৮)

আজ যে আবদুল্লা 'স্বাধীন কাশ্মীরে'র জিগির তুলেছেন সেই তিনিই সেদিন বলেছিলেন, 'ভারতে অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত কাশ্মীর তাড়াহুড়ো করে গ্রহণ করেনি। এই সিদ্ধান্ত অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করেই নেওয়া হয়েছে।'

গান্ধীজীর আদর্শে বিশ্বাসী শেখ সাহেবের সেদিনের বক্তব্য ছিল এই :

২৪

'The people of Kashmir were opposed to the supremacy of one community over the other. They believed in the equality of Hindus, Muslims and Sikhs, and were determined to fulfill Mahatma Gandhi's mission even if the people of the rest of India failed to do so'.—(Statesman, Feb. 20, 1948)

পরবর্তী জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার নেশায় এ সমস্ত কথাই বিস্মৃত হয়েছিলেন শেখ। ১৯৬৪ সালের সেপটেম্বরের গোড়ার দিকে এক প্রসন্ন সকালে আমি

যখন তাঁর গ্রামের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি তখন এই নীতি তিনি পরিত্যাগ করেছেন। তিনি সেদিন বলেছিলেন, 'বাঙ্গালীরা স্বভাবতই স্বাধীনচেতা, আশা করি কাশ্মীরীদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার মূল্য তোমরাই সব থেকে ভাল বুঝতে পারবে। কাশ্মীর যদি ভারতের হয়, এবং ভারত যদি স্বাধীন থাকে, তাহলে কাশ্মীরীরা স্বাধীনতা হারায় কিসে? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে শেখ সাহেব কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। বলেছিলেন, আইনের বাঁধন অপেক্ষা জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষার মূল্য তাঁর কাছে অনেক বেশি।

আকাঙ্ক্ষা জনসাধারণের অথবা তাঁর? 'ইনডিয়ান এক্সপ্রেসে'র এক সংবাদদাতার এই প্রশ্নে তিনি একটু গরম হয়েই বললেন, 'আমি বরাবরই জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষাকেই প্রকাশ করে এসেছি।'

॥ তিন ॥

কাশ্মীর থেকে ফেবাব পথে 'ইনডিয়ান এক্সপ্রেসে'র সেই সংবাদদাতা আমাকে বলেছিলেন, "আবদুল্লার জন্য আমার দুঃখ হয়। এই 'মেগালো-ম্যানিয়াই' তাঁর পতন ঘটাবে। আমি অনেকদিন ধরে শেখ সাহেবকে জানি। এখন তিনি নিজেকে ছাড়া আর কাশ্মীর দেখতে পান না। সম্ভবত সেই কারণেই তাঁর কোন কোন বিদেশী অনুরাগী রহস্যচ্ছলে তাঁকে 'কিং আবদুল্লা' বলে উল্লেখ করে থাকেন। সাধারণ এক মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানের পক্ষে এইখানে উত্তরণ নিতান্ত কম কথা নয়।"

আবদুল্লার বাপ-দাদার পেশা ছিল শালের কারবার। পিতৃহীন (জন্মের আগেই তাঁর বাবার মৃত্যু হয়েছিল) ছেলেকে খানদানি কারবাবে না ঢুকিয়ে মা তাকে পড়তে পাঠালেন। শ্রীনগর থেকে তরুণ আবদুল্লা এনট্রান্স পাশ করলেন। তারপর জম্মুর প্রিন্স অব ওয়েলস কলেজ থেকে আই এ, লাহোর কলেজ থেকে বি এ। শেখ আবদুল্লা তখন বাইশ বছরে পড়েছেন। তারপর আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এসসি ডিগ্রী নিয়ে ফিরে এসে শ্রীনগরের সরকারি হাই স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষকের চাকবি নিলেন।

আশ্চর্যের কথা, আলিগড়ের প্রভাবে লীগপন্থী হিসাবেই আবদুল্লার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল। কিন্তু ধর্মের গোঁড়ামি তাঁর সইল না। বর্তমানে এ্যাকসন কমিটির সব থেকে যে তেজি নেতা মৌলানা ফারুক, পাকিস্তানের পক্ষে যাঁর সমর্থন সোচ্চার, এবং কাশ্মীরে আবদুল্লার সব থেকে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী—১৯৩৮ সালে তাঁরই কাকার হাত থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে

নিয়েছিলেন শেখ আবদুল্লা। মোল্লাতন্ত্রী রাজনীতির বিরুদ্ধে তাঁর সেদিনের আক্রমণ ছিল অপ্রতিরোধ্য। তাঁরই উদ্যোগে মুসলিম কনফারেন্স রূপান্তরিত হল ন্যাশন্যাল কনফারেনসে। সদস্যপদে যোগদানের জন্য হিন্দু, মুসলিম, শিখ সকলকেই আহ্বান জানানো হল। কাশ্মীরের নেতা ভারতের রাজনীতিরও অন্যতম নায়কে পরিগণিত হলেন। ন্যাশনাল কনফারেন্স স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে 'নয়া কাশ্মীর' প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী গ্রহণ করল। শুরু হল আন্দোলন। মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই আন্দোলনে অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই সংগ্রামে ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের পাশে এসে দাঁড়ালেন। আর তখন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ভূমিকা কী ছিল? নয়া কাশ্মীর আন্দোলনকে মুসলিম লীগ ভালো চোখে দেখেনি। প্রকাশ্যেই তারা রাজা হরি সিং-এর স্বৈরতন্ত্রী সরকারকে সমর্থন জানিয়ে এসেছে। জিন্নার কথায় এই আন্দোলন 'malcontents out to destroy law and order'.

১৯৫০ সালে ১ মে, রেডিও কাশ্মীরের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা দিবসে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা তাই আবার জানিয়ে দিয়েছিলেন : নীতি এবং আদর্শের দিক দিয়ে পাকিস্তান আর কাশ্মীর 'যেন দুটো সমান্তরাল রেখা,' এরা কখনই মিলিত হতে পারে না। পাকিস্তানী নীতি এবং আমাদের রাজনৈতিক মতবিশ্বাসের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। ঘৃণার মন্ত্রে পাকিস্তানের অস্তিত্ব টি'কে আছে কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠন ন্যাশন্যাল কনফারেন্স বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য আর সহিষ্ণুতায় বিশ্বাস রাখে। এই মৌলিক পার্থক্যই ন্যাশন্যাল কনফারেন্সকে যেমন মুসলীম লীগের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে তেমনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে একই সূত্রে বেঁধে দিয়েছে।

'মতবাদের এই সংঘাতের জন্যই পাকিস্তান কাশ্মীরকে আক্রমণ করেছে এবং ভারত কাশ্মীরের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। সেই কারণেই আমরা বলি, কাশ্মীরের ভারতভুক্তি চূড়ান্তভাবেই হয়েছে। এবং যতদিন আমাদের লক্ষ্য এবং আদর্শ এক থাকবে, অতীতে যেমন ছিল, ততদিন এটাও টিকে থাকবে।–(ট্রিবিউন, ২ মে, ১৯৫০)

ভারতে এখনও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতা যে অক্ষুণ্ন আছে শেখ আবদুল্লা তাঁর সাম্প্রতিক কোন ভাষণেই অস্বীকার করেননি। তবে কী এমন ঘটল, যে শেখ সাহেবকে তাঁর আগেকার সকল আচরণে এবং কথায় তিনি উলটো দিকে মোড় ফিরলেন?

॥ চার ॥

যৌবনে আবদুল্লার এক রূপ : আদর্শবাদী যোদ্ধা, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সওয়ার। এখন জীবন সায়াহ্নে এসে তিনি ভারসাম্য রহিত দূরাকাঙ্ক্ষী এক অজিটেটার মাত্র। তাই যুবক আবদুল্লা আর প্রৌঢ় আবদুল্লায় কোন মিলই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই যুবক আবদুল্লার উক্তি প্রৌঢ় আবদুল্লা ক্রমাগত নস্যাৎ করে চলেছেন। যুবক আর প্রৌঢ় আবদুল্লার মধ্যে আজ যদি সংলাপ বিনিময় হয়, তবে এই দুজনের কথাবার্তা শুনতে সত্যিই অদ্ভুত লাগবে। কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক :

আদর্শবাদী আবদুল্লা : আমরা স্থির করেছি, ভারতের সঙ্গে থাকব এবং সেজন্য প্রাণ দিতে হলেও দেব।—(স্টেটসম্যান, ৭ মারচ, ১৯৪৭)

উচ্চাকাঙ্ক্ষী আবদুল্লা : ভারতপ্রেমী মুসলমানমাত্রই বিশ্বাসঘাতক।—(১৯৬৫ সালের ১৫ জানুয়ারি, হজরতবাল জমায়েতে ভাষণ)

যুবক আবদুল্লা : ভারত ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করেছে এবং আমরাও ওই একই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছি।—(দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে উক্তি, ন্যাশন্যাল হেরালড, ১৯ জুন, ১৯৪৮)

প্রৌঢ় আবদুল্লা : ভেবে অবাক হই, যে-ভারতে মুসলমানদের ধর্ম এবং জীবন বিপন্ন, সেখানে তারা টিঁকে আছে কেমন করে।—(সওরা মসজিদে ভাষণ, ২৭ নবেমবর, ১৯৬৪)

সেই আবদুল্লা : এক বছরেরও বেশি আমরা ভারতের মতিগতি লক্ষ্য করেছি, তারপর চিরস্থায়ী ভারতভুক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে [illegible]। এই সিদ্ধান্ত বংশ-পরম্পরায় এই রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীর ভাগ্য নির্ধারণ করে চলবে।—(হিন্দুস্থান টাইমস, ১৬ অকটোবর, ১৯৪৮)

এই আবদুল্লা : যদি শান্তির পথে কাশ্মীরের জনসাধারণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার না পাওয়া যায় তবে হিংসার পথ অবলম্বন করতে হবে।—(হজরতবাল জমায়েতে নমাজান্তিক ভাষণ, ১৮ সেপটেমবর, ১৯৬৪)

আবদুল্লা (১৯৪৮) : আমাদের রাজ্যের ইতিহাসের চরমতম দুর্দিনে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং ভারতের জনতা যে সাহায্য করেছে, আমরা সে-কথা কখনই ভুলব না।—(হিন্দুস্তান টাইমস, ১৬ অকটোবর)

আবদুল্লা (১৯৬৫) : কংগ্রেসে যারা যোগ দিচ্ছে, অথবা তাকে সমর্থন জানাচ্ছে, তাদেরকে একঘরে কর, কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে—বিয়ে-শাদী, মিলাত এমন কি শবানুগমনেও—তাদের যেন ডাকা না হয়।—(৫ ফেবরুয়ারি, মক্কা যাত্রার প্রাক্কালে শ্রীনগর থেকে প্রদত্ত ফতোয়া)

আবদুল্লা (১৯৪৯) : যে প্রেম ও সত্যকে আদর্শ করে গান্ধীজীর জীবন

কেটেছে, যার জন্য তিনি প্রাণ দিয়েছেন, কাশ্মীরীরা সেই আদর্শ বজায় রাখার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ...(জম্মুতে ভাষণ, ট্রিবিউন, ৪ ডিসেমবর)

আবদুল্লা (১৯৬৫) : কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলনে যোগ দিতে যারা আপত্তি জানিয়েছে, তারা মুসলিম কৌমের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে এবং "তাদের কবর তারা নিজেরাই খুঁড়ছে।"- (১৫ জানুয়ারি, হজরতবালে প্রতিবাদ দিবসের **ভাষণ)**

উচ্চাকাঙ্ক্ষার সেই ছলনাময় স্বর্ণমৃগের পিছনে ধাওয়া করে করে পরিশ্রান্ত এবং হতাশায় তিক্ত শেখ মহম্মদ আবদুল্লা ওরফে কাশ্মীরের সেই বৃদ্ধ শেরটি আজ তাঁর উল্টো পাল্টা চালের ফাঁদে নিজেকেই কি জড়িয়ে ফেলেন নি?

পাকিস্তান ও চীন—এই দুই হানাদারের মুখে চুম্বন আঁকার চেষ্টা, সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে আপোষ প্রভৃতির দ্বারা খর্বিত করে তিনি কি নিজেই তার রাজনৈতিক চরিত্রটিকে ঠেলে দিচ্ছেন না?

হজরতবল মসজিদ থেকে মহম্মদের পবিত্রকেশ চুরি, কাশ্মীরে বিশৃঙ্খলা, বক্সী গোলাম মহম্মদের বিদায়, শেখ আবদুল্লার মুক্তি, পবিত্রকেশের পুনরুদ্ধার—একের পর এক টকীয় ঘটনা। ঠিক সেই সময়েই আনন্দবাজারের প্রতিনিধি খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক শ্রীসুবোধ ঘোষ কাশ্মীরে যান। সেখান থেকে তাঁর পাঠানো কয়েকটি বিবরণ ১৯৬৪ সালের গোড়ার দিকে আনন্দবাজার পত্রিকায় পর পর ছাপা হয়, পাঠক মহলে সাড়া জাগায়। কাল ও ঘটনার পরিবর্তনে অনেক কিছুরই অদল বদল হয়েছে, কাশ্মীরেরও। তবু বিবরণের মূল বক্তব্য মোটামুটি এক থাকায় এই সংকলনে সে-সময়ের ওই রচনাগুলো একসঙ্গে সংযুক্ত হল।

আজও আছে
সেই বিতস্তা

শ্রীনগর, ১৮ই এপ্রিল—আজ শ্রীনগরের রাজপথ যেন এক উৎসবের রঙ্গস্থলী। কিন্তু কী অদ্ভুত এই উৎসব! মত্ত জনতার হর্ষ যে-ভাষায় মুখরিত হয়ে উঠেছে, তার অর্থ বুঝে নিতে কোন অসুবিধে নেই। সোজা কথায় বলা যায়, এই হর্ষমত্ততা ও মুখরতা বস্তুত রাষ্ট্রবৈরিতার এক ভয়ানক উৎসব। রাজপথের দুই পাশে মানুষের ভিড় ঠাসাঠাসি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে ওখানে ও সেখানে, নানারকম ধ্বনি উচ্চকিত বিস্ফোরণের মত ফেটে পড়ছে। রাষ্ট্রের সম্পর্ক তুচ্ছ করবার জন্য যত ব্যাকুল ও বাচাল ইচ্ছার ধ্বনি। এ-হেন এক উৎসবের আশা ধন্য করে দিয়ে শ্রীনগরে প্রবেশ করলেন শের-ই-কাশ্মীর শেখ আবদুল্লা।

মিছিলের পুরোভাগে একটি মোটরযানের উপরে দাঁড়িয়ে শেখ আবদুল্লা আজ প্রচণ্ড ভারতবিরোধী মত্ততার অভ্যর্থনা গ্রহণ করলেন। আনন্দিত আবদুল্লা, স্মিতবদন আবদুল্লা দুই হাতে রঙীন বেলুনের মালা দুলিয়ে, যেন তাঁর খুশি গর্বের পতাকা দুলিয়ে এগিয়ে চলেছেন। ভিড়ের চিৎকার বলছে-ফকর-ই-কাশ্মীর জিন্দাবাদ। বেঁচে থাক কাশ্মীর-গৌরব!

সড়কের দশ হাত পর-পর রঙীন কাপড়ের তোরণ। সড়কের দুই পাশের পাঁচ ও মেটালের উপর রঙীন ধুলোর আলপনা। হলদে সরষে ফুলের স্তবক আর ঝাউপাতার গুচ্ছ নিয়ে কচি-বাঁশের বেড়া। পথের উপর কোথাও মখমলের কার্পেট, কোথাও গাদা গাদা জংলা ডাফোডিল ছড়ানো। পথের দুই পাশে সারি দিয়ে দাঁড় করানো নৌকা, রেশমী ঝালর দিয়ে সাজানো। কোথাও সাজানো মোটরবাসের সারি, কোথাও সাজানো টাঙ্গার কাতার। টাঙ্গার ঘোড়াকে অবশ্য

সরিয়ে রাখা হয়েছে। মাঝে মাঝে দেখা যায় পাকিস্তানী পতাকা দিয়ে সাজানো তোরণ—সবুজ পতাকার উপর সাদা চাঁদ-তারা।

লালচকের কাছে অভ্যর্থনার আয়োজনের চেহারা আরও বিচিত্র। পথের উপর বাঘের আর ভালুকের খোলস দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। বাঘের মুখে পোস্টার ঝুলছে—প্লেবিসিট চাই। ভালুকের গলায় প্ল্যাকার্ড ঝুলছে—প্লেবিসিট চাই। শেখ আবদুল্লার ছবি দিয়ে তৈরী করা তোরণও আছে। ছবির মাথার উপরে 'প্লেবিসিট চাই।' ছবির বুকের উপরে 'প্লেবিসিট চাই।'

হমারা মুতলবা রায় সুমার! অর্থাৎ, আমাদের দাবি গণভোট! যেমন ভিড়ের চিৎকারে, তেমনি অজস্র পোস্টারে ও প্ল্যাকার্ডে শুধু এই দাবির উল্লাস—রায় সুমার ফওরন করো! গণভোট পালন কর। তেলেভাজার পেঁয়াজী ও ফুলুরির স্তূপের উপর 'প্লেবিসিট চাই।' আখরোটের স্তূপের উপর কাঠের মাথায় 'প্লেবিসিট চাই।' বাচ্চা ছেলের টুপিতে 'প্লেবিসিট চাই।' বিদেশী শেতাঙ্গ সাহেব ও মেমের গাড়ীর গায়ে 'প্লেবিসিট চাই।'

মাঝে মাঝে সুরেলা চিৎকার—আ গিয়া জী আ গিয়া, শের-ই-কাশ্মীর আ গিয়া! হাততালি দিয়ে, উদ্বাহু হয়ে, আর নেচে নেচে বিকট-হিংস্র অঙ্গভঙ্গী করে যারা এই সুরেলা ছড়া গাইছে, তাদের চিনে নিতেও অসুবিধে নেই। এরা গুণ্ডার দল। এদের ধরনধারণ ও হাবভাবের স্থূলতা, এদের নর্তন-কুর্দন ও লম্ফঝম্ফ এই ভয়ানক সত্যটিকেই স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, এরা শ্রীনগরের নাগরিক জীবনের শান্তিকে এই মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন করে দেবার তৃষ্ণায় ছটফট করছে।

রেসিডেন্সী রোড; এই সড়কের এক পাশে এখনো তিন মাস আগের এক কদর্য রাজনীতিক দৌরাত্ম্যের স্মৃতি অঙ্গার হয়ে পড়ে আছে। রেসিডেন্সী রোডের দগ্ধীভূত থানাবাড়ি। ওপাশে আরও দুটি ভবনের দগ্ধীভূত ধ্বংসাবশেষ—রিগ্যাল সিনেমা ও অমরীশ সিনেমার ভবন। হজরতবল ঘটনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভের অজুহাতে শ্রীনগরের মুসলিম জনতা সেদিন যে পদ্ধতিতে বক্সীবিরোধী আর সরকারবিরোধী আক্রোশের তৃপ্তিসাধন করেছিল, তারই সাক্ষী এই অঙ্গারদেহ তিনটি ভবন। শেখ আবদুল্লারও চোখে পড়েছে, কিন্তু সেজন্য শেখ সাহেবের চিন্তা একটুও বিষণ্ণ হয়েছে বলে মনে হলো না। স্মিত-প্রফুল্ল আবদুল্লা হাত দুলিয়ে ভিড়ের জিন্দাবাদ ধ্বনিকে আরও উৎসাহিত করে এগিয়ে চললেন।

বিজয়বন্ত অভিযাত্রিকের মত সদর্প ও উদ্ধত ভঙ্গী, শ্রীনগরের রাজপথ ধরে এগিয়ে চলেছেন আবদুল্লা; সঙ্গে বিরাট এক অনুগতযূথের সুদীর্ঘ মিছিল। সে মিছিলের মধ্যে কিন্তু একটিও হিন্দু ও শিখ নেই। বেশ কিছুসংখ্যক শ্বেতাঙ্গ বৈদেশিক অবশ্য আছেন—বেশির ভাগ ইংরাজ ও

মার্কিনী। কৌতূহলী দর্শক হিসাবে পথের পাশে এখানে-ওখানে কিছু-কিছু হিন্দু ও শিখ দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তারা আজকের এই হর্ষ, মত্ততা ও মুখরতার কেউ নয়। তাদের চোখের দৃষ্টি উদাস, আর মনের ভিতরে এক অসহ দুর্ভাগ্যের নীরব গুঞ্জন। শ্রীনগরের সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে আজ যেমন আমার মন, তেমনই যে-কোন ভারতীয় আগন্তুক আর কাশ্মীরবাসী হিন্দু ও শিখের মন একটি কঠোর বিস্ময়ের দংশন সহ্য করছে। এই দংশন একটি মর্মন্তুদ জিজ্ঞাসা—সত্যই কি ভারত রাষ্ট্রের কোন নগরের রাজপথে দাঁড়িয়ে আছি?

ইয়ে মুল্‌ক্‌ হমারা হ্যায়! ইসকে ফয়েসলা হাম করেংগে! শ্রীনগর শহরেব ভিড়ের চিৎকারে শব্দব্রহ্মও বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হবেন বলে মনে হয়, কিন্তু ভারত সরকার উদ্বিগ্ন হবেন কিনা জানি না। এই দেশ আমাব দেশ, এর ভাগ্যের নিষ্পত্তি আমরাই করবো; কথাটা কি নিরীহ দেশপ্রেমের কোন আকুলতার ঘোষণা? একমাত্র স্বপ্নাতুর মূঢ়তা ছাড়া আর কারও পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব নয় যে, কাশ্মীরী মুসলিমের এই নতুন বুলি নিতান্ত কাশ্মীরী দাবির বুলি। এই দাবিব প্রেরণা ঝিলমেব স্রোতের ফুল হয়ে ভেসে আসেনি। এসেছে সীমান্তের আর যুদ্ধবিরতি রেখার ওপারের ওই দেশ থেকে, যার নাম পাকিস্তান। একথা ভারত সরকার এবং কাশ্মীর সরকারের কাছে নিশ্চয় অজ্ঞাত তথ্য নয়। কিন্তু তবু কী অদ্ভুত উদার ও অবাধ প্রশ্রয় পেয়েছে এই বুলি।

শেখ আবদুল্লার অভ্যর্থনার এই সহস্রোপচার ব্যস্ততার মধ্যে কাশ্মীরেব মুসলিম ছাত্রসমাজের ভূমিকার রকম-সকমও চোখে পড়ছে। প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটির অধ্যয়নের শেষ পর্যায় পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করবার সৌভাগ্য লাভ করেছে একমাত্র যে-রাজ্যের ছাত্র, সেই রাজ্য হলো এই কাশ্মীর। ভারতের অন্য রাজ্যের ছাত্রের কাছে এই সুযোগ এখনও স্বপ্নলোকের আকাঙ্ক্ষা মাত্র। কিন্তু কাশ্মীরী মুসলিম ছাত্র এই উপকারের এক চমৎকার প্রতিদান ও প্রতিক্রিয়ার সংহতি হয়ে দেখা দিয়েছে। রায় সুমার তথা গণভোটের দাবি মুখরিত করতে কাশ্মীরী মুসলিম ছাত্রের ব্যস্ততার অন্ত নেই। ছুটোছুটি করছে কাশ্মীরী মুসলিম ছাত্র। প্রত্যেক বিদেশী শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে এরা দল বেঁধে ঘুরছে। টুরিস্ট ইংরাজ ও মার্কিনীর হাতে প্রচারপত্র ধরিয়ে দিচ্ছে। কাশ্মীর ছাত্র লীগ মস্ত বড় এক পোস্টার ছাপিয়ে শ্রীনগরের ঘরবাড়ির, হাউস-বোটের আর মোটরবাসের দেহ ছেয়ে দিয়েছে। বেশ চমৎকার পোস্টার। প্রথম লাইনে বড় বড় উর্দু হরপের একটি লেখা—হমারা মুতলবা রায় সুমার। তার পরেই পাঁচ রকমের বিদেশী ভাষার লেখা :

We want Plebiscite Nous Voullons Le Plebiscite * Demandemos Una Plebiscita * Wir Wollen Ein Plebiscite.

এর পর আরও একটি লেখা রুশীয় হরপে, যার অর্থ, গণভোট চাই।

শেখ আবদুল্লার মিছিলের সঙ্গে অনেক মোটরকারের প্রবাহের মধ্যে একটি মোটরকারের ভিতরে বসে আছেন এক শ্বেতাঙ্গী; জানি না, তিনি ইংরাজ না মার্কিনী। কিন্তু তাঁর মোটরকারের শীর্ষে মস্ত বড় এক টিনপ্লেটের উপরে যে লেখা ফুটে রয়েছে, সেটা এক বলিহারি চমৎকারিতা। কালো টিনপ্লেটের উপরে সাদা পেণ্ট দিয়ে বড় বড় হরপে লেখা—আফটার আলেকজান্ডার দি গ্রেট টু ইণ্ডিয়া! শ্বেতাঙ্গীর আবদুল্লা-ভক্তি ভারতের ইতিহাসকেই গলিয়ে দিয়ে একেবারে নতুন একটি পঙ্কে পরিণত করে নিয়েছে। বিজয়ী দি গ্রেট আলেকজান্ডারের ভারত-প্রবেশ, আর শেখ আবদুল্লার শ্রীনগর-প্রবেশ; দুই ঘটনাকে তুলনা করলে পাঠশালার শিশুও হেসে ফেলবে। কিন্তু আবদুল্লার প্রশস্তিবাদিনী এই শ্বেতাঙ্গী হাসছেন না। তিনি তাঁর জঘন্য ঐতিহাসিকতার গর্বে কঠিন হয়ে গাড়িতে বসে আছেন আর মিছিলের সঙ্গে এগিয়ে চলছেন।

ডাহিনে বামে ও সম্মুখে, শ্বেতাঙ্গ বিদেশীর মুভি ক্যামেরা শেখ সাহেবের মূর্তি লক্ষ্য করে কখনও এগিয়ে আসে, কখনও বা পিছিয়ে যায়। ভিড় সরিয়ে এঁদের পথ সুগম করবার জন্য অভ্যর্থনা কমিটির কর্মী ও ভলাণ্টিয়ার দুই হাত তুলে হাঁক ছাড়ে—ওয়ে শে! ওয়ে শে! বিদেশী সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফারের আজ বড় সমাদর। এঁদের কাজের সহচর হয়ে অভ্যর্থনার কর্মীরা ছুটোছুটি করছে। শেখ সাহেবও সকৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে বিদেশী ক্যামেরার কাছে তাঁর ব্যক্তিত্বের রূপটিকে প্রকট করে দিতে চেষ্টার ত্রুটি করছেন না।

শ্রীনগরের আকাশে এখন মেঘ নেই, গত দুইদিনের বর্ষাও ক্ষান্ত হয়ে গিয়েছে। বৈকালীন রোদের মায়া পেয়ে ঝিলমের স্রোত ঝলমল করছে। উপত্যকার পপলার ও চেনারের মাথার উপরে ঝড়ো হাওয়ার উপদ্রবও নেই। কিন্তু শ্রীনগরের সড়কের এই ভিড়ের মত্ততা ও চিৎকার যে অতি প্রগল্‌ভ এক রাজনীতিক ঝড়ের উচ্ছ্বাস, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এ এক ভয়ানক কপটতার ঝড়। এ এক নিদারুণ অকৃতজ্ঞতার উৎসব। গত কয়েকদিন ধরে মসজিদে মসজিদে, মহল্লায় মহল্লায় পরামর্শের সভা মুখর হয়ে উঠেছে, কী ভাবে আবদুল্লার অভ্যর্থনাকে একটা বিরাট ভারত-বিরোধী সিদ্ধান্তের রাজনীতিক উৎসবে পাকৃত করা যায়। অনন্তনাগে এসে অপেক্ষায় ছিলেন আবদুল্লা, যেন অভ্যর্থনার বৈচিত্র্য বিপুল হয়ে ওঠবার সময় পায়; যেন বৃষ্টি থেমে গিয়ে রোদ ওঠে। তাই সাময়িকভাবে অসুস্থ হয়েছিলেন আবদুল্লা। অ্যাকশন কমিটি, প্লেবিসিট ফ্রণ্ট আর পাকিস্তান-প্রিয় পলিটিকাল কনফারেন্সের নেতা ও কর্মীরা অনন্তনাগে ধাওয়া করে করে অভ্যর্থনার পরামর্শ

গ্রহণ করেছেন। না, আবদুল্লার এই অভ্যর্থনা শ্রীনগরের স্বতস্ফূর্ত আগ্রহের কীর্তি নয়, যদিও কোন সন্দেহ নেই যে, আবদুল্লার ব্যক্তিত্বের বশীভূত জনতা আকারে প্রকারে ও সংখ্যায় সামান্য নয়।

চলছে আবদুল্লার মিছিল। লালচক পার হয়ে, হরি সিং হাই স্ট্রীট পার হয়ে আরও দূরে, ঝিলমের আরও দুটি ব্রিজ অতিক্রম করে এই মিছিল গিয়ে থামবে সেখানে, যেখানে মুজাহিদ মঞ্জিল, শেখ সাহেবের বর্তমান শ্রীনগর-জীবনের নিকুঞ্জ-নিকেতন।

ধুলো উড়ছে, কাশ্মীরী ভাষায় গান গাইছে, সড়কের পাশে কাশ্মীরী নারীর ভীড়। কাগজের ফুল আর নার্গিসের কুঁড়ি হুটোপুটি করে উড়ছে ও ছড়িয়ে পড়ছে। সেই সঙ্গে জনতার কণ্ঠমথিত মন্দ্র নারায়ে তকবীর! আল্লা হো আকবর! লালচকের হিন্দু ও শিখের দোকানগুলি যেন এক-একটি স্তব্ধ ও আতঙ্কিত জীবনের বিবর। চোখে শুকনো দৃষ্টি, মুখে এক অদ্ভুত অসহায় বৈরাগ্য, হিন্দু ও শিখ যেন ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারার এক ভয়ানক হেঁয়ালির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

অভ্যর্থনা কমিটির আসরে কথা উঠেছিল, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি অনুমোদন করা হবে কিনা। শেষ পর্যন্ত অনুমোদন করা হয়নি। কিন্তু আমার শোনবার দুর্ভাগ্য হয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীর মিলিশিয়ার হেড কোয়ার্টারের ফটকের কাছে একটি ভিড়ের কণ্ঠ হতে হঠাৎ উৎসারিত হলো এই নিনাদ—পাকিস্তান জিন্দাবাদ। সঙ্গে সঙ্গে এই ভিড়েরই নিকটের কয়েক-জনের সহাস্য মৃদুস্বরের আপত্তি বলে উঠলো—ইয়ে কাত মওয়াল উইলি! ইয়ে কাত গছি পাত! কাশ্মীরী ভাষা, যার অর্থ : একথা এখনই বলো না, একথা পরে হবে।

শ্রীনগর, ১৯শে এপ্রিল—এই তো সেই কাশ্মীর; যে কাশ্মীরের বারো শতকের বিখ্যাত কবি-ঐতিহাসিক কলহন তাঁর 'রাজতরঙ্গিণী'তে ইতিবৃত্ত রচনার একটি নিয়ামক নীতির উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক যেন প্রকৃত সত্য ও তথ্যকে বিবৃত করেন। তিনি যেন তথ্যের সম্পর্কে প্রিয়তা বা অপ্রিয়তার কোন সংস্কার পোষণ না করেন। প্রকৃত তথ্য ইতিহাস-রচয়িতার ব্যক্তিগত অভিরুচি ও ইচ্ছার কাছে অপ্রিয় হলেও বিবরণ যেন উদ্‌ভ্রান্ত না হয়।

খুবই সুখের বিষয় হতো, কলহনের এই নীতি যদি দেশের সরকারের চিন্তা বক্তব্য ও প্রচারের নিয়ামক নীতি হয়ে উঠতে পারতো। কাশ্মীর সম্পর্কে সরকারের প্রচারিত তথ্যগুলি যেন কুণ্ঠাকাতর বাক্‌সংযমের পরাকাষ্ঠা। দেখে শিখবো না, ঠেকেও শিখবো না, এবং বাস্তব ঘটনার রূঢ় চেহারাটিকে রঙীন

কল্পনা দিয়ে মনের মত করে রাঙিয়ে নেব, রাষ্ট্রের জীবনে এমন মনোভাব বস্তুত সেই অসতর্ক গৃহস্থের নিদ্রালস অবস্থার মত একটা অবস্থা, চুরি হয়ে যাবার পর যার ঘুম ভাঙে।

কাশ্মীরের জনজীবনের সাম্প্রদায়িক শান্তির অক্ষুণ্ণতার কথা একটু বেশি অতিরঞ্জিত হয়ে প্রচারিত হয়েছে। অতিরঞ্জনও একধরনের বিকৃতি। সেটা বাস্তবতা ও ঘটনার সম্পর্কে সত্যনিষ্ঠ প্রচার নিশ্চয়ই নয়। শেখ আবদুল্লা বেশ গর্ব করে বলেছেন আর বলেই চলেছেন যে, তাঁর কাশ্মীর হলো সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর একটি পীঠস্থান। ভারতে ও পাকিস্তানে মাইনরিটির উপর উপদ্রব হয়েছে, কিন্তু শেখ সাহেবের কাশ্মীরে মাইনরিটি হিন্দু ও শিখের নিরাপত্তার উপর কোন আঘাত পড়েনি। কাশ্মীরের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সাদিক সাহেবও এই কথা বলছেন। ভারতের সরকারী মুখপাত্রদেরও কারও কারও মুখে একথা শুনতে পাওয়া গিয়েছে।

সত্যি কথা, কাশ্মীরেব কোথাও, এই শ্রীনগরেও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দেখা দেয়নি। অর্থাৎ শতকরা নব্বই জনের সম্প্রদায়ের সঙ্গে শতকরা দশজনের কোন হাতাহাতি সংঘর্ষ হয়নি। কিন্তু ভারত সরকার কি কখনও জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করেছেন, কাশ্মীরের হিন্দু ও শিখ সত্যই একেবারে বিশুদ্ধ নিরাতঙ্ক জীবনের সুখ উপভোগ করছেন কিনা? শ্রীনগরের সাধারণ গৃহস্থ হিন্দু ও শিখকে কি ভারত সরকারের কোন তথ্যানুসন্ধানী কখনও জিজ্ঞেসা করে দেখেছেন, কাশ্মীর রাজনীতির বর্তমান রকমসকম তাঁদের মনে কোন উদ্বেগ ঘনিয়ে তুলেছে কিনা?

আমি জিজ্ঞেস করেছি। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জ ' হিন্দু ও শিখের মধ্যে মাত্র একজন ছাড়া প্রত্যেকেই বলেছেন, তাঁরা খুব উদ্বিগ্ন। শিক্ষিত পণ্ডিত পরিবারের কর্তা অত্যন্ত ব্যথিতভাবে বলেছেন, তাঁর বাড়ির মেয়েরা আজকাল পথে বের হতে চান না। পদস্থ অফিসার, তিনিও এই কাশ্মীরের পণ্ডিত সমাজের মানুষ, তাঁর মনের কথাও এই যে, তিনি উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তিত। কেউ যদি এমন কথা বলেন যে, বর্তমান কাশ্মীরী রাজনীতির আলোড়ন নিতান্ত রাজনীতিক ইচ্ছার নিকষিত হেম, এবং সাম্প্রদায়িক কামগন্ধ নাহি তায়, তবে সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক কলহনের আত্মা চমকে উঠবেন। হজরতবলের ঘটনা: হজরতের পবিত্র কেশ অপহরণের ঘটনাকে অবলম্বন করে কাশ্মীরী মুসলিমের বিক্ষোভ যে-ধরনের হাঙ্গামায় পরিণত হয়েছিল, তাতে এই শোচনীয় সত্যেরই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, কাশ্মীরী মুসলিমের রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম ও সম্প্রদায়ের উৎসাহ এক মুহূর্তে এক হয়ে যেতে পারে। ঠিক কথা, জনতার বিক্ষোভ বিশেষভাবে বক্সীবিরোধী এবং সরকারবিরোধী হাঙ্গামার রূপ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ঘটনার গতি কোন্‌দিকে যেতো, জনতা যদি

হজরতের পবিত্র কেশ অপহরণের ব্যাপারটিকে বক্সী পলিটিক্সের কুৎসিত কান্ড বলে সন্দেহ করবার মত প্রমাণ অথবা সুযোগ না পেত। মুয়ে মুকদ্দস, হজরতের পবিত্র কেশ অপহরণের ঘটনায় হিন্দু ও শিখেরাও প্রকাশ্যভাবে তাঁদের দুঃখের পরিচয় দিতে গিয়ে বিক্ষোভের মিছিলের সহযাত্রী হয়েছিলেন। এটাও একটি বড় কারণ, যেজন্য হিন্দু ও শিখ শ্রীনগরের সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তের উন্মার আঘাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। আরও একটি সত্য কথা অবশ্য এই যে, বিশেষ কয়েকজন কাশ্মীরী মুসলিম নেতার সতর্কতা ও শাসনের প্রভাবে সেই বিক্ষোভ হিন্দু ও শিখের উপর মারাত্মক আক্রমণের ঘটনায় পরিণত হতে পারেনি।

কিন্তু শ্রীনগরের মুসলিম জনতার এই ধ্বনিরও কোন অর্থ হয় না। 'শেখ আবদুল্লা কেয়া কিয়া ইরসাদ! হিন্দু মুসলিম শিখ ইত্তাহাদ!' কাশ্মীরের হিন্দু মুসলিম ও শিখের ঐক্য সম্ভব করেছেন আবদুল্লা, এত বড় কৃতিত্বের কীর্তিবান তিনি কবে হলেন? এবং ঐক্যই বা কোথায়? কাশ্মীরের কোন হিন্দু ও শিখ গণভোটবাদী কাশ্মীরী মুসলিমের রাজনীতিক বান্ধব নয়। হওয়া সম্ভবও নয়।

শ্রীনগরের হিন্দু ও শিখের কোন জনতা যদি সেদিন শের-ই-কাশ্মীরের রাজকীয় নগর-প্রবেশের উন্মাদনাময় উৎসবের শুধু নীরব দর্শক না হয়ে আর কালো পতাকা দুলিয়ে সরব প্রতিবাদ জানাবার কোন চেষ্টা করতেন, তবে তাঁর প্রিয় গণভোটবাদী সেই মুসলিম জনতা কি ঘটনাকে সেই মুহূর্তে ক্লিষ্ট-পিষ্ট না করে ছেড়ে দিত? শ্রীনগরের হিন্দু ও শিখেরা রাজনীতিক দাবির কথা সভা করে বা আন্দোলন করে মুখরিত করবার চেষ্টা একরকম ছেড়েই দিয়েছেন। পন্ডিত সমাজ শান্ত নিষ্ক্রিয় ও নীরব। শিখেরা জীবিকার কাজে ব্যস্ত। হিন্দু ও শিখের এই নীরবতাই এখন তাদের রক্ষাকবচ। কাশ্মীরের তথাকথিত সাম্প্রদায়িক শান্তির একটি প্রধান হেতু হলো হিন্দু ও শিখের এই নীরব নিষ্ক্রিয় আত্মকুণ্ঠিত অস্তিত্ব। শের-ই-কাশ্মীর এবং তাঁর অনুগত দলের নেতৃত্বে গণভোটের দাবী এখন যে-ধরনের চন্ডরূপ গ্রহণ করতে চলেছে, তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক অশান্তির স্বাভাবিক সম্ভাবনা নেই, এমন ধারণা করলে মরীচিকার ছলনাকেই বিশ্বাস করার ব্যাপার হবে।

শংকরাচার্য পাহাড়, আর মাথার উপরে হিন্দুর শিবমন্দির। পথচারী মুসলিম বালক বলছে—ওই দেখুন আমাদের এক মসজিদ, যাকে আজ 'হিন্দুনে কব্জা কর লিয়া'। আগে এতটা কল্পনা করতে পারিনি যে, নিরীহ কাশ্মীরী বালকের মনেও মুসলিমত্বের এরকমের একটা হিন্দুবিরোধী সংস্কার জাগিয়ে তোলা হয়েছে। বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের পুত্র জালুক দুই হাজার বছরেরও আগে এই পাহাড়ের চূড়াতে একটি চৈত্যগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। পরিত্যক্ত

ও ধ্বংসীভূত সেই চৈত্যগৃহের ভিত্তির উপর একদিন শৈবের মন্দির নির্মিত হয়েছিল। পাঠান সুলতান একদিন সেই মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তারপর আবার একদিন হিন্দুর প্রভাবে সেখানে মন্দির স্থাপিত হয়েছে। পুরনো ইতিহাসের সেই সব ভাঙা-গড়ার ঘটনা এখন অবান্তর কাহিনী মাত্র। কিন্তু পথচারী বালকটি এই কাহিনী শুনেও খুশি হলো না। স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর বালক।

বহু হিন্দু শ্রীনগর থেকে তাদের তিন-চার পুরুষের ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান বেচে দিয়ে অথবা বন্ধ করে দিয়ে ভারতের অন্য নগরে চলে গিয়েছেন। বহু হিন্দু তাঁদের পুরনো বসতির ভিটামাটি আর ঘরবাড়ির মায়া ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছেন। শ্রীনগরের হিন্দুরাই এই কথা বলছেন। কোন সরকারী প্রবক্তার মুখে কিন্তু এই অপ্রিয় সত্যটির স্বীকৃতি শুনতে পাওয়া যায় না। বর্তমান নিরাপদ নয়, এবং ভবিষ্যতের হাতেও নিরাপত্তার সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি নেই, এমন অসহায়তাবোধ প্রবল না হলে কেউ কখনও তার দেশ ছেড়ে চলে যায় না। ভারত সরকার কি কাশ্মীর সরকারের কাছে এবিষয়ে কোন কৈফিয়ত কখনও চেয়েছেন? কিংবা কাশ্মীর সরকার কখনও কৈফিয়ত দিয়েছেন? কাশ্মীরের সাম্প্রদায়িক অবস্থার এই ক্ষতটিকে সরকার শুধু নীরবতার প্রলেপ দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। কাশ্মীরের সাম্প্রদায়িক অবস্থার সৌষ্ঠব ও মহিমার কথাটি প্রচারমুখী রাজনীতির মাত্রাছাড়া গল্প মাত্র।

ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস একটি আইন জারি করেছিলেন, যার নাম 'ফাইভ মাইলস্ অ্যাক্ট'—পাঁচ মাইল আইন। নন-কনফরমিস্টদের শাস্তির জন্য এই আইন জারি করা হয়েছিল। নন-কনফরমিস্ট কোন ব্যক্তি তার জীবিকা অর্জনের জন্য কর্মস্থানের পাঁচ মাইলের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। কাশ্মীর-ভূমিতে ভারতীয়ের অধিকারও প্রায় এই ধরনের এই 'পাঁচ মাইল আইনের' নিষেধের দ্বারা শাসিত। কোন অকাশ্মীরী ভারতীয় এখানে জমি কিনতে পারবেন না, বাড়ি তৈরী করতে পারবেন না। কিন্তু অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায়, বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় মুসলমান শুধু কাশ্মীরী মুসলমানের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে ও সুযোগে বিশুদ্ধ কাশ্মীরী হয়ে গিয়েছেন আর জমি কিনেছেন, বাড়িও করেছেন। নিষেধের গণ্ডীটা শুধু ভারতীয় হিন্দু ও শিখের সম্পর্কেই সার্থক হয়েছে।

বানিহাল সুড়ঙ্গপথের অন্য নাম জওহর টানেল। এই টানেল কাশ্মীর ও জম্মু উপত্যকাকে যুক্ত করে রেখেছে। বাসের সহযাত্রী এক কাশ্মীরী ভদ্রলোক কিন্তু ঠাট্টার সুরে প্রশ্ন করলেন, এই চমৎকার টানেল কি সত্যই দুই উপত্যকাকে যুক্ত করে রেখেছে, অথবা বিযুক্ত করে রেখেছে?

এই প্রশ্নের অর্থ? আমার জিজ্ঞাসার কাছে ভদ্রলোক কিন্তু কিছু মাত্র

বিচলিত হলেন না। বেশ শান্ত স্বরে আর হেসে হেসে পাল্টা একটি প্রশ্ন করলেন—বোলিয়ে তো জনাব, আমাদের সংবিধানের ৩৭০ ধারাটি কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে, না বিযুক্ত করে রেখেছে?

শ্রীনগর, ২০শে এপ্রিল—কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা এবং কিসের বা ক্লেশ? আশি মাইল লম্বা আর বিশ মাইল চওড়া কাশ্মীর উপত্যকার মুসলিম অধিবাসীকে এই প্রশ্ন দিয়ে জবাব দাবি করলে সে কিন্তু কোন জবাবই দিতে পারবে না। অনেককে জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু সকলেই সরল ভাষায় স্বীকার করেছেন, না, তাঁদের মনে দুঃখ-দৈন্য অথবা লজ্জা-ক্লেশের কোন অভিযোগ নেই। হাউসবোটের প্রৌঢ় কর্তা, তরুণ ছাত্র, আর কাঠকাটা দিনমজুর, ভেড়িওয়ালা গুজর, শিকারার মাঝি আর বুড়ো টাঙ্গাওয়ালা; শাল-রেশম ও গালিচার দোকানী; লকড়িবেচা গেঁয়ো কাশ্মীরী ও মোটর-বাসের ড্রাইভার আর খালাসী; প্রত্যেকের আর্থিক অবস্থা ও রোজগার আগের তুলনায় অনেক উন্নত ও অনেক স্বচ্ছন্দ।

হাউসবোট অ্যাসোসিয়েশনের একজন কর্মী বললেন, স্পেশ্যাল ক্লাস হাউসবোটের মালিকেরা গত দশ-বারো বছরের রোজগারে লাখপতি হয়ে গিয়েছেন। সাধারণ হাউসবোটের রোজগারও আগের তুলনায় প্রায় বিশগুণ উন্নত হয়েছে। বৎসরে মাত্র ত্রিশ টাকা ট্যাক্স, আর ভাল-মন্দ জায়গা অনুযায়ী দুই থেকে আট টাকা পর্যন্ত মাসিক রেণ্ট—হাউসবোটওয়ালার রোজগারের উপর মাত্র এই সামান্য দাবি ছাড়া আর কোন দাবি নেই। ডাল হ্রদ ও ঝিলমের হাউসবোটের জীবিকা অতীতে কোন দিনও এতটা সচ্ছলতার মুখ দেখতে পায়নি।

ছাত্রের শিক্ষাজীবন তো অবৈতনিক আনন্দ ও উপকারের এক মহোৎসব। সম্পন্ন অবস্থার কাশ্মীরী পরিবারের ছেলেমেয়েও বিনা-বেতনে স্কুলে-কলেজে পড়ছে। তার উপর বৃত্তির অজস্র দাতব্যও আছে। ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য পঙ্গু দিনমজুরকেও এখন আর অর্থাভাবের প্রশ্ন নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে হয় না।

গ্রাম্য কৃষকের ঘরেও নতুন সচ্ছলতা। সব্জী, শাক-পাতা, ফল আর শস্য; কৃষকের শ্রমের ফসল আগের তুলনায় এখন তিন চার গুণ বেশি দামে ও দরে বিকিয়ে যাচ্ছে। এজন্য সহরের ক্রেতা মানুষের মনে অবশ্য কিছু অভিযোগ আছে, কিন্তু শ্রমিক-কৃষক মনে-প্রাণে খুশি।

সরকারী ছোট-বড় সার্ভিসে এখন কাশ্মীরী মুসলিমেরই সংখ্যা-প্রাধান্য। এক্ষেত্রেও বিশেষ কোন অভিযোগের মুখরতা নেই। সরকারী কাজের বিপুল প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে লোকের জীবিকার সুযোগও বেড়েছে, দিন-দিন আরও বেড়েই চলেছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, নাগরিক জীবনের অন্য সব প্রয়োজনের বহু দাবির কোনটিই উপেক্ষিত নয়। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ,

স্টেডিয়াম আর রেডিও স্টেশন। করণনগরের গোলবাগে নবনির্মিত বিরাট সেক্রেটারিয়েট ভবন। নতুন নতুন সড়ক, ব্রিজ, পার্ক আর ফ্যাক্টরী। ভারত সরকারের দান ও সাহায্যের কোটি কোটি টাকার স্রোত নতুন এক ঝিলমের স্রোতের মত প্রবাহিত হয়ে শ্রীনগরের উন্নতির নতুন উর্বরতা সাধন করেছে।

সাধারণ মাটি-কাটা গাছ-কাটা ও পাথর-ভাঙা মজুরের দৈনিক মেহনতের দাম তিন টাকা, সাড়ে তিন টাকা। রাজমিস্তিরীর দৈনিক মজুরী দশ টাকা। কার্পেণ্টার তথা ছুতোর মিস্তিরীর দৈনিক মজুরী দশ থেকে বারো টাকা। ট্যাক্সের প্রকোপ খুবই সামান্য। টুরিস্টের আগমনের মরশুম যখন থাকে না, শীতের চার পাঁচ মাস যখন সাধারণের রোজগারের সুযোগ সঙ্কুচিত হয়, তখন বোটওয়ালা ও টাঙ্গাওয়ালার প্রদেয় সামান্য রেটের ট্যাক্সও মকুব হয়ে যায়।

একথা অবশ্য সত্য নয় যে, কাশ্মীর উপত্যকা এই সতের বছরের মধ্যে গ্রীসীয় উপকথার আর্কেডিয়া ভ্যালির মত সকল সুখের একটি চিরমধুনিঃস্যন্দ স্বর্গ-জগৎ হয়ে গিয়েছে। এখানে-ওখানে দারিদ্র্যপ্রকোপিত সংসারের চেহারাও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে, কাশ্মীর উপত্যকার জন-জীবনের আর্থিক দশা ভারতের বহু অঞ্চলের জনজীবনের আর্থিক দশার তুলনায় বেশি সুষ্ঠু, স্বচ্ছন্দ ও সচ্ছল। কাশ্মীরে ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যের মালাবার হিল যেমন নেই, তেমনই দুর্ভিক্ষের বাঁকুড়া, মানভূম ও গোদাবরী-তালুকও নেই।

শ্রীনগরের জনজীবনে আর্থিক সমস্যার কথা নিয়ে কোন অভিযোগের আন্দোলনও নেই। ধার্মিক ও সামাজিক অধিকারের প্রশ্ন নিয়েও কোন অভিযোগ নেই। কাশ্মীরী মুসলিমের কোন নেতা কিংবা কোন রাজনীতিক দল, অথবা কোন টাঙ্গাওয়ালাও একথা বলেন না, বলতে পারেন না এবং বলেনওনি যে, তাঁদের ধার্মিক ও সামাজিক স্বাধীনতার এবং অধিকারের কোন বাধা বা অসুবিধা আছে। শ্রীনগরের শুক্রবারের নমাজের জমায়েতের উৎসাহ ও আনন্দ দেখবার মত একটি দৃশ্য।

তাই প্রশ্ন, একটি ভয়ানক বিস্ময়ের প্রশ্ন, কেন এই গণভোট দাবির ধ্বনি? কেন ভারত রাষ্ট্রের সম্পর্ককে তুচ্ছ করে বিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্য দাবি করবার এই চটুল অধ্যবসায়? কাশ্মীর উপত্যকার নতুন সমৃদ্ধির বান্ধব হয়ে নতুন নতুন পাওয়ার হাউস আজ শুধু শ্রীনগর সহরের প্রতি বোট ও কুটিরে নয়, অনেক গ্রাম্য জনপদের ঘরেও বিদ্যুতের আলো ফুটিয়ে দিয়েছে (ইউনিটের দাম চার আনা), কিন্তু কাশ্মীরী মুসলিমের মন কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো না; এ এক কঠিন রহস্য।

সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশন? আত্মভাগ্য নির্ণয় করবার স্বেচ্ছাধিকার? হায় প্রেসিডেণ্ট উইলসনের সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশন আদর্শ! জাতীয়তা সংগঠনের

এই নীতিটি যে সুলেমান পাহাড়ের রহস্যময় মেঘের মধ্যে এসে জাতীয়তারই ঘাতক একটি অশনি হয়ে উঠতে পারে, এমন অদ্ভুত সম্ভাবনার কথা কোন ভদ্রলোকের কল্পনাতেও আসেনি। আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধার্মিক, নাগরিক—কোন ক্ষেত্রে কোন অভিযোগ নেই, ইচ্ছা ও অধিকার কোথাও ক্ষুণ্ন হচ্ছে না, তবু সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশন। আজ দক্ষিণ কলিকাতা যদি সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশন দাবি করে, তবে সেটা নিশ্চয় নিতান্ত এক পরিহাসের দাবি বলে বিবেচিত হবে। কাশ্মীরী সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশনের দাবিও এ ধরনের একটি পরিহাস; সে দাবির মধ্যে যুক্তির সামান্য ছায়ারও স্পর্শ নেই।

যে দলের নাম 'মহজ রায় সুমার' অর্থাৎ প্লেবিসিট ফ্রন্ট, তাঁরা বলছেন--সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশন চাই। যে দলের নাম 'মজলিস অম্‌মল' অর্থাৎ অ্যাকশন কমিটি; তাঁদেরও এই দাবি। শেখ আবদুল্লারও এই দাবি। এমন কি মহীউদ্দীন কারার পলিটিক্যাল কনফারেন্স, কাশ্মীরকে পাকিস্তানের বক্ষোলগ্ন করবার জন্য যার ইচ্ছার ভাষাতে বিশেষ কোন অস্পষ্টতা নেই, আপাতত তার দাবিও সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশন। যে-কথাটা এ'রা মুখ খুলে বলছেন না, কিন্তু কথাটা এ'দের মন-প্রাণের প্রধান এবং আসল যুক্তির কথা, সেটা এই যে, যে-হেতু কাশ্মীর প্রধানত মুসলিম অধিবাসীর দেশ, সেইহেতু সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশন চাই। প্লেবিসিট দাবির রঙিন বেলুন ফুটো করে দিলে যে হাওয়া বের হবে, সেটা নিছক মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদের হাওয়া; ভারতীয় রাষ্ট্রের সেক্যুলার আকাঙ্ক্ষার প্রতি অশ্রদ্ধার ও অনাস্থার উচ্ছ্বাস।

ভারতীয় রাজনীতিকেরা এবং বর্তমান সরকারের প্রধানেরা নিশ্চয়ই স্মরণ করতে পারবেন যে, একদিন কবি স্যার মহম্মদ ইকবাল মুসলিমের সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশনের যে জয়ধ্বনি কাব্যে ও সঙ্গীতে মুখরিত করেছিলেন, তারই প্রেরণাতে দুই-জাতি থিওরীর উদ্ভব এবং পাকিস্তানের জন্ম। আজকের কাশ্মীর উপত্যকার চেনার বনের বাতাসেও সেই একই দাবির উন্মাদনার ধুলো উড়ছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার সব চেয়ে বড় দায়িত্ব যার, সেই ন্যাশনাল কনফারেন্সের এখন মৌনী যোগিসুলভ প্রায় সমাহিত একটা অবস্থা, যদিও এই দলের অনুগামীর সংখ্যা কম নয়।

হুজুরীবাগের জনসভাতে যে-সব বিচিত্র অদ্ভুত ও উদ্ভট নানারকমের ধ্বনির বিস্ফোরণ বিকট হয়ে বেজেছে স্বয়ং শের-ই-কাশ্মীর যে ধরনের দৃপ্ত ও উদ্দীপিত ভাষায় বক্তৃতা করেছেন, তার অজস্র যুক্তিহীনতা, অর্থহীনতা ও হেঁয়ালিপনার মধ্যেও এই সত্যটিকে চিনে নিতে ও বুঝে নিতে কোন অসুবিধে নেই যে, তিনি কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতেই চান। কোন কোন ভারতীয় মহলে, শেখ সাহেবের প্রতি যাঁদের অহৈতুকী ভক্তির অবস্থাটা জম্মু-বক্তৃতার পরেও চমকে ওঠেনি, তাঁদের অনেকে এখনও শেখ সাহেবের

উক্তির বিচিত্র দ্বৈতবাদী ভাষ্য প্রচার করছেন। শেখ সাহেবের বক্তব্য কিন্তু বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ; একমাত্র দাবি, প্লেবিসিট চাই। সাদিক সাহেবও সমালোচনার তপ্ততার উপর ঠাণ্ডা জল ছড়িয়ে আবদুল্লার উক্তিকে নিজের মনের মত করে ব্যাখ্যা করছেন। শেখ সাহেব নাকি গণভোট চাইছেন না, কাশ্মীরের ভিন্ন স্বাধীনতাও চাইছেন না। একথা কেন বলছেন সাদিক সাহেব? আবদুল্লার বক্তৃতার প্রত্যেক বাক্যেই তো এই দুই দাবির ঝঙ্কার শুনছি।

ভারত সরকার যদি এই দাবিকে কিছু মাত্র গুরুত্ব প্রদান করেন, তবে তো বুঝতে হবে যে, ভারতের যে-কোন মুসলিম-প্রধান অঞ্চল বস্তুত পদ্মপত্রনীর, যে-কোন মুহূর্তে ঝরে পড়ে যাবার দাবি নিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠবে। গণভোট দাবি ধ্বনিটা সাদিক সাহেবের মতে 'স্মল ভয়েস', সামান্য রব। শ্রীনগরের হজুরীবাগের জনসভার আওয়াজকে কিন্তু অসামান্য ঔদ্ধত্যের রব বলেই মনে হয়েছে। এই আওয়াজের তোষণ পোষণ আরও কিছুকাল চলতে থাকলে পরিণাম ভয়াবহ হয়ে দেখা দেবে। অবস্থাটা দাঁড়াবে, যাকে বলে, জানালা দিয়ে ঘর পালালো গৃহস্থ রইলো বন্ধ। সাদিক সাহেব বলেছেন, কাশ্মীরী রাজনীতিক জীবনের গুমোট দূর করবার জন্য একটা হাঁফছাড়ানো স্বস্তির সঞ্চার তথা রিল্যাকসেশন চাই। সেই জন্যে শেখ সাহেবকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চোখেই দেখতে পাচ্ছি, কাশ্মীরের রাজনীতিক জীবন কীভাবে এবং কত প্রমত্ত হয়ে নতুন এক অস্বস্তির ঝড় উদ্বেল করে তুলেছে।

বললে রূঢ় শোনাবে, কিন্তু তাতে একটু অত্যুক্তি করা হবে না যে, গণভোটের মোহগ্রস্ত কাশ্মীরী রাজনীতির এই মত্ততা নিতান্ত এক অকৃতজ্ঞতার চাঞ্চল্য। জীবনযাত্রার কিংবা নাগরিক অধিকারের কোন বিষয়ে কোন অভিযোগ ও ক্ষোভ নেই, তবু রাষ্ট্রের সম্পর্কচ্ছেদ করবার এই অপসাহসিক আগ্রহ কাশ্মীরের এপ্রিলের বদখেয়ালী মেঘের চেয়েও যুক্তিবিহীন। স্কুল মাস্টার কাশ্মীরী মুসলিম, যিনি নতুন জমি ও বাড়ি কিনেছেন এবং যাঁর তিন ছেলে সরকারী চাকরিতে আছে, তিনিও কত সহজে ও সরলভাবে কাশ্মীরের রাজনীতিক ভবিষ্যৎটিকে বুঝে নিয়েছেন। তাঁর ধারণা, কাশ্মীরের আজাদীর আর বিলম্ব নেই। গ্রীক পুরাণের গল্পে আছে, শনির প্রভুত্বের সম্পত্তিকে তার তিন পুত্র ভাগ করে নিয়েছিলেন। জুপিটার নিলেন পৃথিবীকে, প্লুটো পাতালকে আর সমুদ্রকে নিলেন নেপচুন। স্কুল মাস্টারমশাই বলছেন—এ তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে যে, লাদাক হবে চীনের, জম্মু ভারতের আর কাশ্মীর হবে কাশ্মীরী মুসলমানের 'স্বাধীন' কাশ্মীর।

শ্রীনগর, ২২শে এপ্রিল—ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখেছেন—কাশ্মীরে

'হামেশা বাহার', কাশ্মীর চিরবসন্তের দেশ। কিন্তু কোথা হা হন্ত চিরবসন্ত? কাশ্মীরের পুষ্পশোভা এখন খুবই কুণ্ঠিত। যখন-তখন গগনে গরজে মেঘ, আর হিমেল বাতাসের ছুটোছুটি। মাঝে মাঝে অবশ্য চোখে পড়ে, সাদা ফুলের ভারে আপেলের শাখা নুয়ে পড়েছে, আর বেগুনী জুসমনের লতানে ডাল-পালা দুলিয়ে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে পার্টকিলে বুলবুল।

চশমাশাহীর চেরি বাগানেরও এখন কোন শোভা নেই; কুঁড়ি ধরেনি। চশমাশাহীর ফোয়ারাঘরের নিকটে এই তো সেই বাংলো, শান্ত ও পরিচ্ছন্ন, যেখানে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের অন্তিম মুহূর্তের শেষ নিঃশ্বাস বাতাসে মিশে গিয়েছিল। মনে পড়ছে, এবং যে-কোন ভারতীয় আগন্তুকের পক্ষে এখানে এসে আর এই সবুজ ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে একথা মনে না হয়ে পারে না যে, সেদিনের শ্যামাপ্রসাদের একমাত্র অপরাধ এই ছিল যে, তিনি ভারত সরকারের কাশ্মীর-নীতির সমালোচনা করেছিলেন। মৃত্যু তাঁকে নীরব করে দিয়েছে, তা না হলে আজ তিনি কাশ্মীরী প্রধানমন্ত্রী সাদিক সাহেবের কথা শুনে হেসে ফেলতেন। সংবিধানের ৩৭০ ধারা কাশ্মীরের ক্ষতি করেছে, বৃহত্তর ভারতীয়তার সংগে কাশ্মীরের একাত্মতার হানি করেছে সাদিক সাহেবের এই কথাটি যে শ্যামাপ্রসাদেরই কথার প্রতিধ্বনি।

শ্রীনগরের শান্তিভংগ হবে মনে করে সেদিন শ্যামাপ্রসাদকে বন্দী করে চশমাশাহীর এই বাংলোতে যিনি পাঠিয়েছিলেন, সেই শেখ আবদুল্লা আজ শ্রীনগরের জনজীবনের শান্তিকে নিদারুণ এক রাষ্ট্রবিরোধী উন্মাদনা দিয়ে শিহরিত করে তুলেছেন। রামনবমীর দিনে রঘুনাথ মন্দিরের ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে হঠাৎ চমকে উঠতে হয়েছিল। হিন্দুপাড়ার ভিতরে কেমন-যেন একটা আতঙ্কের ভাব ছুটোছুটি করছে। ব্যাপার কি? মাত্র তিনশত জন হিন্দু ছাত্র একটি মিছিল বের করেছে। এই মিছিলের ধ্বনি হলো নেহরু জিন্দাবাদ! ভারত-কাশ্মীর এক হ্যায়! সেই মুহূর্তে তাড়া করে ছুটে এসেছে মুসলিম জনতার একটি মিছিল—ইয়ে মুল্‌ক্ হামারা হ্যায়, ইসকে ফয়েসলা হাম করেংগে। শের-ই-কাশ্মীর জিন্দাবাদ! মুসলিম জনতার আক্রোশ হিন্দু ছাত্রজনতার উপর একটা আক্রমণ হয়ে ফেটে পড়বার জন্য মত্ত হয়ে উঠেছিল। সুখের বিষয়, কয়েকজন সুস্থবুদ্ধি মুসলিম ভদ্রলোক মাঝখানে পড়ে ঘটনাকে সেখানেই থামিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

চশমাশাহীর বাগানের প্রাচীরের কাছে দাঁড়িয়ে শ্রীনগরের দূরশ্রী দেখতে গিয়ে হজরতবল মসজিদেরও ছোট্ট সাদা ছবিটিকে দেখতে পেয়েছি। অপহৃত 'মুয়ে মুকদ্দস' ফিরে পাওয়া গিয়েছে। ধর্মপ্রাণ কাশ্মীরীর মনের বেদনার অবসান হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনীতিক উদ্দেশ্যের যে ধূমজ্বালা জাগিয়ে তোলা হয়েছিল, তার নির্বাণ এখনও হয়নি। সবচেয়ে

অদ্ভুত ব্যাপার, সে-ঘটনাকে ভারত-বিরোধী উষ্মা তপ্ত করে রাখবার চেষ্টায় এখনও কোন কোন নেতার উৎসাহ প্রবল হয়ে রয়েছে। বক্সী-বিরোধী উত্তেজনাকে নিতান্ত বক্সীরই নিন্দাবাদে সীমিত করে রাখা হয়নি, হচ্ছেও না। 'আসলি মুলজিম পেশ করো' - আসল অপরাধীকে ধরে আন; ধ্বনি তুলে উত্তেজিত জনতা শুধু বক্সী গোলাম মহম্মদের গাড়ির উপর ইঁট ছোঁড়েনি, সেই সঙ্গে ভারতের বিরুদ্ধেও ধিক্কারের ইঁট ছুঁড়েছে। শেখ আবদুল্লা অবশ্য এই দৌরাত্ম্যের নিন্দা করেছেন। মির্জা আফজল বেগ, ভারতের বিরুদ্ধে যিনি তাঁর ভাবভংগী ও ভাষাতে বিদ্বেষ উৎসারিত করবার দক্ষতায় পাকিস্তানের জনাব ভুট্টোর প্রতিভাকেও মলিন করে দিয়েছেন, তিনি হজরতবলের ঘটনার উত্তেজনাকে গণভোট দাবির সংগে মিশিয়ে দিয়ে কাশ্মীরের মুসলিম মনে সেই গরলের আলোড়ন জাগিয়ে তুলছেন, যার পরিণাম সাম্প্রদায়িক শান্তির মৃত্যু। আজ এখানে দাঁড়িয়ে ভারতের মানুষ হিসাবে আমাকে ভাবতে হচ্ছে, এবং হজরতবল ঘটনার আঘাতে পূর্ব-পাকিস্তানের কয়েক হাজার হিন্দুর প্রাণ গিয়েছে আর ঘর পুড়েছে।

হজরতবল ঘটনাও কিন্তু একটি রহস্য। হামেশা বাহার কাশ্মীরকে এখন হামেশা রহস্যের দেশ বলেই মনে হবে। ক্ষুব্ধ জনতার সন্দেহ বক্সী-ভ্রাতাদের সম্পত্তি পুড়িয়েছে। বক্সী রসিদ শ্রীনগরে আসতে সাহস পাচ্ছেন না। সাতমহল হোটেল 'পমপোশ' (কাশ্মীরী ভাষা, যার অর্থ পদ্ম), যার মালিক অন্যতম বক্সী-ভ্রাতা, বক্সী মজিদ, সেই হোটেলেও জনতা আগুন দিতে চেষ্টা করেছিল। সাধারণ জনরবের সারকথা এই যে, পবিত্র কেশ চুরির ব্যাপারটা বক্সীস্বার্থেরই একটি গোপন ও কূট অভিসন্ধির কীর্তি। কিন্তু পবিত্র কেশ উদ্ধারের জন্য একমুহূর্তের মধ্যে গঠিত অ্যাকশন কমিটি কেন গণভোট দাবির সংহতি হয়ে উঠলেন? করাচী রেডিওই বা কেন সেই শোচনীয় ঘটনাকে হিন্দুর অপকীর্তি বলে রটনা করে দিল? তাই একথা মনে না হয়ে পারে না যে, হজরতবল ঘটনা একটি সাধারণ রহস্য নয়; বেশ জটিল রহস্য।

এই শ্রীনগর থেকে তেরজন ভারতীয় সামরিক অফিসারকে নিয়ে যে ইল্যুশিন বিমান উধমপুরে যাবার আকাশপথ হতে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, তার পরিণাম সম্বন্ধেও সাধারণ জনরবের কথা এই যে, ওই বিমান পাকিস্তানেরই হাতে পড়েছে; সব অফিসারকে খুন করা হয়েছে; বিমানকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে। এটাও একটি কাশ্মীরী রহস্য। তিন মাসেরও বেশি ভারতের একটি সামরিক বিমান অফিসারসমেত উধাও হয়ে গেল, তার পরিণাম দেবা ন জানন্তি। অন্য কোন রাষ্ট্রের জীবনে কখনও এরকম রহস্যের ঘটনা সম্ভব হয়েছে কিনা জানি না।

শ্রীনগরের রাজপথের জনতার বিশেষ একটি ধ্বনিও একটি রহস্য।

যথা : হিন্দুস্তান-পাকিস্তান জিন্দাবাদ! শেখ আবদুল্লার আগমনের পর এই নতুন ধ্বনিটি নিনাদিত হতে শুরু করেছে।

কিন্তু রহস্য হিসাবে যে ব্যাপারটি জনজীবনের ও জনচিত্তের উপর সবচেয়ে বড় উদ্‌ভ্রান্তি ঘটিয়েছে, সেটি হলো কাশ্মীর সম্পর্কে ভারত-সরকারের নীতি। হিন্দু ও শিখ উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবছেন, এবং 'ইয়ে মুল্‌ক্‌ হমারা হ্যায়' জনতা উৎসাহিত হয়ে ভাবছেন, তিন'শো সত্তর ধারার শীর্ণ রাখীডোর যে-কোন মুহূর্তে পট্‌ করে ছিঁড়ে যাবে। মুসলিম অধিবাসীরও একটি বৃহৎ অংশের আক্ষেপ, ভারত সরকার কেন কাশ্মীরকে এভাবে রাষ্ট্রের বাহির দুয়ারের কাছে বসিয়ে রেখেছেন, আঙিনার ভিতরে ডেকে নিলেন না?

রাষ্ট্রানুগত হিন্দু-মুসলিম অধিবাসীর মন দুঃসহ এক অনিশ্চিত পরিণামের আশঙ্কায় বিষণ্ণ। আর রাষ্ট্রবিরোধী সংহতির মন দুর্বার উৎসাহে উদ্দীপিত। হিন্দু ও শিখ ব্যবসায়ী কাশ্মীরের ভিতরে কারবারের প্রসারের জন্য আর টাকা লাগাতে ও খাটাতে চান না। কাশ্মীরী মুসলিম ব্যবসায়ীও ভারতের সঙ্গে কাজ-কারবারের সম্পর্ক বাড়িয়ে তুলতে উৎসাহিত নন। এঁদের অভিযোগ এবং ধারণা উভয়ই এই যে, ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত নয়। পথের জনতা হাঁক দিচ্ছে—কাশ্মীরকে ইলাক পুরা নেহি হুয়া, কাশ্মীরের রাষ্ট্রভুক্তি সম্পূর্ণ হয়নি। শের-ই-কাশ্মীরও এই রব তুলেছেন।

কোন সন্দেহ নেই যে, এই সতের বছর ধরে কাশ্মীরকে আলগা করে রাখবার ব্যাপার থেকেই আলগা হয়ে যাবার দুষ্ট প্রেরণা দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। ভারতের অন্য সব জনপদে অল ইণ্ডিয়া রেডিও তথা আকাশবাণীর কথা শুনতে হয়। এখানে আকাশবাণী নয়, অল-ইণ্ডিয়াও নয়, এখানে 'রেডিও কাশ্মীর'কে শুনতে হয়। কী আশ্চর্য, কাশ্মীরের বেতারের নামকরণেও কাশ্মীরকে পৃথক কৌলীন্য প্রদান করা হয়েছে। নবনির্মিত 'রেডিও কাশ্মীর' ভবনের প্রবেশপথের একপাশে নামের বোর্ডের উপর ছোট হরপের 'গবর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া' কথাটি যেন লজ্জাভীরু আগ্রহের মত বড় হরপের 'রেডিও কাশ্মীর'কে কোনমতে ছুঁয়ে রয়েছে।

কাশ্মীর রেডিওর প্রচারিত উর্দু ভাষার সংবাদ অনেকবার শুনেছি। শুনতে গিয়ে আর-একটি রহস্য-প্রায় হেঁয়ালির কঠিন স্পর্শ কানে ঠেকেছে। প্রচারে পাকিস্তানের সুখ-দুঃখের সংবাদের পরিমাণ বেশ মাত্রা ছাড়া; যদিও সেগুলি ভারতবিরোধী সংবাদ নয়। কিন্তু তাই বা কেন? জানি না, রেডিও কাশ্মীরের এটাই অভ্যস্ত নিয়ম কিনা?

কাশ্মীরের অতীতের ইতিহাসের 'রাজতরঙ্গিণী'তে অনিশ্চিত জীবনের দুঃখের কথা আছে। হুষ্ক জুষ্ক ও কণিষ্ক—কুশানের উদ্‌ভ্রান্তির রাজনীতি

ও শাসন সেদিনের কাশ্মীরকে সুনিদ্রাযাপনের সুযোগ দেয়নি। আশা করতে ইচ্ছে করছে, আজকের রাষ্ট্রিক নেতৃত্বের চিন্তায় ও আচরণে এমন ভুলের কোন মোহ আর থাকবে না, যার ফলে এই কাশ্মীর অনিশ্চিত ভবিতব্যের ক্রীড়নক হয়ে পড়ে থাকবে। উপদ্রব ও উচ্ছৃঙ্খলা যেখানে দুঃসাহসে উদ্ধত, সেখানে প্রতিকার ও বিচারের দাবি বলবে—'বাড়াও সবল হস্ত'। বাঙালী কবি গোবিন্দদাসের একটি বেদনাক্ষুব্ধ কবিতার এই কথা ভারত সরকারের কাশ্মীর-নীতির কথা হয়ে উঠবে বলে আশা করতে ইচ্ছে করছে। এবং এখনও এই আশা করতে পারছি বলেই ডাল হ্রদের এই শোভাকেও দেখতে ভাল লাগছে।

শ্রীনগর, ২৩শে এপ্রিল -কথিত আছে, রানী শেবার ধাঁধার উত্তর দিতে পেরেছিলেন শুধু একজন, বিজ্ঞ সলোমন। কিন্তু শেখ আবদুল্লা সাহেবের ধাঁধার উত্তর কে দিতে পারেন?

শ্রীনগরের শুধু হিন্দু ও শিখ নয়, বহু মুসলিমেরও মনে এই প্রশ্ন কী চাইছেন ভদ্রলোক? জম্মু, উধমপুর, বাটোর, বানিহাল আর অনন্তনাগ, তারপর শ্রীনগরের এই কয়েকদিনের যত্র-তত্র ও যখন-তখন বক্তৃতায় এবং বিবৃতিতে যে-সব কথা তিনি বলেছেন, সেগুলিকে অদ্ভুত এক ধাঁধার বাচালতা বলে সবারই মনে হয়েছে। কিন্তু শুধু ভাষাটাই ধাঁধা, ভঙ্গীটি একটুও ধাঁধা নয়।

পাকিস্তান এখন আর কাশ্মীরের উৎপীড়ক নয়; ভারতই উৎপীড়ক—এই কথা যিনি আজ মুক্তকণ্ঠে উচ্চারণ করে শ্রীনগরে মুসলিম জনসভার হাত-তালির শব্দ আর জিন্দাবাদ নির্ঘোষ শুনছেন, তিনিই আবার একই কণ্ঠে বলছেন যে, তিনি পাকিস্তানের স্তাবক নন। শেখ সাহেবের সব কথা, সব আবেদন এবং সব ভাষণের নিহিত সঙ্কেত এই যে, পাকিস্তান আজ কাশ্মীরীর গণভোট দাবি এবং সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশনের বান্ধব, সহযোগী ও সহায়ক। এর ফল যা হবার তাই হয়েছে এবং হয়েই চলেছে; পাকিস্তানের প্রতি কাশ্মীরী মুসলিমের মনে প্রীতি ও আত্মীয়তার ইচ্ছার এক নতুন আলোড়ন।

ধর্মের নাম করে কোন কথা বলছেন না শেখ সাহেব। কিন্তু ধর্মভাবনার সুযোগ গ্রহণ করতে তাঁর আচরণে কোন কুণ্ঠার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না। ঈদের দিনে ঈদগাহের বিপুল জমায়েতের প্রার্থনা শেষ হতেই সেই জমায়েত রাজনীতিক উৎসাহের ভিড় হয়ে যে-সব ধ্বনি ও বুলি ছেড়েছে, তার সবই রাষ্ট্রের সম্পর্কে অশ্রদ্ধার উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা ছাড়া আর-কিছু নয়। ধর্মীয় জমায়েতের এই আসরে শেখ সাহেবের বক্তৃতাও বেশ অগ্নিময় হয়ে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়েছে। বানিহালে এসে দেখা গেল, ঈদের প্রার্থনার জমায়েতের মানুষ সেই

বিকালেও ট্রাকে চড়ে ছুটোছুটি করছে আর 'রায় সুমার' দাবির ধ্বনি ছাড়ছে। মসজিদের প্রাঙ্গণ আর প্রার্থনা জমায়েত রাজনীতিক দাবির মুখরতার আসর হয়ে উঠেছে, কাশ্মীরের জনজীবনের এই দৃশ্যটা আমার মত ভারতীয় আগন্তুকের চোখে মোটেই সুসহ দৃশ্য নয়; খুবই উদ্বেগের দৃশ্য।

উদ্বেগ এই যে, কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িক অশান্তি, তার সাথে, সংখ্যালঘু হিন্দু ও শিখের উপর এই রাজনীতিক উত্তেজনার মুসলিমের আচরণ অবশ্যই মারাত্মক দৌরাত্ম্যে পরিণত হবে, যদি দেশের সরকার এখনই এবং এই মুহূর্তে প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন। শেখ সাহেবের কথাতে সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর প্রয়োজন সম্পর্কে সদিচ্ছার যত কথা আর যে-কথাই থাকুক না কেন, তার রাজনীতির দাবির কথাগুলি এবং তাঁর নেতৃত্বের রীতি-নীতির স্বাভাবিক পরিণাম এই যে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সার্কাসসিংহ আর খাঁচার মধ্যে না থেকে বাইরে এসে তার সগর্জন হিংস্রতা প্রকট করে তুলবে।

না দেখলে বোধহয় বিশ্বাস করতেই পারতাম না যে, দেশের একটি অঞ্চলের নাগরিক, যারা রাষ্ট্রের প্রজা, তারা আচরণে আর নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ছিন্ন করবার প্রগল্ভ আহ্লাদে এতটা মত্ত হবার সাহস করতে পারে। অবস্থার চেহারা দেখে মনে হয়েছে যে, সংবিধান এখানে যেন বাতিল হয়ে গিয়েছে। জানি না, গণতন্ত্রের উদারতার নামে পৃথিবীর অন্য কোথাও এই ধরনের রাষ্ট্রবৈরিতার কুৎসিত পিপাসার চিৎকার কখনও প্রশ্রয় পেয়েছে কিনা।

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর'—শেখ আবদুল্লা সম্পর্কে প্রায় এই রকমের ভক্তিরসিত এক ভারতীয় নেতাভদ্রলোক শেখ সাহেবের সম্মুখ-বক্তৃতা শুনেই আতঙ্কিতের মত ব্যস্ত হয়ে পাঠানকোটে চলে গেলেন, এ দৃশ্যও দেখেছি। তবু দেখছি, এখানে-ওখানে বড়-রকমের বিজ্ঞতার গবেষণা চলছে, শেখ সাহেবের কথার হেঁয়ালির ধূলি থেকে মাণিক বের করবার চেষ্টা। কিন্তু চোখের সামনে যে-সত্য দেখতে পাচ্ছি তা এই যে, শেখ সাহেব নিজেও আজ গণভোটবাদী জনতার সাম্প্রদায়িক মনোভাব, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি এবং পাক-প্রীতির কাছে নেমে এসে তাঁর নেতৃত্ব ও জনপ্রিয়তার নূতন ভিত্তি খুঁজছেন।

ভারত সরকারের আর্থিক বদান্যতায় কাশ্মীরের মানুষ টাকায় তিন কিলো চাল কিনতে ও খেতে পাচ্ছে—মিহি সুগন্ধ চাল। যেমন বয়স্ক-ব্যক্তির জন্য, তেমনই শিশুর জন্যও বরাদ্দ, প্রতি মাসে পনের কিলো চাল। কিন্তু শেখ সাহেব বিদ্রূপ করেছেন সস্তা চালে কাশ্মীর ভুলবে না। সেল্ফ্-ডিটারমিনেশন চাই। একজন মার্কিন টুরিস্ট (ইনি উর্দু বুঝতে পারেন) শেখ সাহেবের মুখের এই উক্তির অর্থটি ভাল করে বুঝে নেবার জন্য সঙ্গের কাশ্মীরী সাথীটিকে প্রশ্ন করলেন—সস্তা চাল, তার মানে খুব ব্যাড কোয়ালিটির

রাইস বোধ হয়? খেলে কলেরা আর ডায়েরিয়া হয় বোধ হয়? সাথী কাশ্মীরী একটু বিব্রতভাবে ব্যাখ্যা করে দিলেন—নো, স্যার; গুড রাইস। লেকিন ইয়ে চাওলকা সওয়াল নেহি, ইজ্জতকা সওয়াল।

কাশ্মীরের প্রতি ভারত সরকারের কোন উপকারের কোন কল্যাণকর্মের, কোন বান্ধবতার সামান্য স্বীকৃতিও শেখ আবদুল্লার কণ্ঠে শোনা যায় না। কিন্তু আজকের কাশ্মীরেও এমন মুসলিমের অভাব নেই, যাঁরা আজও স্মরণ করেন ও বলেও থাকেন, কাবালির হামলার সময়ে এই শ্রীনগরে পঁচিশ টাকা সের দরে নুন বিক্রী হয়েছে। কষ্টের অভাবের আর উদ্বেগের অন্ত ছিল না। সে সময়ে ভারত থেকে নুন-চিনি নিয়ে বিমান উড়ে এসেছে। ওষুধ এসেছে, খাদ্য এসেছে। সস্তায় বিকিয়েছে। মানুষ নিশ্চিন্ত হয়েছে।

আমি অক্ষরের মধ্যে 'অকার'—গীতার পুরুষোত্তমের কথার অর্থ বুঝতে অসুবিধে নেই। কিন্তু শুনে দুঃখ বোধ করতে হয়েছে, শেখ আবদুল্লার কথার মধ্যেও প্রায় এই ধরনের আত্মপরিচয়ের সুর। আমি চির নিষ্কলঙ্ক, আমি 'খোলা বই', আমিই খাঁটি গান্ধীবাদী, আমিই কাশ্মীর। ভারত খুশি হবে, পাকিস্তান খুশি হবে, কাশ্মীর খুশি হবে, ভারতের মাইনরিটি আর পাকিস্তানের মাইনরিটি উভয়েই নিরাপদে সুখী হবে—এত বড় কৃতিত্ব সাধন করবার মত প্রতিভা কবে পেলেন শেখ সাহেব, এটা কাশ্মীরের মুসলিমেরও মনের একটা খটকার প্রশ্ন। শেখ সাহেবের আশে-পাশে যে-সব মুসলিম গোষ্ঠী-নেতা ও জননেতা রয়েছেন, তাঁরাও শেখ সাহেবের এসব কথাকে অহমিকার বাগ্‌বিভূতি বলে মনে করেন। তাঁরা শুধু এই ভেবে খুশি যে, শেখ সাহেব হিন্দু সরকারকে জব্দ করতে চান, ও ং হিন্দুপ্রাধান্যের মুলুক থেকে মুসলিমের কাশ্মীরকে সরিয়ে নেবার প্রতিজ্ঞা করেছেন।

কাশ্মীরের এই গণভোটবাদী রাজনীতিক সংহতির ভিতরে ফাঁক আছে, নেতৃত্বে নেতৃত্বে বিরোধ আছে; এই কথা কল্পনা করে সান্ত্বনা লাভ করবার চেষ্টা বস্তুত ভাঙ্গা বেড়ার উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার অসার আশাবিলাস। যা দেখছি ও যতটুকু শুনছি, তার মধ্যে এটাই সব চেয়ে বড় সত্য বলে বুঝতে হয়েছে যে, ভারতের প্রতি বিরূপ হতে ও বিরোধিতার উপদ্রব জাগিয়ে তোলবার ইচ্ছায় ও চেষ্টায় এঁদের মধ্যে ঐক্যের কোন অভাব নেই।

আজাদ কাশ্মীরের সঙ্গে আর পাকিস্তানের সঙ্গে এদের চিন্তা বিনিময়ের কাজ বেশ সহজভাবেই চলছে, এই অভিযোগ বহু ব্যক্তির মুখে শুনতে পাওয়া গেল। গোপন বেতার সেট কাজ করছে। আজাদ কাশ্মীর থেকে লোকের আনাগোনাও একেবারে অসম্ভব হয়ে যায়নি। এই সেদিন শেখ আবদুল্লা ডাল লেকের কাছে এক গৃহস্বামীর সঙ্গে দেখা করে আজাদ কাশ্মীরবাসী এক বুজুর্গের মৃত্যুতে শোক ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করে এলেন। ওদিক থেকে অর্থাৎ

আজাদ কাশ্মীর থেকে প্রেসিডেন্ট(?) খুরশেদও বেতারে শেখ আবদুল্লাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন—আসুন, আপনি এখানে স্বাগত, আমরা আপনাকে আজাদ কাশ্মীরের নাগরিক বলে মনে করি।

কার্লাইল লিখেছিলেন, নেপলিয়ন যেন 'বাই এ হুইফ্ অব গ্রেপশট' প্যারিসের রয়্যালিস্টের সশস্ত্র অভ্যুত্থান দমিয়ে দিয়ে ফ্রান্সের প্রভু হয়ে গেলেন। জম্মু অ.দালতের মধ্যেই যে-ভাষায় যে-কথা বলে বক্তৃতা করেছেন শেখ সাহেব, তা শুনে মনে হয়, ভারতের বিরুদ্ধে কড়া কড়া কটূক্তির একঝাঁক তপ্ত ছিটেগুলী ছুঁড়ে তিনিও নিজেকে একটা মহাজয়ন্ত কীর্তির পুরুষ বলে মনে করেন। তাঁর কারামোচন নাকি ভারত সরকারের পরাজয়ের প্রমাণ। তাঁর পাশে ছিলেন যিনি, অর্থাৎ আফজল বেগ সাহেব, তিনি তো সেই আদালতের মধ্যেই ভারতকে, ভারত সরকারকে, আদালতকে, প্রসিকিউশনকে এবং বিচার বিভাগকে শ্লেষাক্ত ভাষায় বস্তুত মিথ্যাবাদী ও প্রতারক বলে বর্ণনা করে দিয়েছেন।

'সকল জ্বালার সব দীপ্তির পরিণাম শুধু ছাই'। কাশ্মীরেব রাজনীতিক ইচ্ছার চেহারা দেখে মনে হয়েছে, সতের বছরের আশা, শুভেচ্ছা ও সৎ-প্রচেষ্টাব পরিণাম যেন ছাই হয়ে যেতে চলেছে। কাশ্মীরের এহেন অবস্থার সঙ্গে ভারত সরকারের সামান্য আপোসও উচিত হবে না। গণভোট দাবির রাজনীতিকে অবিলম্বে অবৈধ ঘোষণা করতে ভারত সরকারের পক্ষে নীতি ও যুক্তির কোন বাধা থাকতে পারে না। হিরোসিমার ধ্বংসের পর পরাজিত জাপানের মিকাডো জাতিকে বলেছিলেন—অসহকে সহ্য কর। কিন্তু কাশ্মীর সম্পর্কে বলা যায়, এখানকার রাজনীতিক অবস্থার অসহনীয়তা আর-একটুও সহ্য করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে ধৈর্য ধরা আপোস করা এবং হেঁয়ালির কোষ্ঠিবিচার করার কোন অর্থ হয় না।

শ্রীনগর, ২৪শে এপ্রিল—নীল বানরে সোনার বাংলা করলে ছারখার—ছড়াটা এই কারণে মনে পড়ছে যে, আজ এই কাশ্মীরেরও রাজনীতিক জীবনের উপরে একশ্রেণীর বিদেশী আগন্তুকের ইচ্ছা ও কৌতূহলের উঁকিঝুঁকি মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে একটা শোচনীয় উপদ্রবের রূপ গ্রহণ করেছে। বিদেশী টুরিস্ট-দের কথা বলছি। একথা সত্য যে, এমন অনেক বিদেশী টুরিস্ট কাশ্মীরে আসেন, কাশ্মীরের রাজনীতির ভালমন্দ নিয়ে যাঁদের কৌতূহল হাটে-বাজারে হুটোপুটি করে বেড়ায় না। এঁদের মনে রাজনীতিক বিষয়ে কোন জিজ্ঞাসা থাকলেও সেটা সরব হয়ে ওঠে না। কিন্তু আবার এমন অনেক বিদেশী টুরিস্ট এসে থাকেন ও এসেছেন, যাঁদের প্রধান ব্যস্ততা হলো রাজনীতিক কাশ্মীরের অলিগলি ঘুরে বেড়ানো, গণভোট নিয়ে মাথা ঘামানো, এবং কাশ্মীরের একটা চমৎকার বিদ্রোহের রূপ দেখবার জন্য ছটফট করা। শেখ আবদুল্লার প্রেস

কনফারেন্সে এ'রা উপস্থিত হয়েছেন আর সবচেয়ে বেশি কথা বলেছেন। রাজনীতিক মিছিলের ছবি তোলবার জন্য এ'দের হাতের ক্যামেরার ব্যস্ততার ও আগ্রহের সীমা নেই। এ'রা ছাত্রদের ডেকে কথা বলেন, টাঙ্গাওয়ালাদের সঙ্গে হাসাহাসি করেন। কিন্তু সব কথা ও সব হাসাহাসির সঙ্গে রাজনীতির ঔৎসুক্যের কলরব থাকবেই। পাকিস্তান আচ্ছা হ্যায়? রাইজিং কিতনা দেরি? প্রশ্নের রকমগুলি এই ধরনের। রাজনীতিক নেতাদের সঙ্গে এ'দের মেলা-মেশার চেষ্টাও দেখা যায়। শুধু প্রশ্ন করে নয়, এ'রা কাশ্মীরের রাজনীতিক বাতাসকে প্রেরণা দিয়ে একটু আন্দোলিত করতেও সচেষ্ট হয়ে থাকেন। তা ছাড়া, পরামর্শ দেবার ব্যস্ততাও আছে। হাউসবোট থেকে চলে যাবার সময় কাশ্মীরী বোটওয়ালাকে সেদিন বিদায়কালীন শুভেচ্ছা জানালেন এক টুরিস্ট দম্পতি (হয় মার্কিন, নয় ইংরাজ)-গড বোল্‌তা হ্যায় ফ্রী অ্যাণ্ড হ্যাপি কাশ্মীর!

আজকের ভারতীয় জনমতের হরিশ অসময়ে মরে যাননি, কোন লঙেরও কারাগার হয়নি, তবে এই নতুন নীল বানরের উপদ্রব কাশ্মীরের রাজনীতির উপরে চড়াও হবার অবাধ সুযোগ পায় কেন? এ বিষয়ে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একটা সতর্কতার ব্যবস্থা বিহিত করা দরকার। কাশ্মীরের গণভোট-বাদী রাজনীতিক উত্তেজনার মধ্যে বৈদেশিক অভিসন্ধিকে ধূমায়িত হবার কোন সুযোগ দেওয়া উচিত নয়।

আর একটা ব্যাপার, যেটা ভারতের রাষ্ট্রিক স্বার্থের দিক দিয়ে আরও ক্ষতিকর বলে মনে হয়েছে, সেটা হলো রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষকদের আচরণের একটি অসঙ্গত উৎসাহ। এক্ষেত্রেও বলা যায় যে, এই অভিযোগ নিশ্চয়ই পর্যবেক্ষকদের সবারই সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু বাদামবাগের কাছাকাছি রাষ্ট্রপুঞ্জ পর্যবেক্ষকের ওই যে অফিস, সেখানে প্লেবিসিট ফ্রণ্টের অনুরাগী ছাত্রদের ভিড় কেন? এক কাশ্মীরী মুসলিম ভদ্রলোক, যাঁর সঙ্গে পথে দেখা হয়েছে আর আলাপও হয়েছে, তিনিই বলছেন, অবজার্ভার ভদ্রলোকেরা খুব সিমপ্যাথির সঙ্গে ফ্রণ্টের যুবকদের কথা শুনে থাকেন। আশ্বাসও দিয়ে থাকেন, এখানে নয়, পিণ্ডিতে গিয়েই ওয়াশিংটনে তার করে আপনাদের জনমতের দাবির কথা জানিয়ে দেব। জানি না, এইসব পর্যবেক্ষকের সঙ্গে স্থানীয় রাজনীতির গোপন ও প্রকাশ্য মেলামেশার সম্পর্কে ভারত সরকার কোন খবর রাখেন কিনা। কাশ্মীর সরকারী ইনটেলিজেন্সের কাজে যদি কোন ফাঁকি বা আলস্য না থেকে থাকে, তবে সরকার নিশ্চয় এ খবর পেয়েছেন। এসব শুধু অনুমান করেই বলেছি। কিন্তু ধারণা এই যে, সরকারী নজর এ দিকে একটুও সতর্ক নয়।

অন্যভাবে বলা যায়; কাশ্মীরের ভারতবিরোধী রাজনীতিক দলগুলি যদি

গোপনে বা প্রকাশ্যে তাদেব কথা পর্যবেক্ষক অফিসের অন্তঃপুরে পেঁছে দেবার অথবা সংস্রব রাখবার সুযোগ পেতেই থাকে, তবে সেটা নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের মনকে পক্ষপাতিত্ব প্ররোচিত করবার সুযোগ হয়ে উঠবে। এমন সুযোগ কঠোর নিষেধের দ্বারা স্তব্ধ করে দেওয়াই কর্তব্য।

নরওয়ের ইতিহাসের কাহিনীতে একজন যোদ্ধার নাম বারসের্ক। বারসের্ক সব সময়েই প্রমত্ত, যুদ্ধ করবার জন্য সব সময় উৎসুক ও অস্থির। মির্জা আফজল বেগের বক্তৃতা ও বাচনিক ভংগী, সেই সংগে তাঁর চোখমুখের ভাব দেখলে তাঁকে দ্বিতীয় এক বারসের্ক বলে মনে হবে। কাশ্মীরী মুসালমের রাজনীতিক মহলেরই কোন কোন নেপথ্যের ফিসফাস কানাঘুষা এই যে, শেখ আবদুল্লা এখন এহেন আফজলেরই প্রভাবের কাছে একটি অসহায় আত্মসমর্পণ। কাশ্মীরের সরকারী নেতৃত্বের কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে, আফজলের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারলে শেখ আবদুল্লার চিন্তার সুস্থতা ও সৌষ্ঠব চরম বিকৃতির অভিশাপ থেকে হয়তো রক্ষা পেতে পারবে।

কাশ্মীর থেকে চলে যাবার দিন এগিয়ে আসছে। আশাভংগের অনেক ঘটনার ছবি দেখেও কিন্তু হতাশ হয়নি। এই ঝিলমের স্রোত আর পপলাবের উপবন, আর সুন্দরকান্তি এই কাশ্মীরী নরনারী ও শিশু আমার ভারতীয় জীবনের আপনজন না হয়ে পর হয়ে যাবে, এটা বিশ্বাস করি না; যদিও বিশ্বাস বিচলিত করবার মত অনেক দুঃখকর বিস্ময়ের দৃশ্য দেখতে হয়েছে। মনে হয়েছে, প্রধান প্রধান সর্বভারতীয় রাজনীতিক দলগুলি প্রত্যক্ষভাবে কাশ্মীরের জনজীবনের রাজনীতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করবার প্রয়াস কুণ্ঠিত করে রেখেছেন বলেই কাশ্মীরের রাজনীতিক আগ্রহের পরিধি নিতান্ত ঘরোয়া সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থেকেছে ও ভারত বিরোধী হবার মত একটা অসুস্থ প্রকৃতি লাভ করেছে। জাতীয় কংগ্রেসের সংগে কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্সের সমন্বয় আগেই হয়ে গেলে কনফারেন্সকেও বোধহয় এ রকম কোণঠাসা অবস্থার দুর্ভাগ্য লাভ করতে হতো না। তা ছাড়া কনফারেন্সের ভিতরের যত দুর্বলতা, ত্রুটি ও অনাচার অন্তত সর্বভারতীয় সমালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রভাবে কিছুটা সংযত হতে পারতো। অন্যান্য প্রধান প্রধান সর্বভারতীয় রাজনীতিক দলের সম্পর্কেও এটা সত্য; তাঁদের নেতৃত্বের প্রভাবে কাশ্মীরের জনমতে সরকারের সমালোচনার আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠলেও সেটা রাষ্ট্রানুগত্যের সমস্যা নিশ্চয় হয়ে উঠতো না। এক্ষেত্রেও কাশ্মীরকে আলগা হয়ে পড়ে থাকতে দেওয়া ভুল হয়েছে।

ঐতিহাসিক কলহন অতীতের কাশ্মীরের যে-সব চন্দ্রাপীড় নৃপতির কাহিনী লিখেছেন, তাঁদেরই মধ্যে একজন চন্দ্রাপীড় গৌড়ের নৃপতি শশাংককে 'গৌড়ভুজঙ্গ' বলে নিন্দা করেছিলেন। তুলনাটা খুব সুষ্ঠু নয়; তবু বলতে

হচ্ছে যে, শেখ আবদুল্লা, যিনি আজ নিজেকে কাশ্মীরের রাজনীতিক পুরুষোত্তম বলে মনে করছেন, তিনিও প্রায় এই ধরনের একটি নিন্দোক্তি করেছেন। তাঁর মনে বর্তমান নেহরুর ইমেজ হলো একটা 'কুৎসিত ইমেজ'। তবু শেখ সাহেব তাঁর প্রাক্তন শ্রদ্ধার নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনা করতে দিল্লি যাবেন।

আর রাজনীতিক প্রসঙ্গ নয়; এই কয়েকদিনের অভিজ্ঞতার ও দুশ্চিন্তার কণ্টকিত স্পর্শ থেকে মনের শান্তিকে নীল ও সাদা ডাফোডিলে ভরা ওই নিরালা মাঠের একান্তে নিয়ে গিয়ে, মহাদেব পাহাড়ের ঝর্না-ধোয়া সাদা পাথরের ঝিকমিকে হাসি আর ফুর্তির কালোপাখি ওই ছোট্ট আবাবিলের খেলা দেখতে ইচ্ছে করছে।

এই তো সেই কাশ্মীর, যে-কাশ্মীরের প্রতিভার ঐতিহাসিক দান আজও ভারতের ক্লাসিকসের চিরন্তন সম্পদ হয়ে রয়েছে। আলংকারিক বামন আর রসিক কবি দামোদর গুপ্ত এই কাশ্মীরেরই সাংস্কৃতিক প্রতিভার দুই প্রতিনিধি। বৈয়াসকী মহাভারতের প্রাচীনতম পুঁথি (এখন প্যারিস গ্রন্থাগারের সম্পদ) এই কাশ্মীরেরই প্রাচীন সাহিত্যিক জীবনের সারদা লিপিতে লিখিত। কাশ্মীরীভাষাও সংস্কৃতের আত্মীয় পৈশাচী গোষ্ঠীর ভাষা। কিন্তু হায় সারদা লিপি, এবং হায় কাশ্মীরী ভাষা! সারদা লিপির ব্যবহার কবেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। আর কাশ্মীরী ভাষাতে লিখিত সাহিত্য এখনও গড়ে ওঠেনি। উর্দু লিপিতে কাশ্মীরী ভাষার কিছু ছড়া ও সঙ্গীত অবশ্য প্রকাশিত হয়ে থাকে; কিন্তু চল্লিশ লক্ষ লোকের মাতৃভাষা কাশ্মীরী ভাষা যেমন সাহিত্যের আসরে, তেমনই সরকারী দরকারে কোন স্বীকৃতি ও মর্যাদা পায়নি। শোনা যায়, মহারাজা গোলাব সিংহ সারদা লিপির পুনরুজ্জীবনের ও প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে-চেষ্টাকে নিতান্ত হিন্দুত্বের চেষ্টা বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। নাই বা হোক সারদা লিপির প্রচলন, উর্দু লিপিতেই কাশ্মীরী ভাষার সাহিত্য রচনার চেষ্টা কেন হবে না? সিন্ধী ভাষা তো উর্দু লিপিতেই তার সাহিত্যকে সঞ্জীবিত করে রেখেছে।

কাশ্মীরের ভূশোভার নয়নমোহন বিচিত্রতার দিকে তাকিয়ে এই কথাই ভাবছি, কাশ্মীরের রাজনীতিক জীবনের সুস্থতা ফিরে আসুক। এই চেনারের গায়ে নতুন বাতাস লেগে পাতায় পাতায় নতুন মর্মরধ্বনি জাগুক। কাশ্মীরের মন যেন যে-কোন ভারতীয়কে বলতে পারে, মারলোর কাব্য যেমন বলেছে – Come, live with me and be my love! এস, আমার সঙ্গে একই ঘরে থাক, আর আমার প্রিয় হও!

দুর্গের দেশ জম্মু

দুর্গের দেশ জম্মু। কপুরগড়, রাগনগর ও গুলাবগড়; এবং আরও কত ছোটবড় দুর্গ। জম্মুর ঐতিহাসিক বিক্রমের এইসব স্মৃতির কঠিন শিলাপীঠের কাছে গিয়ে কিছু দেখবার সুযোগ হয়নি। কিন্তু কলকল ছলছল টলমল জল, চেনাবকে দেখলাম।

জম্মুর সড়কের দুই পাশের বনের গায়ে টুকটুকে লাল আনারকলির সমারোহ আর পাইনের উতলা হাওয়া। চেনাবের জল কিন্তু জম্মুর কৃষির সবুজ ঘনতর করে তুলতে পারেনি। জম্মুর মানুষ অভিযোগ করে বলছে, পাকিস্তানের সুবিধা আর সরকারের মন রাখতে গিয়ে চেনাবের জলকে বাঁধবিহীন অবাধ-গতির ছাড়পত্র দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। চোখেও পড়েছে, চেনাবের প্রবাহের দুই পাশের অনেক ভূমি রুক্ষ ঊষর ও কাঁটাঝোপের প্রান্তর মাত্র। জম্মুর কৃষকের পক্ষে অবস্থাটা বেশ বেদনাদায়ক। হবেই বা না কেন? আমারই বঁধুয়া আন বাড়ি যায়, আমারই আঙিনা দিয়া কথাটা কাব্যের আবেগের ভাষা হিসাবে যতটা ভাল শোনায়, কৃষকের জীবিকার একটি দুঃখের ভাষা হিসাবে নিশ্চয় ততটা, ততটা কেন, মোটেই ভাল শোনাবে না।

তবে জম্মুতে এসে যেন হাঁপ ছাড়বার সুযোগ পেয়েছি। জম্মু সহরের ভিড়ের মধ্যেও শ্রীনগরের ভিড়ের সেই দুঃসহ অকৃতজ্ঞ রাজনীতিক মুখরতার কোন প্রতিধ্বনি নেই। খায় দায় পাখিটি, বনের দিকে আঁখিটি এখানে রাষ্ট্রের সুখ-দুঃখে লালিত মানুষের মনে এ রকমের চিন্তার বিন্দুমাত্র উৎপাতও নেই। শেখ আবদুল্লাও জম্মু-জনতার মনে তাঁর উদাত্ত হেঁয়ালির ভাষা দিয়ে কোন মোহ সৃষ্টি করতে পারেননি। হাজার হাজার লোক শেখ সাহেবকে শুধু দেখেছে, তাঁর কথা শুনেছে। শেখ সাহেবের হেঁয়ালিকে কেউ জিন্দাবাদ জানায়নি। জয়হিন্দ ধ্বনিই বেশি করে বেজেছিল।

এখানে এসেও শ্রীনগরের একজনের কথা বার বার মনে পড়ছে, এক বৃদ্ধ ফলওয়ালা, কাশ্মীরী মুসলিম। পথের 'রায় সুমার' ধ্বনির প্রতি এই বৃদ্ধের মনে সামান্য বিশ্বাসেরও বালাই নেই। আখরোট, বাদাম, খুবানী, আলুবোখারা আর পাকা লোকাট ফলের স্তূপ সাজিয়ে বসে আছেন ফলওয়ালা। ডাক দিয়ে বললেন—ইয়ে দো রোজকা জশন হ্যায়, জনাব। কারও মজাল নেই যে, হিন্দ সরকারকে এখান থেকে হটাতে পারবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কাশ্মীর হিন্দুস্তানমে হ্যায় হিন্দুস্তান মে হি রহেগা।

পয়লা বৈশাখের দিনে হিন্দুরা গুপ্তগঙ্গায় পূজার ফুল ভাসিয়েছিল। আমারও মনে হয়েছিল, অজস্র সাধারণ কাশ্মীরীর মনে ভারতীয় সম্পর্কের তৃপ্তিটি গুপ্তগঙ্গার মত সত্য হয়ে রয়েছে। 'আটতাল্লিশ কা' ওয়াদা পুরা

করো; ১৯৪৮ সালের অঙ্গীকার পূর্ণ কর; শ্রীনগরের মিছিলের ধ্বনি শুনে এই ফলওয়ালা হেসেছিলেন আর নিজের মন বিড়বিড় করেছিলেন—তুমহারা শকলকো আয়নামে দেখো, তবেই বুঝতে পারবে ওয়াদা পুরা হয়েছে কিনা। কে জানে ১৯৪৮ সালে শ্রীনগরে এসে কিসের অঙ্গীকার শুনিয়ে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নেহরু।

জম্মুর জীবনে এ ধরনের দাবির ও প্রশ্নের কোন রব নেই। বরং জম্মুর অভিযোগ এই যে, ভারত সরকারের ভুলে জম্মুর হিন্দুজীবনকেও গণভোটবাদী কাশ্মীরী মুসলিমের রাজনীতিক দাবদাহের জ্বালা সহ্য করতে হচ্ছে। এ বিষয়ে জম্মু অবশ্য একটুও নীরব নয়। শেখ আবদুল্লার হেঁয়ালির ছলনা থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য জম্মুর চেতনা সতর্কতা ও চেষ্টার অভাব নেই। ঠিক কথা, গণভোটের দাবি শেখ সাহেবের দ্বারা যতই চমৎকার উদারতার ও শুভবুদ্ধির ভাষায় মণ্ডিত হয়ে প্রচারিত হোক না কেন, জম্মুর মন একেবারে খাঁটি অবিশ্বাসের সঙ্গে সেই দাবিকে বিদ্রূপ করে সরিয়ে দেবে। জম্মুর এই জাগ্রত বাস্তবতাবোধ লক্ষ্য করে খুশি হয়েছি। জন বানিয়ানের কল্পিত সেই জাদুর ময়দানে, যেখানে বিশ্বাস করে ঘুমিয়ে পড়লে বিপদের ঝড় উঠিয়ে নিয়ে চলে যাবে, জম্মু সেখানে ঘুমিয়ে পড়তে রাজি নয়। ভারতের কোন কোন জনমত ও নেতৃত্বের মনে শেখ আবদুল্লাকে একজন টাইটান গোছের শক্তিধর বলে যে-ধারণা প্রশ্রয় লাভ করেছে, তার প্রতি জম্মুর ভর্ৎসনাও বেশ তীব্র হয়ে উঠেছে। জম্মুর একদল ছাত্র বলে উঠলো– কাশ্মীর উপত্যকার সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশন দাবি যদি স্বীকৃত হয়, তবে জম্মু উপত্যকাও সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশন দাবি করতে পারে।

ভারত সরকারের কাশ্মীর-নীতি সম্পর্কে জম্মুর সাধারণ মানুষের সাধারণ অভিযোগ এই যে, সরকারের আচরণে কেতাবী শিক্ষার বড় বেশি প্রভাব। সরকার আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘ দেখেন না; পঞ্জিকার দিকে তাকিয়ে বিচার করেন, আকাশের মেঘলা হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা।

এটা শুধু জম্মুর অভিযোগ নয়। কোথায় না শুনলাম সরকারের সম্পর্কে এই অভিযোগের কথা! গত বছর যেমন আসাম সীমান্তে গিয়ে সবারই মুখে সরকারের প্রতিরক্ষা-নীতির কেতাবীপনা ও অবাস্তব বুদ্ধির অভিযোগ শুনতে হয়েছিল, এই সীমান্তে এসে তেমনই সরকারের কাশ্মীর-নীতি সম্পর্কে বিপুল অভিযোগের নানা কথা শুনতে হয়েছে। এক এক সময়ে সত্যিই মনে হয়েছে, কেতাবীপনার পণ্ডিতের নেতৃত্বের চেয়ে কাণ্ডজ্ঞানী নিরক্ষরের নেতৃত্বও ভাল। নিরক্ষর আকবর ও শিবাজীর রাজনীতিক নেতৃত্ব ইতিহাসের যেমন প্রশস্তি পেয়েছে, তেমনই চরম অযোগ্যতার অখ্যাতি পেয়েছে ইংলণ্ডীয় ইতিহাসের এক অতিবিদ্বান ক্যাবিনেট, পামার্স্টন মন্ত্রিসভা (১৮৫৯), যে-মন্ত্রিসভার সাতজন

মন্ত্রী ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতজন ফার্স্ট-ক্লাস গ্র্যাজুয়েট।

এদিকের প্রতিরক্ষার সীমান্তিক ঘটনা সম্পর্কে বলবার মত কিছু নেই, কারণ সে-বিষয়ে বুঝবার মত কোন ঘটনার কাছে পেঁাছবার অভিজ্ঞতা হয়নি, হওয়া সম্ভবও নয়। তবে এই সত্যটি বুঝে নিতে কোন অসুবিধা নেই, এখানে আমাদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাতে চেষ্টার ও সতর্কতার কোন অভাব নেই। দেখতে সব চেয়ে বেশি ভাল লেগেছে, জওয়ানের সুদৃপ্ত অথচ সুহাসিত উৎসাহ। গত বছব তেজপুরের ফরোয়ার্ড এরিয়াতে জওয়ানের মুখে এতটা প্রফুল্লতার ভাব দেখতে পাইনি। পুরা প্যাক নিয়ে সজ্জিত হয়ে আর ট্রেঞ্চ মর্টার কাঁধে নিয়ে তরুণ জওয়ান জম্মুর পাহাড়ের বুকে দুরূহ ক্লেশকর এক্সারসাইজ কী চমৎকার হাসিমুখে সহ্য করছে, এ দৃশ্যও চোখে পড়েছে।

ফেরবার পথে আবার একবার দেখলাম; রাভি নদী, অর্থাৎ নদী ইরাবতী। রাভির শুকনো বুক যেখানে শুধু নুড়িভরা বালিয়াড়ী হয়ে পড়ে আছে, সেখানে এক গাছের ছায়াতলে বসে আছেন এক সিপাহী জওয়ান। বছর ত্রিশ বয়স, কিন্তু মুখের চেহারা বালকের মত। তাই কল্পনাতে তার নাম বালকরাম বলেই ধরে নিলাম। বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীরবাসী; সিপাহী বালকরাম ছুটি পেয়ে সীমান্তের ফিল্ড সার্ভিসের শিবির থেকে আজ বাড়ি ফিরছেন। জম্মুর এক ডোগরা গাঁয়ের মানুষ এই জওয়ান, সিপাহী বালকরাম।

দেশেব প্রতিরক্ষার শক্তির মেরুদণ্ড; জম্মু ও কাশ্মীরের শান্তি ও নিরাপত্তার জাগ্রত রক্ষী-প্রহরী এই সাধারণ সিপাহী জওয়ান। বেতন শুধু মাসিক পঞ্চাশ টাকায়; পাঁচ বছর পরে আড়াই টাকা বৃদ্ধি। তারপর আবার পাঁচ বছর পরে আড়াই টাকা। এই পঞ্চান্ন টাকাই সিপাহীর জীবনের বেতনের চরম উন্নতি। আঠার বছরের সৈনিকতার শেষ আটটি বছরের প্রাপ্তি হলো মাসিক এই পঞ্চান্ন টাকা। মাগ্‌গি ভাতা এগার টাকা; আর ফিল্ড সার্ভিসে থাকলে কমপেন্সেটরী অ্যালাউয়েন্স আরও আট টাকা। পীস এরিয়া অর্থাৎ শান্তি এলাকার ব্যারাকে থাকবার সময় পোশাকের খরচা বাবদ যে পাঁচ টাকা দেওয়া হয়, ফিল্ড সার্ভিসে থাকবার কালে সেটা আর দেওয়া হয় না।

যেমন সিপাহী তেমনই জে সি ও, এরা সবাই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের উপকার ও অধিকার থেকে বঞ্চিত। সিপাহীর বেতনের মাসিক চার টাকা শুধু বাধ্য জমা হিসাবে কাটা হয়, সুদ বার্ষিক শতকরা চার টাকা। সুতরাং কল্পনা করতে পারা যায়, একজন সিপাহী আঠার বছর সার্ভিসে থাকবার পর যখন অবসর গ্রহণ করবে, তখন কত টাকার পুঁজি নিয়ে সে তার সংসারের ক্ষুধাতৃষ্ণার দাবির মধ্যে এসে ঠাঁই নিতে পারবে? বড় জোর হাজার বা দেড় হাজার টাকা। প্রৌঢ়ত্বের জীবনে আর্থিক প্রতিশ্রুতির মাত্রা যেখানে এত ছোট আর এত শীর্ণ, সেখানে জওয়ান সিপাহীর কাছ থেকে দেশরক্ষার জন্য প্রাণোৎসর্গের প্রতিশ্রুতি দাবি

করবার নৈতিক অধিকার রাষ্ট্রেরও থাকতে পারে কি?

অথচ মিলিটারী ডিপোতে বা অন্য কোন কর্মকেন্দ্রে সিভিল ভৃত্য ও মজুর যারা কাজ করে, যাদের প্রাত্যহিক কর্তব্যের সময় ঘড়ির কাঁটার দশটা-পাঁচটা সংকেত দিয়ে বাঁধা, সিপাহী সৈনিকের মত চব্বিশ ঘণ্টার প্রতি মুহূর্তের ডিউটির মানুষ যারা নয়, তাদেরও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আছে, তাদের বেতনের আরম্ভ সত্তর টাকা, মাগ্‌গি ভাতা সতের টাকা, আর বছরে এক টাকা বেতন বৃদ্ধি।

যোদ্ধা সিপাহীর বেতনের ও সুবিধার মান ডিপো মজুরের বেতন ও সুবিধার চেয়েও দীনতর হবে, তাতে কি দেশরক্ষার কর্তব্যের মহত্ত্বকে বিদ্রূপ করা হয় না?

হ্যাঁ, যুদ্ধে নিহত সিপাহীর বিধবা মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি পাবেন, প্রতি ছেলেমেয়ে বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত মাসিক পাঁচ টাকা পাবে, এই নিয়ম অবশ্য আছে। বছরে দুই মাস সবেতন ছুটিও আছে। যুদ্ধে বা কর্তব্যরত অবস্থায় ঘটনার আঘাতে পঙ্গু হলে মাসিক দশ টাকা থেকে শুরু করে পঁয়ত্রিশ টাকা পর্যন্ত পেন্সনও আছে। সিপাহীর সন্তানের প্রাইমারী শিক্ষার জন্য মাসিক দশ টাকা, আর সেকেণ্ডারী শিক্ষার জন্য মাসিক পনের টাকার দাতব্যও আছে। সিপাহীর পেন্সন মাসিক বাইশ টাকা।

কমিশনী অফিসারদের 'বিচ্ছেদ ভাতা' আছে। পরিবারের সঙ্গ ছাড়া হয়ে দূরের শিবিরে থাকতে হলে অফিসারের প্রিয়জন-বিচ্ছেদ, আর সিপাহীর প্রিয়জন-বিচ্ছেদের মধ্যে করুণতার কী পার্থক্য আছে, জানি না। কিন্তু সিপাহীর জন্য কোন বিচ্ছেদ-ভাতা নেই। সমস্ত যৌবনকালের মন-প্রাণ ও দেহের সব শক্তি উৎসর্গ করে সিপাহীর জীবনে যখন বিদায়-সন্ধ্যার ছায়া নামে, তখন তার হাতে যে শোচনীয় সামান্য সঞ্চয়ের পুঁজি থাকে, সেটা তার জীবনের একটি করুণ অসহায়তা মাত্র।

আসল যুদ্ধ লড়ে সিপাহী, সব চেয়ে বেশী প্রাণ যায় সিপাহীর। সন্তুষ্ট সিপাহী, ভবিষ্যতের আর্থিক নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত সিপাহী হলো সামরিক বাহিনীর শক্তির সব চেয়ে বড় অবলম্বন। দেশের কারখানা শ্রমিকের বেতন, মজুরী ভাতা ও সুবিধার তুলনায় সৈনিক সিপাহীর প্রাপ্য দীনতর ও হীনতর হলে সেটা এক ভয়ানক অর্থহীন বৈষম্যেরও প্রশ্রয় হবে।

সিপাহী বালকরামের উর্দির বুকে কৃতিত্বের রঙীন রিবন। ইরাবতীর শুকনো বুকে বিকেলের আলো মৃদু হয়ে আসছে। বালকরামের হাতে একটি ঝোলা, তার ভিতরে কয়েকটা পুতুল আর একশিশি সুগন্ধ তেল। ইরাবতীর নুড়ি আর বালিয়াড়ী পার হয়ে ওপারের গাঁয়ের দিকে চলে গেল বালকরাম। তিন বছর পরে ঘরে ফিরছে বালকরাম। মনে হচ্ছে, ঘরে ফিরে কয়েকটি নতুন

মধুরতার হাসিমুখ দেখতে পেয়ে আরও মিষ্টি হয়ে ফুটে উঠবে যোদ্ধা সিপাহী বালকরামের মুখের হাসি।

আজও আছে সেই বিতস্তা, আজকের কাশ্মীরের যে নদীর নাম ঝিলম। কলহন তাঁর রাজতরঙ্গিণীতে লিখেছেন, ঋষি কশ্যপ এক গিরি-হ্রদের জল প্রবাহিত করে এই বিতস্তাকে সৃষ্টি করেছিলেন। নিতান্ত কল্পনার কথা বটে; কিন্তু কল্পনাটা অসুন্দর নয়। নদী বিতস্তা, তথা ঝিলম, কাশ্মীরের ভৌম-প্রকৃতির একটি চমৎকার বিস্ময়। এই ঝিলমের চিরপ্রবাহিত স্রোতেব মত কাশ্মীরের উপত্যকার মানুষের জীবনের ইতিহাসও প্রবাহিত হয়েছে। সেই ইতিহাস নিতান্ত ভারতেরই জীবনের একটি স্থানিক বৈচিত্র্যের ইতিহাস।

এই কাশ্মীর কি সত্যই একটা সমস্যা? আজকের রাষ্ট্রপুঞ্জের আসরে আন্তর্জাতিক মুখরতার এক অদ্ভুত কলববের মধ্যে কথাটা বার বার শুনতে পাওয়া যায়, কাশ্মীর সমস্যা! কিন্তু কিসের সমস্যা? কার কাছে কাশ্মীর একটা সমস্যা?

বলতে পারা যায়, কাশ্মীর তাদেবই দ্বারা একটা সমস্যা বলে প্রচারিত হয়েছে, যাদের মনে সাম্রাজ্যিক সুখের আশা এখনও একটা পুরাতন স্বপ্নের উদ্ধত লালসার মত জেগে রয়েছে।

কাশ্মীর উপত্যকার যারা অধিবাসী, তাদের বেশির ভাগই মুসলমান। হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা খুবই কম; শতকরা পাঁচের বেশি নয়। লাদকের অধিবাসীরা বৌদ্ধ। জম্মুর অধিবাসীরা বেশির ভাগ হিন্দু; মুসলিমের সংখ্যা খুবই কম। ধর্মগতভাবে এই তিন ভিন্ন জনসমাজের তিনটি ভিন্ন বাসভূমি নিয়ে ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য। কিন্তু এই কারণে কারও পক্ষে এমন ধারণা করবার যুক্তি নেই যে, এটা একটা সমস্য; এবং বিশেষ করে কাশ্মীরেরই একটা সমস্যা। ভারতের প্রায় সকল রাজ্যেই ছোট-বড় বহু অঞ্চল আছে, তালুক জেলা মহকুমা গ্রাম ও মহল্লা, যেগুলো বিশেষ বিশেষ আর ভিন্ন ভিন্ন ধর্মানুগত জনসমাজের বাসভূমি। কিন্তু সেজন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ধর্মগত কোন সমস্যার রাজ্য হয়ে ওঠেনি। আরও একটা বড় সত্য এই যে, কাশ্মীর উপত্যকার মুসলিম অধিবাসীর জীবনে ধর্মগত স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতার কোনই সমস্যা নেই। মওলানা মাসুদি, মৌলবী ফারুক আর জনাব মহিউদ্দিন কারা; কিংবা শেখ আবদুল্লা ও মির্জা আফজল বেগ; এ'রাও কেউই আজ পর্যন্ত এমন অভিযোগের কথা মুখরিত করেননি যে, কাশ্মীরী মুসলিমের ধর্মাচরণের সুবিধা ও স্বাধীনতার কোন সমস্যা আছে।

ভাষা নিয়েও কোন সমস্যা নেই। কাশ্মীরী হিন্দু-মুসলিমের ঘরোয়া ভাষা কাশ্মীরী; জম্মুর ঘরোয়া ভাষা ডোগরী; আর লাদকের ঘরোয়া ভাষা লাদকী।

কিন্তু এটাও কি নিতান্ত একটা কাশ্মীরী সমস্যা? নিশ্চয়ই নয়। ভারতের অনেক রাজ্যে এখনও ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগত অঞ্চল আছে। এই পশ্চিমবঙ্গেরই দার্জিলিং ভাষাগত অঞ্চল হিসাবে রাজ্যের অন্য অঞ্চল হতে ভিন্নতর। তাছাড়া ভারতের প্রত্যেক রাজ্য বস্তুত কম-বেশি বহুভাষী, সেখানে ভিন্নভাষী অন্য রাজ্যের জনসমাজও বসবাস করে।

পরিচ্ছদের কথাই ধরা যাক। কাশ্মীরের একটি প্রচলিত প্রবাদে বলা হয়েছে, মাথার টুপিটি সরিয়ে দিলে কে-ই বা হিন্দু আর কে-ই বা মুসলিম? পরিচ্ছদে সাধারণ কাশ্মীরী হিন্দু-মুসলিমের প্রভেদ খুবই সামান্য; নেই বললেও চলে। এক্ষেত্রে দুই সমাজের ভেদ স্পষ্ট করে তোলার মত কোন ভিন্নতা নেই। যেটুকু আছে সেটা কোন সমস্যাই নয়। যদি সমস্যা বলা হয়, তবে একথাও বলতে হবে যে, এটা নিতান্ত অথবা বিশেষ করে কাশ্মীরী সমস্যা নয়। ভারতের সব রাজ্যেই এই সমস্যা আছে।

আসল সত্য অবশ্য, এই যে, এগুলি সমস্যাই নয়। যেটা বৈচিত্র্য সেটা ঠিক প্রভেদ নয়। এবং ভারতের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এই যে, বৈচিত্র্যই তার একটি সৌন্দর্য। এই সংস্কৃতি আকারে ও প্রকারে একটি কঠোর 'মনোলিথ' নয়। 'বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান্'- কবির উক্তি বাড়িয়ে বলা কল্পনার কথা নয়; ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বাস্তব ঐতিহাসিক সত্য।

তাই বুঝতে পারা যায় না, আধুনিক কাশ্মীরের কিছু মুসলিম কেন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা তুলে রাজনীতিক স্বাতন্ত্র্যের দাবি তুলেছেন। কাশ্মীরী মুসলিমের সমাজ ধর্ম ও সংস্কৃতির জীবনে কোন স্বচ্ছন্দতার অভাব নেই। শুধু ধর্মের নাম করে যদি পাকিস্তানীর সঙ্গে কাশ্মীরী মুসলিমের আত্মীয়তার একটা দাবি দাঁড় করানো হয় তবে সেটাও ভুল যুক্তিই হবে। পাঁচ কোটি ভারতীয় মুসলিমের সঙ্গে কি চল্লিশ লক্ষ কাশ্মীরী মুসলিমের ধর্মগত আত্মীয়তা নেই?

এসব সবারই জানা কথা। সাধারণ সহজ ও সরল এবং বাস্তব সত্যের কথা। কিন্তু একটা বিস্ময়ের বিষয় বলতে হবে, কাশ্মীরের কিছু মুসলিম তবু আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করেন, কেউ কেউ একেবারে পাকিস্তানের সঙ্গে রাষ্ট্রিক সাযুজ্য লাভ করতে চান। কিন্তু এই অদ্ভুত মনোবৃত্তির কান্ড দেখে ব্যাপারটাকে নিতান্ত একটা কাশ্মীরী সমস্যা বলে ধারণা করা উচিত নয়। এ ধরনের স্থূল ও রূঢ় বিচ্ছেদের দাবি ভারতের অন্য কয়েকটি অঞ্চলেরও এক শ্রেণীর উদ্‌ভ্রান্তের দ্বারা আন্দোলিত হয়েছে। দ্রাবিড় কাজাখম, মাস্টার তারা সিং-এর অনুগামী অকালী আর পূর্ব প্রান্তের ফিজো-নাগা; এঁরাও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠা দাবি করতে সঙ্কোচ বোধ করেননি। সুতরাং কাশ্মীরের কিছু মুসলিমের 'স্বাধীন-কাশ্মীর' অথবা পাকভুক্তির উৎসাহ দেখে

কাশ্মীর সম্পর্কে ধারণা বিষণ্ণ করবার কোন কারণ নেই, কোন অর্থও হয় না।

কবি সার মহম্মদ ইকবাল যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন জওহরলাল নেহরু একদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। নেহরু লিখেছেন, কবি ইকবাল এই বলে আক্ষেপ করলেন যে, পাকিস্তান দাবির কোন অর্থ হয় না। কবি তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তের চিন্তাতে যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, সে সত্য লীগ-নেতৃত্বে বিভ্রান্ত ভারতীয় মুসলিম সমাজের অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেনি। কিন্তু কাশ্মীরী মুসলিম সমাজ উপলব্ধি করেছিলেন। কবি ইকবালের পূর্ব পুরুষেরা কাশ্মীরী। অনুমান করলে ভুল হবে না, কাশ্মীরী মুসলিমের মনের গভীরে কোথাও এই উপলব্ধি নিহিত আছে যে, পাকিস্তান বস্তুত একটা বিভ্রান্তিরই দাবির সৃষ্টি। যেটা কাশ্মীরী সমাজ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য, সেটা বৃহত্তর ভারতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যেরই একটি অন্তরঙ্গ অংশ। উদ্বেগের একমাত্র হেতু এই যে, কাশ্মীরী মুসলিমের এই স্বভাবজ ও ঐতিহ্যগত ভারতীয়তার বোধ আহত ও বিচলিত করবার জন্য বাইরের এক ভয়ানক অভিসন্ধি ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ধর্মগত জাতিত্ব; যে মতবাদ বর্তমান যুগে বাতিল হয়ে গিয়েছে, অচলও হয়েছে, সেই মতবাদ ব্রিটেনের রাজনীতিক ইচ্ছার একটি অপপ্রসূত সৃষ্টি। এই কপট মতবাদ পাকিস্তানের জীবনের এক করুণ অথচ হীন প্রমত্ততা হয়ে কাশ্মীরী মুসলিমের সহজ বিশ্বাসের ভিত্তি টলিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, এটা সিসিফাসের পন্ডশ্রম মাত্র। কাশ্মীর ভূখণ্ডের ঝিলমের মত আরও একটি ঝিলমের প্রবাহ কাশ্মীরবাসীর অন্তরেও আছে। এই ঝিলম যুগোচিত উপলব্ধিরই এক অন্তঃসলিলা নদী। সমাজ সংস্কৃতি ও অর্থনীতিক সম্বন্ধের বৃহত্তর ঐক্যে যে জাতীয়তা সম্বন্ধ, তারই প্রতি কাশ্মীরবাসীর আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি প্রবল না হয়ে পারে না।

কথিত আছে, মহারাজা সার গোলাব সিং-এর রাজত্বের কালে কাশ্মীরের বহু মুসলমান হিন্দু হবার জন্য আবেদন করেছিলেন। কাশ্মীর পণ্ডিতেরা অনুমোদন করেননি বলেই তাঁদের হিন্দুত্ব লাভের সেই দাবি সফল হয়নি। এই ঘটনা কিন্তু আধুনিক কালের কোন জাতির সমাজজীবনের পক্ষে কোন শিক্ষা নয়। এভাবে একজাতিক সমন্বয় সম্ভব করবার কল্পনা নিতান্ত ভ্রান্তিবিলাস। এমন ধারণাও করা উচিত নয় যে, ধর্মবোধের জীবনক্রমের মধ্যে জীবজগতের প্রকৃতির মত অ্যাটাভিজ্‌ম্ সম্ভব। পূর্ব পুরুষের ধর্ম ফিরে পাওয়ার জন্য সত্যই কোন জনসমাজ আন্তরিক আগ্রহে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, এমন ঘটনা পৃথিবীতে কোথাও কখনও সম্ভব হয়নি। জাতি ও ব্যক্তির অভিজ্ঞতার জীবনে বরং এই সত্যেরই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তার বর্তমানের ধর্মই তার আন্তরিক বিশ্বাসের মহনীয় আস্পদ। পূর্বপুরুষের ধর্মের কাছে ফিরে

যাবার জন্য তার চিন্তায় কোন অস্বস্তির তাড়না থাকে না। আর ফিরে যেতে না পারার জন্যে কোন বেদনাও থাকে না। গণ-ধর্মান্তর বস্তুত কোন না কোন অর্থনীতিক দুর্ভাগ্যের চাপ, কিংবা অত্যাচারী রাজনীতির দাপটে ক্লিষ্ট জনতার অসহায় অবস্থার কীর্তি। আধুনিককালের কাণ্ডজ্ঞানের কাছে এ ধরনের ঐক্য সম্ভব করবার কথা নিতান্ত হাস্যকর দিবাস্বপ্নের বাচালতা।

অনেকে বলেন সিনথেসিস; সংস্কৃতির এবং ধর্মেও সুষ্ঠু সমন্বয়ের কথা। ভারতীয় ঐক্যের কথা উঠলেই এই সমন্বয়ের কথাটিও বড় বেশি মুখরিত হয়ে থাকে। কিন্তু স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, সিনথেসিস ব্যাপারটা অত্যন্ত দীর্ঘকালীন একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সূক্ষ্ম কাজ। এটা আইনের সাধ্য কাজ নয়। ভারতের সাংস্কৃতিক সংগঠনের সবচেয়ে বড় সত্য এই যে, নানা ভাষা নানা মত ও নানা পরিধানের স্বচ্ছন্দ সহ-অবস্থানের জন্যই বিবিধের ম ' এক মহান্ মিলন সম্ভব হয়েছে। সিনথেসিস অনেক পরের ও দূরের সত্য। বর্তমানের দাবি সহ-অবস্থান। এই আদর্শ ভারতজীবনে একটা বাস্তব সত্য বলেই কাশ্মীর একান্তভাবে ভারতভূমিরই কাশ্মীর। আশা করা যায় কবি ইকবালের কাশ্মীরী প্রাণ যে সত্য শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করিতে পেরেছিল আজকের কাশ্মীরের আবদুল্লা-মাশদি ফারুকের প্রাণে শেষ পর্যন্ত সেই সত্যেরই উপলব্ধি সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে।

তারাই কাশ্মীরকে একটা সমস্যা বলে প্রচার করেছে যারা ধর্মকে জাতিত্বের বিশেষক বলে প্রচার করেছে। আধুনিক জগতে ব্রিটেন নামে পরিচিত দেশটির নিজের জীবনের রাজনীতিক ধ্যান-ধারণার মধ্যে ধর্মগত জাতিবাদের মত একটা ইতিহাসবিরোধী অসত্যের ও কুসংস্কারের কোন স্থ নেই। কিন্তু এহেন ব্রিটেনই পরদেশ ও পরজাতির জীবনের উপরে এই অসত্য ও কুসংস্কারের প্রয়োগ চেয়েছে। হিটলার বলেছিলেন, জাপানও আর্যদেশ। রাজনীতিক আধিপত্যবাদের অভিসন্ধি কত সহজে ইতিহাসের সত্যকে পরিহাস করতে পারে, হিটলার-প্রচারিত এই অদ্ভুত আর্যতত্ত্ব তারই একটি প্রমাণ। ব্রিটেনের সাম্রাজ্যিক স্বার্থের স্বপ্নও এ ধরনের একটি উদ্ভট তত্ত্ব সৃষ্টি করেছে, ধর্মগত জাতিবাদ। এহেন ভয়ানক মিথ্যার তত্ত্বের কাছে কাশ্মীর অবশ্যই একটা সমস্যা। এবং ব্রিটেনের ইচ্ছা ও অনুগ্রহ যার রাজনীতিক জীবনের একটি কাম্য বন্ধন, পাকিস্তান নামে পরিচিত সেই দেশের সরকারী মন-প্রাণের কাছে কাশ্মীর অবশ্যই একটি সমস্যা। কিন্তু কাশ্ম বাসীর কাছে ও ভারতের কাছে কাশ্মীর কোন সমস্যাই নয়।

বিখ্যাত মোগল, বাবর বাদশাহের কাছে কাশ্মীর-মদিরা খুবই প্রিয় ছিল। কাশ্মীরকে একটা সমস্যা বলে প্রচার করে পশ্চিমের কয়েকটি রাষ্ট্র যে ধরনের মত্ততা প্রকাশ করেছে ও করে চলেছে, তাতে মনে হতে পারে, আধুনিক

কাশ্মীরই তাদের রাজনীতিক উপভোগ্যের এক চমৎকার মদিরা। ওই মত্ততা বস্তুত একটি রাজনীতিক স্বার্থেরই নেশার কান্ড।

কিন্তু কারও রাজনীতিক স্বার্থবোধ নেশাগ্রস্ত হলেই কাশ্মীর একটা সমস্যা হয়ে যায় না, হয়ে যায়নি, যাবেও না। কাশ্মীরের ভিতরের কোন কোন দল ও ব্যক্তির কণ্ঠে গণভোটের দাবি অথবা পাক-প্রীতি প্রচারিত হয়েছে বটে; কিন্তু সেটাই কাশ্মীরী জীবনের আসল সত্য নয়। এবং এই কারণে কাশ্মরীকে একটা সমস্যা বলে মনে করা চলে না। একজন শেখ আবদুল্লার ইচ্ছা ও চিন্তার রকম-সকম দেখে কোন ঐক্যনিষ্ঠ ভারতীয়ের পক্ষে এমন ধারণা করা উচিত নয় যে, রাষ্ট্রিক বিচ্ছেদ শুধু একজন কাশ্মীরী মুসলিমের আগ্রহের বিষয় হিসাবে সম্ভব হতে পারে। ঘটনার শিক্ষা এই যে, এমন শোচনীয় দাবি একজন হিন্দু ভারতীয়েরও আগ্রহের বিষয় হতে পারে, এবং হয়েছেও। আজকের ভারতের সি পি রামস্বামী আয়ার জাতীয় সংহতির একজন শ্রেষ্ঠ সমর্থক ও প্রচারক। কিন্তু একদিন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যকে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য বলে দাবি করে তিনি জিন্না ও সাভারকর উভয়েরই প্রশস্তির টেলিগ্রামের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিলেন। বুঝতে অসুবিধে নেই, ধর্মগত জাতিবাদ ভারতকে বহুভাবে খণ্ডিত করে সুখী হতে চেয়েছে, আজিও চায়। কিন্তু এই ভয়ানক কুসংস্কারের অভিভাবক ব্রিটিশরাজ আজ ভারতের অভিভাবক নয়; সুতরাং কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করবার ইচ্ছায় আপ্রাণ ব্যাকুল ও ব্যস্ত হয়ে উঠলেও ব্রিটিশের কিংবা অন্য কোন রাষ্ট্র-সরকারের কোন প্রচন্ড কেরামতির পক্ষেও সেটা সম্ভব হবে না। বরং কালক্রমে দেখা যাবে যে, আবদুল্লা, মাশদি ও ফারুকেরাই তাঁদের ভারতীয়তার গৌরব ও সার্থকতা উপলব্ধি করে সুখী হয়েছেন। কাশ্মীরবাসীর জীবনের আগ্রহের কাছে ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রগতিশীল আবেদনও এক অলক্ষ্য ঝিলমের প্রবাহ। ভারতেরই সেই বিতস্তা আজকের এই ঝিলম।

মুখোমুখি

অনুপ্রবেশ

স্থান : দিল্লি এবং করাচি। কাল : জুন মাসের শেষ দিনের মধ্যহ্ন। দৃশ্য : ভারত-পাকিস্তানের পক্ষে দুই দেশের প্রতিনিধিরা একই সময়ে কচ্ছ চুক্তিতে স্বাক্ষর করছেন। চুক্তির ভূমিকায় উভয়পক্ষের মিলিত প্রত্যাশা : "ইহা সমগ্র পাক--ভারত সীমান্ত বরাবর বর্তমানের **উত্তেজনা হ্রাস করিতে** সহায়তা করিবে"...

ঠিক সেই একই তারিখে তাকান পাকিস্তানের দিকে। স্থান : হানাদারীর ট্রেনিং দেওয়ার জন্য স্থাপিত মুরি হেড কোয়ারটার। দৃশ্য : গেরিলা যুদ্ধের ছ' সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণের চতুর্থ সপ্তাহে ৫২৮০ জনকে নিয়ে গঠিত আটটি জিবরালটার বাহিনীর অবিরাম ট্রেনিং চলেছে। মধ্যে মাত্র ১ মাস সময়। তারপরই ছদ্মবেশে কাশ্মীরে **ঝাঁপিয়ে পড়ার** পরিকল্পিত মুহূর্ত।

দুটি পরস্পরবিরোধী দৃশ্যের অদ্ভুত বৈপরীত্যকে অনেকাংশেই নাটকীয় মনে হবে। কিন্তু রাজনীতির জগতে সত্য ঘটনা যে চমৎকারিত্বের গুণে প্রায়শই কল্পনাকে টেক্কা দেয়, পাকিস্তানের এই দুমুখো চালই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শান্তির নামে এই রকম পাক-চালিয়াতির দৃষ্টান্ত এই একটি নয়। বস্তুত, পাকিস্তান তার জন্মের পর থেকে বিগত ১৮ বছরে যতবারই শান্তির টেবিলে বসেছে, ততবারই এক হাতে চুক্তি স্বাক্ষর করার সংগে সংগে অন্য হাতে সে অশান্তির আগুনটা আর একটু উস্কে দিয়েছে।

পাকিস্তানে ভাড়াটে প্রচারবিদরা সাম্প্রতিক যুদ্ধের যে ভাষ্যই দিক না, ভারতবর্ষ যে যুদ্ধ চায়নি, ইতিহাস তার একমাত্র সাক্ষী। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর থেকে ভারতবর্ষ সব দিক দিয়ে শান্তির পথেই নিজের সমস্ত প্রয়াসকে নিযুক্ত করেছে। বিশেষ করে প্রতিবেশী পাকিস্তানের সংগে সর্বদাই পরিপূর্ণ

সম্প্রীতি বজায় রেখে চলতে ভারত বার বার চেষ্টা করেছে। কিন্তু দীর্ঘ আঠার বছরের সর্বাত্মক সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে পাকিস্তান যখন ভারতের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে, ভারত তখন দৃঢ়তার সঙ্গে সেই চ্যালেন্‌জ গ্রহণ করেছে এবং পাকিস্তানকে তার প্রাপ্য জবাব দিয়েছে।

কিন্তু পাকিস্তান হয়ত যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ করেনি। ইতিহাসে সেই সব মদগর্বী খলনায়কদের চরিত্র নিয়ে অধ্যায়ের পর অধ্যায় রচিত হয়েছে, যারা সময় থাকতে সতর্ক হবার শিক্ষা নেয়নি কিন্তু পরিণামে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

সারা পৃথিবীর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পর্যবেক্ষকরা দীর্ঘকাল ধরে এই আশংকা করছিলেন যে পাকিস্তান ক্রমে ক্রমে ভারতের সঙ্গে এক সশস্ত্র সংঘর্ষকে অনিবার্য করে তুলছে। ১৯৫৪ সালের পর থেকে সকল নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের মনে এই অনুমান আরও বদ্ধমূল হয়ে উঠল, যখন ভারতের সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে আমেরিকা পাকিস্তানকে পুরো মাত্রায় সশস্ত্র করতে শুরু করল। পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যে সিয়াটো এবং সেনটো আঁতাতের দৌলতে পাকিস্তান আমেরিকার কাছ থেকে প্রায় ১·২ বিলিয়ন ডলারের সামরিক সাহায্য লাভ করেছে। এর জন্য পাকিস্তানকে একটি পয়সাও ব্যয় করতে হয়নি।

অতীত ঘটনার দলিলই সমগ্র বিশ্বের কাছে সেই ইতিবৃত্ত তুলে ধরার পক্ষে যথেষ্ট, যাতে দেখা যাবে কিভাবে ১৯৪৭ সাল থেকে হাজার রকমের প্ররোচনা সত্ত্বেও ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক শক্তি পরীক্ষার পথে পা বাড়ায়নি। প্রকৃতপক্ষে এমন একটা সময় এসেছিল, যখন স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নির্ধারিত নীতিকে ক্ষমতাসীন দলের এবং ভারতের জনসাধারণের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তিরক্ষার চেষ্টায় ভারতের সহিষ্ণুতার মাত্রা এত বেশি বেড়ে গিয়েছিল যে কচ্ছ চুক্তির পর ভারতের নীতিকে পাক-তোয়াজের অভিযোগে ধিক্কৃত হতে হয়েছে।

কিন্তু এই সহিষ্ণুতা যে দুর্বলতা নয়, ২২ দিনের যুদ্ধে নিজেদের মাটির উপর খয়রাতি অস্ত্রের মর্মান্তিক ধ্বংস প্রত্যক্ষ করে পলায়নপর পাকিস্তানকে তা উপলব্ধি করতে হয়েছে।

কাশ্মীরে পাকিস্তানের অনুপ্রবেশ এবং যুদ্ধের ভূমিকা যে এপ্রিল মাসে কচ্ছের মরু অঞ্চলেই প্রথম রচিত হয়েছিল, ঘটনার গতিপ্রকৃতি থেকে সে কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। আমেরিকার সাপ্তাহিক পত্রিকা টাইমের বিগত ১ অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত একটি চিঠিতে মার্কিন বিমান বাহিনীর লেঃ-কর্ণেল বার্ণার্ড ই অ্যান্ডারসন লিখেছিলেন "...এপ্রিলে আমি পাকিস্তান থেকে ফিরে আসি। তখনই আমরা সবাই জানতাম যে এই সংঘর্ষ আসন্ন :

পাকিস্তানীরা তাদের স্থলভাগের সাজসরঞ্জামের হলদে রঙের উপর সামরিক-সুলভ ধূসর রঙের প্রলেপ দিচ্ছিল, তাদের বিমান ইত্যাদির জন্য রিভেটমেণ্ট তৈরী করছিল...”

কচ্ছের সংঘর্ষে ভারত এক সীমাবদ্ধ অঞ্চলে নিছক আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালিয়ে গেছে, যদিও সেই সময়ে প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এই ইংগিত দিয়েছিলেন যে ভারত এমন কোনো অঞ্চলে যুদ্ধকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হতে পারে, যা পাকিস্তানের পছন্দমাফিক না-ও হতে পারে।

কিন্তু কাশ্মীরে দ্বিতীয় বৃহত্তর অভিযানের জন্য পাকিস্তান তখনও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারেনি। জিব্রালটার বাহিনীর ট্রেনিং-এর পরিকল্পনা কচ্ছ সংঘর্ষের সময় বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। তার জন্য দরকার হল আরও সময়ের। শান্তিচুক্তির আড়াল নিয়ে পাকিস্তান সেই সময়টুকু সংগ্রহ করল।

পরবর্তী একমাস চলল চূড়ান্ত মুহূর্তের দ্রুত প্রস্তুতি। আক্রমণ-পরিকল্পনার সামরিক খসড়া তৈরী হল। বলতেই হবে, বেহস্তের স্বপ্নে মশগুল অবস্থায় যে খসড়া তৈরী হল, তা একটু বেশিরকম উচ্চাশাবাদী হয়ে পড়েছিল!

পাকিস্তানীদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে হস্তগত কবা কাগজপত্রে এই সব আশাবাদী পরিকল্পনার এক বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়। ৭ সেপটেমবর তারিখে জামনগরে ভূপাতিত একটি ক্যানবেরা বিমানের পাইলটের ডায়রীতে ২০ এপ্রিল তারিখের পাতায় জামনগর, আদমপুর, হালওয়ারা, আমবালা, পালাম, আগ্রা এবং ভূজের ভারতীয় বিমানক্ষেত্রের উপর আক্রমণের ট্রেনিং গ্রহণের বিস্তৃত পরিকল্পনার বিবরণ পাওয়া যায়। তাছাড়া পাক প্রেসিডেণ্টের ১১ জুন তারিখের এক অর্ডিন্যান্সবলে মুজাহিদের একটি নিয়মিত দলকে তৈরী করে রাখা হয়েছিল। হাজিপীর গিরিবর্ত্মের নিচে কাহুটার একটি স্কুল থেকে যে কাগজপত্র ভারতীয় জওয়ানরা হস্তগত করেন, তাতে ১৫ জুন তারিখের একটি আদেশনামায় ১৫ বছরের ঊর্দ্ধবয়স্ক সমস্ত ছাত্রকে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা দেবার হুকুম জারী করা হয়েছে। ঐ একই এলাকা থেকে পাওয়া আরেকটি আদেশনামায় পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের সমস্ত কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন লোকেদের নাম রেজিস্ট্রী করতে বলা হয়েছে। জুন মাসে ঘোষিত আরও দুটি অর্ডিন্যান্সের দ্বারা বিমান বাহিনীর রিজার্ভ সৈন্যদলকে তলব করা হয়েছে এবং তলব করা মাত্রই মিলিটারীর অন্যান্য রিজার্ভ সৈন্যদের সরকারী কাজে ছেড়ে দেওয়াটা নিয়োগকর্তার পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বন্দী অনুপ্রবেশকারীদের জেরা করে জানা গেছে যে, ১৯৬৫ সালের ২৬ মে তারিখ থেকে দ্বাদশ ডিভিসানের জি ও সি মেজর জেনারেল আখতার হুসেন মালিকের নেতৃত্বে মুরিতে হেড কোয়ারটার স্থাপন করে অনুপ্রবেশকারীদের ট্রেনিং শুরু করা হয়েছিল। এই তথাকথিত "জিব্রালটার বাহিনী"র জন্য চারটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র খোলা হয়েছিল। মোটমাট আটটি বাহিনী গঠন করা হয়েছিল—প্রত্যেকটি বাহিনীতে কোমপানিপ্রতি ১১০ জন লোকের ৬টি করে কোমপানি ছিল। কোমপানিগুলি পাকিস্তানের নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর মেজর বা ক্যাপটেন পদের অফিসারদের পরিচালনাধীনে রাখা হয়েছিল। ৬ সপ্তাহের অবিরাম ট্রেনিং-এর পর অনুপ্রবেশকারীরা আক্রমণের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছিল। জুলাই-এর দ্বিতীয় সপ্তাহে সবকটি বাহিনীর কম্যানডাররা মুরিতে মিলিত হয়েছিলেন এবং প্রেসিডেন্ট আয়ুব সেই সমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন।

যদিও সেই মাসেরই শেষদিকে অনুপ্রবেশকারীদের দু-একটি ছোটখাট দল অগ্রিম পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিরতি সীমারেখা অতিক্রম করে, তবু আসল অভিযান শুরু হয় আরও কয়েকদিন পরে। ১ আগষ্ট তারিখে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের কোটলিতে মেজর জেনারেল আখতার হুসেন মালিক সবকটি কোমপানির কম্যানডারের সঙ্গে মিলিত হন। খুব সম্ভব সেইদিনই অনুপ্রবেশ-অভিযান শুরু হয়। সুউচ্চ পার্বত্যপথ এবং ঘন বনের মাঝখান দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে যুদ্ধবিরতি রেখার বেশ কয়েকটি জায়গা ভেদ করে অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকে পড়ে। জম্মু-কাশ্মীরে পাকিস্তানের দ্বিতীয় অভিযানেব এই হল শুরু।

৪ আগষ্ট তারিখ সন্ধ্যার দিকে মহম্মদ দীন নামে একজন তরুণ উরি-পুনচ খণ্ডের পূর্বে গুলমার্গের উপর দারাকাসিতে গরু চরাচ্ছিল, এমন সময় সবুজ সালোয়ার-কামিজ পরা দুজন হানাদার তার সামনে এসে উপস্থিত হয়। হানাদাররা তাকে তাদের ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে যায়, সেখানে তাদের দলপতি পথপ্রদর্শক ও সংবাদদাতা হিসেবে মহম্মদ দীনের সাহায্য চায়। তাকে ৪০০টি টাকা দেওয়া হয় এবং বলা হয় ভারতীয় পক্ষের গ্রেন স্টোর, ট্রানস্পোর্ট ডিপো ইত্যাদির ঠিক ঠিক অবস্থান জেনে নিয়ে তাদেরকে তা জানাতে হবে। কিন্তু হঠাৎ এতগুলি সশস্ত্র বহিরাগতকে দেখে মহম্মদ দীনের মনে সন্দেহ দেখা দেয় এবং সে তাড়াতাড়ি তানমার্গের থানায় এসে সমস্ত ঘটনা জানায়। সেইদিনই, সন্ধ্যায় প্রায় ৫০ মাইল দক্ষিণ দিকে মেনধর খণ্ডে গালুথির কাছাকাছি জঙ্গলে একইভাবে ভাজির মহম্মদের সঙ্গেও একদল হানাদারের দেখা হয় এবং সে-ও সঙ্গে সঙ্গে খবরটা নিকটবর্তী মিলিটারী কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর টহলদার দলগুলিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। শ্রীনগরেও খবর চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে হানাদারদের খোঁজাখুঁজি শুরু হয়।

ঘটনা এগোতে থাকে দ্রুত বেগে। সেইদিনই রাত্রে ভারতীয় বাহিনী বিভিন্ন

স্থানে হানাদারদের সম্মুখীন হয়। হঠাৎ এইভাবে সব কিছু ফাঁস হয়ে যাবার জন্য হানাদাররা প্রস্তুত ছিল না। অতর্কিত প্রতিরোধের মুখে দাঁড়িয়ে তারা যদিও হকচকিয়ে গেল, তবু পিছনে না হটে তারা সংঘর্ষের পথই বেছে নিল। একটার পর একটা সংঘর্ষ চলতে লাগল। তার মধ্যে অনেকগুলির বিবরণ রাষ্ট্র-পুঞ্জের মুখ্য পরিদর্শক জেনারেল নিমোর রিপোরটে উল্লেখ করা হল। রিপোরটে একথা স্পষ্টভাবেই বলা হল যে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নিয়মিত এবং শিক্ষিত গেরিলাবাহিনী পাকিস্তানের অরডন্যানস ফ্যাকটরীর তৈরী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রীতিমতো শক্তি নিয়ে ব্যাপকভাবে যুদ্ধবিরতি সীমা অতিক্রম করেছিল। বারমুলা খণ্ডের ৭-৮ আগস্টের ঘটনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে জেনারেল নিমো জানান যে, "পর্যবেক্ষকগণ একজন বন্দী হানাদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে সে জানায় যে, সে ১৬শ আজাদ কাশ্মীর পদাতিক ব্যাটেলিয়নের একজন সৈনিক এবং ৩০০ জন সৈন্য ও ১০০ জন মুজাহিদ নিয়ে তার হানাদারীদলটি গঠিত।" পুনচ খণ্ডের ৭-৮ তারিখের ঘটনা সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষকরা অধিকাংশ সংঘর্ষের বিবরণকে সমর্থন করেন। সংখ্যায় হানাদাররা ১০০০-এরও বেশি ছিল। "প্রাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণে অনুমান করা যায় যে কিছু সংখ্যক হানাদার নিশ্চয়ই যুদ্ধবিরতি সীমা অতিক্রম করে এসেছিল।" অতএব রাষ্ট্রপুঞ্জ পাকিস্তানকে অপরাধী সাব্যস্ত করলেন।

অনুপ্রবেশের অভিযান কিন্তু স্তিমিত হয়ে পড়ল। এর কারণ স্থানীয় জনসাধারণের দিক থেকে হানাদাররা কোনো সহায়তাই লাভ করতে পারল না। কাশ্মীরী জনসাধারণ যে ভারতের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে এবং সামান্য একটু অগ্নিস্ফুলিঙ্গই যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুলবে এ ধারণা কার্যক্ষেত্রে আকাশকুসুম বলে প্রতিপন্ন হল।

পাকিস্তানের সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য ছিল ১ আগষ্ট থেকে ৫ আগষ্টের মধ্যে ছোট ছোট দলে অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে দিয়ে বিভিন্ন নির্ধারিত স্থানে তাদের মোতায়েন করা এবং তারপর উপত্যকার মধ্যে অগ্রসর হয়ে জম্মু-শ্রীনগর সড়কটিকে বিচ্ছিন্ন করা। প্রতি বছর ৮ আগষ্ট স্থানীয় সাধু পীর সাহেবের উৎসবে যোগ দেবার জন্য কাশ্মীর উপত্যকার বাসিন্দারা দলে দলে শ্রীনগরে উপস্থিত হয়। হানাদাররা আশা করেছিল যে মেলার এই যাত্রীদের ভিড়ে গা ঢাকা দিয়ে তারা শ্রীনগরে ঢুকে পড়বে। ৯ আগষ্ট তারিখে শেখ আবদুল্লার প্রথম গ্রেফতারের স্মরণ দিবস হিসবে অ্যাকসন কমিটি এবং গণভোট ফ্রন্ট সেই দিন রাজধানীতে এক বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করেছিল। হানাদারদের লক্ষ্য ছিল পুরোপুরি সশস্ত্র অবস্থায় এই মিছিলে যোগ দিয়ে এক হিংসাত্মক "বিদ্রোহ" বাধিয়ে তুলে রেডিও ষ্টেশন, বিমানক্ষেত্র এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করার। ইতিমধ্যে হানাদারদের আরও কয়েকটি দলের

কাজ ছিল, জম্মু-শ্রীনগর বড় রাস্তা এবং শ্রীনগর-কারগিল রাস্তাটি কেটে দিয়ে কাশ্মীর উপত্যকাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা, যাতে ভারতীয় বাহিনী উপত্যকায় প্রবেশ করতে না পারে। সমগ্র উপত্যকাটিকে এইভাবে হানাদারীর কবলে এনে অ্যাকসন কমিটি ও গণভোট ফ্রণ্টের মাথাভারী কয়েকজন সদস্যকে দলে নিয়ে "বিপ্লবী পরিষদ" গঠন করে তাকে জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে এক বিধিসম্মত সরকার বলে ঘোষণা করা এবং সমস্ত দেশের কাছে বিশেষতঃ পাকিস্তানের কাছে স্বীকৃতির জন্য আবেদন প্রচার করা। বন্ধু "সরকারের" ডাকে যুদ্ধবিরতি সীমা লঙ্ঘন করার ব্যাপারে পাকিস্তান এই সুযোগ গ্রহণ করত।

৯ আগষ্ট তারিখে রেডিও শ্রীনগর থেকে প্রচার করার উদ্দেশ্যে "কাশ্মীরের বিপ্লবী পরিষদ" কর্তৃক "মুক্তি যুদ্ধের" যে ঘোষণা রচিত হয়েছিল, তা এক মূল্যবান দলিল। তাতে "বীর কাশ্মীরীদের" উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে তাদের "জেগে উঠতে" বলা হয়েছিল, কেননা জেগে উঠবার "এই হচ্ছে প্রকৃষ্ট সময়"। ঘোষণা করা হয়েছিল যে "আজ থেকে একদল দেশপ্রেমিকের দ্বারা গঠিত বিপ্লবী পরিষদ জম্মু ও কাশ্মীরের জাতীয় সরকার" গঠন করেছে। এই সরকার সাম্রাজ্যবাদী ভারত ও কাশ্মীর সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত সকল সন্ধি ও চুক্তিকে বাতিল বলে ঘোষণা করছে। ঘোষণায় সারা বিশ্বের কাছে "এই মুক্তি সংগ্রাম"কে সমর্থন করার জন্য আবেদন জানানো হোল এবং পাকিস্তানের জনগণের সম্পর্কে বলা হল যে "আমাদের জীবন ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে তাদের প্রয়াস যুক্ত করার এই হল সময়।"

কিন্তু এত সব তোড়জোড়ের পরও অভিযান ব্যর্থ হল। বিভিন্ন ভাবে অনুপ্রবেশকারীদের কয়েকটি দল উপত্যকার মধ্যে ঢুকে পড়ল কিন্তু উল্লেখ-যোগ্য ভাবে কোনো ক্ষতি করতে পারল না। ৯ আগষ্ট তারিখের অগ্নিগর্ভ দিনটি শ্রীনগরে শান্তভাবেই অতিবাহিত হল। ৪৭ সালের পর এই দ্বিতীয় বার জম্মু-কাশ্মীরের শান্তিপ্রিয় মানুষ পাকিস্তানের পয়গম্বরদের হাতে "মুক্তি"র আস্বাদ নিতে রাজি হল না। অগত্যা মুজফ্ফরাবাদের প্রায় ছ মাইল দূরে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের খাড়িতেই পাকিস্তানকে তথাকথিত সদর-ই-কাশ্মীর রেডিও নামে এক রিলে স্টেশন স্থাপন করতে হল। তারপর থেকে শুরু হল "মুক্তি যোদ্ধা"দের সম্পর্কে মুহুর্মুহু এলোপাথাড়ী প্রচার—ঘণ্টায় ঘণ্টায় বর্ণনা চলতে লাগল পরিস্থিতির- না, যা ঘটছিল তার হৃদয়বিদারক বর্ণনা নয়, যা ঘটেনি কিন্তু ঘটলে ভাল হত তারই রঙচঙে গাঁজাখুরি প্রচার। কিন্তু হায়, কাঁঠালটি শেষ পর্যন্ত পাকল না, অর্থাৎ রাওয়ালপিণ্ডিকে শ্রীনগরের তক্তে বসানো সম্ভব হল না—তথাকথিত মুক্তিদাতা মহামানবদের গোঁফে তেল মালিশই সার হল।

অনুপ্রবেশ

৯ আগষ্ট তারিখের মধ্যে পাকিস্তানী দুরাশাবাদীদের কাছে এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে গেল যে কাশ্মীরে তাঁদের সাধের বিদ্রোহ উপত্যকার মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে। মরীয়া হয়ে পাকিস্তান আরও কয়েকশত অনুপ্রবেশকারীকে সীমারেখার এপারে ঠেলে দিল। কিন্তু তাতেও আশার আলো দেখা গেল না। তখন নিয়মিত সৈন্যদলকে ঝাঁপিয়ে পড়তে আদেশ দেওয়া ছাড়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আর কোনো সহজ পথ রইল না। শুরু হল আর এক অধ্যায়—পাক-ভারত যুদ্ধের প্রাথমিক নান্দীপাঠ!

১০ আগষ্ট তারিখে কারগিল খন্ডে দুটি সেতু এবং একটি প্রহরাঘাটির উপর "সশস্ত্র হানাদাররা" দলে দলে আক্রমণ চালাতে লাগল। একজন হানাদার ভারতীয় প্রহরীদলের হাতে নিহত হল এবং দেখা গেল তার পরনের পোষাক পাকিস্তানের সীমান্ত স্কাউটদলের পোষাকের মতই।

১৪ আগষ্ট তারিখে জেনারেল নিমো তাঁর রিপোরটে বললেন পাকিস্তানের দিক থেকে সশস্ত্র ব্যক্তিগণ ছাম্ব এলাকায় যুদ্ধবিরতি সীমারেখা অতিক্রম করে ভারতীয় অঞ্চলের ১ মাইল ভেতরে ঢুকে পড়েছে বলে "অভিযোগ" পাওয়া গেছে। এই অভিযোগের সমর্থনে আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল ১৫-১৬ আগষ্ট। নিমোর রিপোর্ট বলল, "১৫-১৬ আগষ্ট তারিখে যুদ্ধবিরতি সীমারেখাবরাবর ভারতীয় ঘাটিগুলিকে প্রবলভাবে কামান ও মরটারের গুলি-বর্ষণের সম্মুখীন হতে হয়। ১৬-১৭ আগষ্ট আক্রমণকারীরা ৯টি ভারতীয় ঘাটি দখল করে।" (পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে এগুলি পুনরুদ্ধার করা হয়)।

১৭ আগষ্ট তারিখের আক্রমণ সম্পর্কে ভারতীয় পক্ষের এক ইসতাহারে এই ঘটনাকে "পুরো ব্যাটেলিয়ানের শক্তি নিয়ে মারাত্মক আক্রমণ" বলে অভিহিত করা হল।

বলাবাহুল্য পাকিস্তানের নিয়মিত সেনাবাহিনী ইতিমধ্যেই আসরে নেমে পড়েছিল। ২৪ সেপটেমবর তারিখে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেনারেল চৌধুরী ঐ ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, পাকিস্তানের সেই কাজকে "এক বিরাট আক্রমণ" বলা চলে, যাতে তারা শিয়ালকোট থেকে সৈন্য পাঠিয়েছিল। তিনি বলেন যে রাষ্ট্রপুঞ্জের এক পর্যবেক্ষক তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, সীমারেখা বরাবর ভারতীয় ঘাটিগুলির উপর যে পরিমাণ সামরিক শক্তি নিয়ে পাকিস্তান আক্রমণ চালিয়েছিল, তা দেখে তিনি (পর্যবেক্ষক) বিমূঢ় হয়েছিলেন।

ছাম্ব এলাকায় পাকিস্তানের নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর এই ব্যাপক ও অবিরাম আক্রমণ এবং কারগিলে তার পূর্ববর্তী আক্রমণ পাক-ভারত সংঘর্ষের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, কেননা, এর দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, পাকিস্তানই প্রথম যুদ্ধবিরতি সীমা লঙ্ঘন করে তার সৈন্যবাহিনীকে লেলিয়ে দেয়। তাছাড়া পাকিস্তান এবং তার পশ্চিমী স্যাঙাতরা যে প্রচার চালিয়েছিলেন এই বলে যে,

যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করে কারগিল, টিথোয়াল এবং উরি-পুন্চ এলাকায় ভারতের পৌনঃপুনিক আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের ফলেই আয়ুব খান বাধ্য হয়ে ১ সেপটেমবর তারিখে ছাম্বে পালটা মারের ব্যবস্থা করেন—তার অসত্যতাও শুধু ভারতের চোখে নয়, রাষ্ট্রপুঞ্জের চোখেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

১৫ আগষ্ট তারিখে পাকিস্তানী সৈন্যরা আন্তর্জাতিক সীমারেখা অতিক্রম করে এবং নিমোর কথা অনুযায়ী "পাক-জম্মু সীমানার ভারতীয় এলাকার ৫ মাইল ভেতরের রাজপুর গ্রাম আক্রমণ করে।" অর্থাৎ পাকিস্তান খাস-পাকিস্তান থেকে আন্তর্জাতিক সীমারেখা লঙ্ঘন করল।

ইতিমধ্যে হানাদাররা জম্মুতে কয়েকটি ক্ষেত্রে সুবিধা করে উঠতে পারলেও, সব মিলিয়ে ক্রমেই তাদের বিরূপ পরিবেশের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। হানাদারদের মধ্যে কিছু লোক শ্রীনগরের কয়েক মাইল ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং ১৪ আগষ্ট রাত্রে শহরতলীর বাটমালুতে অগ্নি-সংযোগ করে। পাক বেতারও প্রথমে এই বীরত্ব কাহিনী সগৌরবে প্রচার করল কিন্তু পরে যখন বোঝা গেল তাদের এই কাজের ফলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে তখন অগ্নিসংযোগের সমস্ত দায় ভারতীয়দের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে উলটো গাওনা গাইতে লাগল। হানাদাররা জম্মুর মান্দিচ এবং মান্দিথানা অধিকার করে কয়েকদিন সেই ঘাটি আগলে বইল। কিন্তু ১২ আগষ্ট তারিখে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী সেখান থেকে তাদের হঠিয়ে দিয়ে প্রথমে মান্দি এবং পরে মান্দিথানা পুনর্দখল করল। হানাদাররা ভারতীয় এলাকার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসে রিয়াসি জেলার বুদিল এবং গুলাবগড়ে জমায়েত হল কিন্তু ভারতীয় বাহিনী তাদের গতিরোধ করল। ফলে তারা পূর্বপরিকল্পনামত জম্মু-শ্রীনগর সড়কের রামবানে পৌছতে পারল না।

কিন্তু পাকিস্তানের নিয়মিত বাহিনী এখানে সেখানে যুদ্ধ-বিরতি সীমা-রেখা অতিক্রম করে ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগল। ১৬ আগষ্ট কোরাণ-খণ্ডে প্রায় ৩০০ জন শত্রু সৈন্য ভারতীয় ঘাটি আক্রমণ করল। ঠিক তার পর-পরই উরিখণ্ডে (১৬ আগষ্ট) ছাম্ব খণ্ডে (১৭-১৮ আগষ্ট) এবং মেনধর খণ্ডে (২১, ২২, ২৩ ও ২৬ আগষ্ট) প্রচণ্ড আক্রমণ চলল। কিন্তু সবকটি আক্রমণেরই যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়ে সেগুলি ব্যর্থ করে দেওয়া হল।

ক্রমে ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, হানাদারদের পক্ষে কাশ্মীরে টিকে থাকাই দায় হয়ে উঠল। খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্রের অভাব যখন তাদের অনিবার্য মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে লাগল, তখন তারা দলে দলে যুদ্ধবিরতি সীমা ডিঙিয়ে পিছু হটতে শুরু করল।

যদিও হানাদাররা তখন পলায়নপর, তবু একথা খুব স্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, যে পথ দিয়ে হানাদাররা এবং তাদের খাদ্য সরবরাহ এসে পৌছয়,

সেগুলি বন্ধ করে না দেওয়া পর্যন্ত নতুন হানাদারীর আশংকা নির্মূল হবে না। সেইজন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর কয়েকটি ইউনিট ২৪ আগস্ট তারিখে টিথওয়াল খণ্ডে যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা অতিক্রম করল। পরদিন তারা গুরুত্ব-পূর্ণ পীর সাহিবা ঘাঁটি সহ তিনটি ঘাটি দখল করে নিল। পরবর্তী কয়েক দিনের মধ্যে ভারতীয় সেনাদল নিজেদের অবস্থা আরও দৃঢ় করল এবং কিষেণ-গঙ্গা নদী পর্যন্ত এগিয়ে গেল। ১১ সেপটেমবর তারিখে পাকিস্তানীরা মীরপুর সেতুটি উড়িয়ে দিল। ইতিমধ্যে ভারতীয় সেনাবা পাক অনুপ্রবেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় পথ মুজাফরাবাদ-কেল সড়কটি নিজেদের অধিকারে এনে ফেলল।

হাজি পীর গিরিবর্ত্ম এবং উরি-পুন্চ পৃষ্ঠের মধ্যে পাকিস্তানের অনু-প্রবেশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পথ ছিল। ২৭ আগষ্ট তারিখে এই প্রবেশ-পথটিরও মুখ বন্ধ করে দেওয়া হল। ভারতীয় ইউনিটগুলি পর্বতসংকুল দুর্গম স্থানের উপর দিয়ে এগিয়ে চলল। একটি উল্লেখযোগ্য স্থান বিদোর ভারতীয় বাহিনীর করতলগত হল, তারপর তারা উরির সম্মুখস্থ শত্রুর প্রতিরোধ-ব্যূহকে ঘিরে ফেলল। ভারতীয় বাহিনীর আরেকটি বাহু হাজি পীরের দিকে এগিয়ে চলল, কারণ চূড়ান্ত জয়লাভ করতে হলে তখনও ৩টি পার্বত্য ঘাটি দখল করার দরকার। তারপর শুরু হল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে রাত্রির অন্ধকারে নালার গা বেয়ে ৪০০০ ফুট উঁচু গিরিবর্ত্মে আরোহণের অভিযান। শুরু হল যুগপৎ শত্রুর উপর আঘাত এবং গিরিবর্ত্মের উপর হানা। ভারতের তেরঙা ঝান্ডা ২৮ আগষ্ট হাজি পীরে প্রোথিত হল। পরদিন একটা প্রবল পালটা আক্রমণ প্রতিহত করা হল। পুন্চ থেকে আগত ভারতীয় হিনীর আরেকটি বাহু ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে উরি বাহুর সঙ্গে এসে মিলিত হল। উরি-পুন্চ যোগাযোগ সম্পূর্ণ হল। এই সাফল্য সত্যিই চমকপ্রদ।

একটার পর একটা ব্যর্থতা পাকিস্তানকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলল। ২৯ আগষ্ট তারিখে মেজর জেনারেল আখতার হুসেন মালিক খিলজি বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার ফজল রহিমের কাছে এক গোপন বার্তা পাঠালেন। তাতে বলা হল ভারতীয় বাহিনীকে পেছন দিক থেকে একটা বড় রকমের তাড়া দিলে তারা সরে পড়তে বাধ্য হবে। সুতরাং খিলজি বাহিনী কে এই কাজে এগোতে হবে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে এই অন্তিম চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেল। অভিযান শুরু হবার আগেই গোপন ফরমানটি ভা. ীয় বাহিনীর হস্তগত হল।

ইতিমধ্যে হানাদাররা তাদের কব্জির জোর বুঝতে পেরেছে। মাসের পর মাস ধরে কাশ্মীর আক্রমণের যতকিছু প্রস্তুতি তৈরী হয়েছিল, তা ভারতীয় বাহিনীর গোলার মুখে এমন করে গুঁড়িয়ে যাবে, তা রাওয়ালপিণ্ডির কর্ত্তারা ভাবতেই পারেননি। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানের সমস্ত চক্রান্ত ততদিনে

জেনারেল নিমোর রিপোরটে লিপিবন্ধ হয়ে গেছে। নিমোর রিপোরট যদি যথা সময়ে প্রকাশ করা হত তাহলে পাকিস্তান আক্রমণের দ্বিতীয় ধাপে পা দিতে হয়তো সাহস পেত না। কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জের পাকদরদী পশ্চিমী মুরুব্বিদের সহায়তায় রিপোরট প্রকাশ বিলম্বিত হল। অথচ শান্তির যে মায়ামৃগটির পেছনে ছুটতে গিয়ে পশ্চিমী শক্তিরা এই পাক তোয়াজের পথ বেছে নিলেন, তা-ই শেষ পর্যন্ত পাক-ভারত সংঘর্ষকে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পথ বেছে নিতে বাধ্য করল।

বাইশ দিনের যুদ্ধ

বাইরে থেকে ছদ্মবেশী সৈন্য পাঠিয়ে কাশ্মীরকে গিলতে চেয়েছিল পাকিস্তান। সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় তার মুখোশটা একেবারে পুরোপুরি খসে পড়ল। প্রকাশ্যেই এবারে বিরাট আক্রমণ চালাল সে।

১লা সেপ্টেম্বর-৮ই সেপ্টেম্বর

সেপ্টেম্বরের পয়লা তারিখে, ভোর চারটেয়, কাশ্মীরের ছাম্ব খণ্ডে পাকিস্তান আক্রমণ চালায়। অনেক আগে থেকেই এই আক্রমণের পরিকল্পনা করে রাখা হয়েছিল। পাকিস্তান এর নাম দিয়েছিল 'অপারেশন গ্র্যান্ডস্ল্যাম'। পাকিস্তানের সাঁজোয়া বাহিনী এই ছাম্ব খণ্ডে সেদিন তিন-তিন বার আক্রমণ চালিয়েছিল। তিনটি আক্রমণই বড় রকমের। প্রথম আক্রমণের সময় ভোর চারটে। দ্বিতীয় আক্রমণের সময় ভোর পাঁচটা। তৃতীয় আক্রমণের সময় বেলা সাড়ে এগারোটা। তৃতীয় বারের আক্রমণে প্রচুর মার্কিন প্যাটন ট্যাংক তারা ব্যবহার করেছিল। এর আগে, আগস্ট মাসের ১৪ই ১৫ই ১৭ই ও ১৮ই তারিখে, ছাম্ব-আখনুর খণ্ডে পাকিস্তান একবারই যুদ্ধবিরতি-সীমারেখা ও আন্তর্জাতিক সীমারেখা লঙ্ঘন করেছে।

১লা সেপ্টেম্বরের কথায় ফিরে আসা যাক। সেদিন পাক আক্রমণের প্রথম আঘাত হানা হয়েছিল আমাদের বুরেজলের ঘাঁটির উপরে। সেখানে তারা অবিশ্রান্তভাবে কামান চালাতে থাকে। সেই একই সঙ্গে, আরও কিছুটা উত্তরে,

ঝানগড়ে আমাদের সেনাবাহিনীর মূল ঘাটির উপরেও তারা গোলাবর্ষণ করে। আসলে এটা আর কিছুই নয়, আমাদের সৈন্যবাহিনীর দৃষ্টিকে অন্য দিকে আকর্ষণ করার একটা ফন্দি। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যবাহিনী তাতে বিভ্রান্ত হননি।

এর এক ঘণ্টা বাদে পশ্চিম পাকিস্তানের তাহু গ্রাম থেকে এগিয়ে এসে পাক সেনারা আন্তর্জাতিক সীমান্ত লঙ্ঘন করে এবং বুরেজলের উপরে সরাসরি আক্রমণ চালায়। ভারতীয় সৈন্যরা তা প্রতিহত করেন।

অতঃপর আক্রমণ চালানো হয় মেলু গ্রাম থেকে। পাকিস্তানী সৈন্যরা এক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক সীমান্ত লঙ্ঘন করেছিল। ভারতীয় সৈন্যরা এবারেও, এবং এর পরে আরও একবার, তাদের হটিয়ে দেন।

পাকিস্তান এর পরে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে আঘাত হানে। এবারকার আক্রমণে তারা প্যাটন ট্যাংক নিয়ে এসেছিল। পাক-সৈন্যদের মনে এই রকমের একটা বিশ্বাস ছিল যে, প্যাটন ট্যাংক দুর্ভেদ্য, তাকে ঘায়েল করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। যাই হোক, এবারে তাদের একটি বাহিনী আন্তর্জাতিক সীমান্ত এবং আর-একটি বাহিনী ভিমবারের কাছে যুদ্ধবিরতি সীমারেখা লঙ্ঘন করে; দেওয়া-র উত্তরে একটি অর্ধবৃত্ত রচনা করে তাদের দুই রেজিমেন্ট ট্যাংক-সেনা ও পুরো একটি পদাতিক ব্রিগেড এই আক্রমণে অংশ নেয়।

সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে দ্রুত এগোবার পক্ষে এ-অঞ্চল খুবই সুবিধাজনক। তা ছাড়া যোগসূত্র বজায় রাখবার সুবিধেটাও পাকিস্তানের এক্ষেত্রে ছিল। শিয়ালকোট, খরিয়ান ইত্যাদি ঘাঁটি থেকে এখানে খুব সহজেই আবার নতুন করে যুদ্ধসম্ভার আনিয়ে নেওয়া যায়।

ভারতীয় সৈন্যরা অতঃপর সুপরিকল্পিতভাবে, অগভীর মুনওয়ার তাওয়ি নদী বরাবর, ছাম্ব অঞ্চলে পিছিয়ে আসেন। (শত্রুসৈন্যরা তার পরের দিন এটি পার হয়।) পাক-বাহিনীকে প্রতিহত করবার জন্য তখন আমাদের বিমান বাহিনীর সাহায্য চাওয়া হল।

ভারতীয় বিমান-বাহিনীর কয়েকজন তরুণ বৈমানিক, অগ্রবর্তী একটি ঘাটিতে বসে, তাঁদের স্কোয়াড্রনের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করছিলেন। হঠাৎ তাঁদের কাছে নির্দেশ গিয়ে পৌঁছল, শত্রু-সৈন্য এগিয়ে আসছে, তাদের প্রতিহত করো। ডাক আসতেই তাঁরা আকাশে উঠলেন।

বিকেল ৫-১৫ থেকে ৬টার মধ্যে ভারতীয় বৈমানিকদের সাতটি দল সেদিন মোট ২৮ বার গিয়ে শত্রু-বাহিনীর উপরে হানা দিয়েছেন। শুধু আমাদের বিমান-বহরের আক্রমণেই ঘায়েল হল শত্রুপক্ষের অন্তত ১৩টি ট্যাংক; আরও কয়েকটি ঘায়েল হল স্থল-বাহিনীর গোলার আঘাতে। প্রথম দিনেই পাকিস্তানের মোট ১৮টি ট্যাংক আমরা খতম করেছি।

পাকিস্তানের বিমান-বাহিনীও ইতিমধ্যে আক্রমণের নির্দেশ পেয়েছিল।

তাদের স্যাবর জেট থেকে গুলি চালিয়ে ভারতীয় দুটি ভ্যাম্পায়ার বিমানকে মাটিতে নামানো হল। এর দুদিন বাদে তার প্রতিশোধ নিলুম আমরা। ছাম্ব-আখনুরের উপরে আকাশ-যুদ্ধে আমাদের দুটি ন্যাট বিমান থেকে গুলি চালিয়ে ঘায়েল করা হল পাকিস্তানের দুটি স্যাবর জেটকে; শূন্য থেকে সেই স্যাবর দুটি মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল। ক্ষতির অঙ্ক তখন সমান-সমান। ওদেরও দুটি বিমান ধ্বংস হয়েছে, আমাদেরও তাই। কিন্তু পাক বিমান-বহর তারপর থেকে আর ভারতীয় বিমান-বাহিনীর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি। প্রাথমিক ক্ষতির প্রতিশোধ নেবার পরেই যেন ভারতীয় বিমান-বাহিনীর পরাক্রম ক্রমে বেড়ে যেতে লাগল।

সে যাই হোক, ১লা সেপ্টেম্বরের সূর্য যখন অস্তগামী, আখনুরের দিকে পাকিস্তানের অগ্রগতি তখন কিছুটা প্রতিহত হয়েছে, এবং ভারতীয় বাহিনী তখন জওরিয়ানের সম্মুখে উঁচু জমির উপরে আবার নতুন করে ব্যূহ রচনা করছেন। এই বিরতি অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পাকিস্তানীদের মনে তখন জয়ের একটা মিথ্যা কুহকের সঞ্চার হয়েছে। সাঁজোয়া বাহিনীর চাপে ঢিল না দিয়ে তাই তারা আরও এগোবার চেষ্টা করতে লাগল। তাদের পিছনেই ছিল বিদেশী সাংবাদিকের দল।

কী উদ্দেশ্যে যে পাকিস্তানীরা এগিয়ে আসছিল, সেটা সহজেই বুঝতে পারা যায়। তাদের ইচ্ছে ছিল, প্রথমেই তারা আখনুর দখল করে। আখনুর থেকে চন্দ্রভাগার উপরে সহজেই প্রভুত্ব বজায় রাখা যায়; তা ছাড়া নওশেরা-রাজৌরি-পুঞ্চ খণ্ডে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর যে যোগাযোগ-ব্যবস্থা, তারও সংগে আখনুরের যোগসূত্র অতি ঘনিষ্ঠ। আখনুর দখল করাই তাই ছিল পাকিস্তানের প্রথম লক্ষ্য। পাকিস্তানী বাহিনী ভেবেছিল, প্রথমে তারা আখনুর দখল করবে; তারপর হানবে তাদের দ্বিতীয় আঘাত। এই দ্বিতীয় আঘাতটি সম্ভবত সরাসরি শিয়ালকোট থেকে হানা হত। দ্বিতীয় আঘাতের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়,—জম্মু অধিকার করে লাদকসহ গোটা জম্মু-কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। পাকিস্তান ভেবেছিল, এই সামরিক বিপর্যয়ের রাজনৈতিক অভিঘাত ভারতের পক্ষে এতই মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে যে, ভারতের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে, পাকিস্তানকে রুখবার মতন মেরুদণ্ড তার আর থাকবে না, দিল্লিতে বিশৃঙ্খলা আতঙ্ক আর অন্তর্বিরোধ দেখা দেবে, এবং সেই সুযোগে পাকিস্তান কাশ্মীরকে গ্রাস করে নেবে। পাকিস্তানের হিসেবটা যদি মিলে যেত, সত্যিই যে এটা তাহলে তার দিক থেকে একটা 'গ্র্যান্ডস্ল্যাম' হয়ে দাঁড়াত, তাতে সন্দেহ নেই।

পাকিস্তানী সৈন্য-বাহিনীর ক্রিয়া-কলাপ থেকে মনে হয়, পাক-কর্তারা এই রকমেরই একটা হিসেব কষে রেখেছিলেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর সকালে পাক-

বিমানবাহিনী শিয়ালকোট-জম্মু সড়কে রণবীরসিংপুরার পূবে দুটি জায়গায় রকেট-আক্রমণ চালায়। জওরিয়ান ও আখনুরের মাঝখানে যেখানে যুদ্ধ চলছিল, সেখান থেকে এর দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ মাইল। শিয়ালকোট-পাসরুর এলাকা ও লাহোর এলাকার প্রত্যেকটিতেই পাকিস্তান একটি করে সাঁজোয়া ডিভিশন ও দুটি করে পদাতিক ডিভিশন মোতায়েন রেখেছিল। পাকিস্তানের আক্রমণের থাবা যদি আখনুর ও জম্মুতে গিয়ে পৌঁছতে পারত, তাহলে ভারত যাতে কাশ্মীরে আর নতুন করে সৈন্য পাঠাতে না পারে, তার জন্য পাকিস্তান ভারত-ভূখণ্ডের উপরে আরও দুটি জায়গায় আক্রমণের উদ্যোগ করত। প্রথম আক্রমণটি সম্ভবত পরিচালিত হত পাসরুর নরওয়াল এলাকা থেকে, ইরাবতী নদীর ডেরা বাবা নানক সেতুর উপর দিয়ে। তার লক্ষ্য হত গুরুদাসপুর, এবং পাঠানকোটের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেল-কেন্দ্র। যে-সব নথিপত্র আমাদের হাতে পড়েছে, তার থেকে মনে হয়, সাঁজোয়া বাহিনীর দ্বিতীয় আক্রমণটি পরিচালিত হত কাসুর-খেম করন বরাবর। হারিকে, তারন তারন ও বিপাশা বরাবর একটি ত্রিমুখী আঘাত এক্ষেত্রে হানা হত। আঘাতের দ্বিতীয় মুখটির লক্ষ্য হত অমৃতসরকে ঘিরে ফেলা। তৃতীয় মুখটি গ্র্যান্ড ট্রাংক রোডের দখল নিত। পাকবাহিনী হিসেব করে রেখেছিল যে, গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড দখল করে তারা দিল্লির দিকে ধাবিত হবে।

আরও একটি ভ্রান্ত ধারণার ব্যাধিতে ভুগছিল পাকিস্তান। ওর মনে এই রকমের একটা বিশ্বাস দানা বেঁধেছিল যে, ভারতবর্ষ যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক, যুদ্ধ করবার মতন সাহসই তার নেই। কয়েকটি মহল মনে করেন, ছাম্ব অঞ্চলে পাকিস্তানের আক্রমণ আসলে একটা সংকেত, পাকিস্তান ভেবেছিল, এই সংকেত অনুযায়ী উত্তর দিক থেকে চীনও এসে ভারতবর্ষের উপরে হানা দেবে। পাকিস্তান আর চীন, দুই সাঙাতের অন্তত এই একটা ব্যাপারে একই উদ্দেশ্য; কাশ্মীরকে তারা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে চায়।

ভারতীয় বাহিনী পাঁচ দিন ধরে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম চালালেন। প্রথম চার দিনে শত্রু-সেনারা আমাদের জমিতে প্রায় ১২ মাইল ঢুকে পড়েছিল, ৫ই সেপ্টেম্বরের পর থেকে তাদের সেই অগ্রগতি একেবারে স্তব্ধীভূত হয়ে গেল।

(৪ঠা সেপ্টেম্বর ও ৫ই সেপ্টেম্বর, ভারতবর্ষের পক্ষে এ-দুটি দিনের গুরুত্ব অসীম। প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচাবন, অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী ও তথ্যমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই সময়ে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে অবস্থা সম্পর্কে জরুরী আলোচনা চালান। মন্ত্রি-সভার বৈঠকে সমগ্র অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচিত হল। এবং দেশের রাজনৈতিক নেতারা শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন যে, এ সম্পর্কে আমাদের

ইতিকর্তব্য নির্ধারণের দায়িত্ব চীফ অব দি আর্মি স্টাফ জেনারেল জে এন চৌধুরীর হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। রাজনৈতিক নেতাদের এই সিদ্ধান্ত যে খুবই বিচক্ষণ হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

পাকিস্তানের উপরে পালটা আক্রমণ চালাবার প্রস্তাব করলেন জেনারেল চৌধুরী। রাজনৈতিক নেতারা সে-প্রস্তাবে সমর্থন জানালেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী ইতিপূর্বে পাকিস্তানকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষ তার নিজের সুবিধা অনুযায়ী রণাঙ্গন নির্বাচন করবে, এবং সেখানে যুদ্ধ চালাবে। সেই সতর্কবাণী পাকিস্তান সম্ভবত বিস্মৃত হয়েছিল। কিংবা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সতর্কবাণীর উপরে পাকিস্তান হয়ত বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেনি।

৬ই সেপ্টেম্বর সকালেই পাকিস্তান বুঝতে পারল যে, শাস্ত্রীজীর সতর্ক-বাণী অসার নয়; তিনি তাঁর সংকল্প অনুযায়ী কাজ করতে চান।

৬ই সেপ্টেম্বর ও তার পরে :

পালটা-আক্রমণ না চালিয়ে আমাদের তখন উপায় ছিল না। আর কিছু না হোক, আখনুরের উপরে পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান চাপ শিথিল করবার জন্যই পালটা আক্রমণ চালাবার প্রয়োজন জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছিল।

প্রত্যুষে ভারতীয় স্থল-বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে লাহোর-খণ্ডে ঢুকলেন। একই সঙ্গে পাকিস্তানের কয়েকটি সামরিক ঘাটির উপরে চলল ভারতীয় বিমান-বাহিনীর প্রবল আক্রমণ। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি এতদিন একটি কথাও বলেনি। কিন্তু লাহোর-খণ্ডে পালটা আক্রমণ শুরু হতে-না-হতেই তারা চেঁচিয়ে উঠে বলল যে, ভারতবর্ষ পাকিস্তানকে আক্রমণ করেছে।

সে যাই হোক, লাহোর-খণ্ডে যে রণাঙ্গনের সৃষ্টি হল, প্রস্থে তা তিরিশ মাইল; এবং এই রণাঙ্গনে আমাদের আক্রমণ ছিল ত্রিমুখী। ওয়াগা-ডোগরাই; খালরা-বারকি; খেম করন-কাসুর। এর উত্তরে ভারতীয় বাহিনীর কয়েকটি দলের কাছে প্রচণ্ড মার খেয়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা তো বাবা নানক সেতুর উপর দিয়ে ইরাবতী নদীর পশ্চিম তীরে পালাল। ভারতীয় সৈন্যরা পাছে নদী অতিক্রম করে আবার তাদের বেদম মার লাগান, এই ভয়ে পাক-সৈন্যরা তার পরের দিনই এই সেতুটিকে ধ্বংস করে দেয়। (ফলে পাকিস্তানের পক্ষেও নদী পার হয়ে এদিকে আসার পথ বন্ধ হয়ে গেল।) এখানকার যুদ্ধে, এই প্রথম, কয়েকটি প্যাটন ট্যাংক আমরা দখল করলুম।

৬ই সেপ্টেম্বর তারিখেই, সন্ধ্যা নাগাদ, ভারতীয় বাহিনীর অগ্রবর্তী

কয়েকটি দল ইছোগিল খালের ধারে গিয়ে পৌঁছলেন। ইছোগিল খাল আর ইরাবতী নদী তাঁরা অতিক্রমও করেছিলেন; কিন্তু পাক-সৈন্যরা প্রচণ্ডভাবে পালটা-আক্রমণ চালাতে থাকায় অগ্রবর্তী ভারতীয় সেনারা সেতুমুখে তাদের দখলকে খুব দৃঢ় করে তুলতে পারেননি। ফলে তাঁরা আবার পূর্বপারে চলে এলেন। আমাদের প্রত্যাশিত ফল অবশ্য আমরা লাভ করলুম। লাহোর খণ্ডে আমাদের পালটা আক্রমণ শুরু হতেই আখনুরের উপরে পাকিস্তানের মুঠি শিথিল হয়ে গেল। সেখান থেকে সে তার সৈন্যবাহিনী আর অস্ত্রসম্ভারের একটা বড় অংশই সরিয়ে নিয়ে আসতে লাগল শিয়ালকোট পাসরুরের দিকে।

প্রেসিডেণ্ট আয়ুব তাঁর বেতার-বক্তৃতায় ঘোষণা করলেন, "আমরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি।" সেই রাত্রেই পাঠানকোট, আদমপুর আর হালওয়ারার অগ্রবর্তী বিমানঘাটির কাছে এবং আরও কয়েকটি জায়গায় পাকিস্তান তার ছত্রীবাহিনীর লোকদের নামিয়ে দিল। ছত্রী-সেনাদের আগে থাকতেই তারা জোর তালিম দিয়ে রেখেছিল। এরা 'স্পেশাল সারভিস গ্রুপের লোক, এদের নির্বাচনে খুবই সতর্ক কড়াকড়ির ব্যবস্থা আছে। এদের এক-একটি দলে ৬০-৭০ জন করে সৈন্য থাকে। ভারতীয় জমিতে এই রকমের কয়েকটি দল নামিয়ে দিল পাকিস্তান, এবং সম্ভবত এই আনন্দে মশগুল হল যে, ছত্রীসেনারা তাদের নাশাত্মক কাজ চালিয়ে সহজেই কেল্লা ফতে করবে। বাস্তবে কিন্তু এই ছত্রী সেনারা আমাদের কোনও ক্ষতিই করতে পারেনি। ভারতীয় জমিতে নামার পরেই এইসব বীরপুরুষের সাহস একেবারে কর্পূরের মতন উবে গেল। চটপট গ্রেপ্তার করা হল এদের, এ-ব্যাপারে আমাদের আদৌ বেগ পেতে হল না।

পাঠানকোটের কাছে যে পাক-ছত্রীদের নামানো হয়েছিল, তাদের কথা বলি। পাকিস্তানের একটি সি-১৩০ হারকিউলিস বিমান থেকে, ৭ই সেপ্টেম্বর রাত তিনটের সময়, বিমানঘাটি থেকে মাইল দুই-তিন দূরে এদের নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দলে ছিল ৬২ জন লোক। তাদের উপরে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তা এই :

বিমানঘাটিটিকে তারা আক্রমণ করবে, সেখানকার যন্ত্র-সরঞ্জাম ও বিমান-গুলিকে ধ্বংস করবে, সম্ভব হলে গোটা বিমানঘাটিটিকে দখল করে নেবে, এবং তাদের আক্রমণ যে সফল হয়েছে সংকেতে সে কথা জানিয়ে দিয়ে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রতীক্ষা করবে। ঠিক ছিল যে, তাদের কাছ থেকে সাংকেতিক সাফল্য-বার্তা পাওয়া গেলে একটি পাকিস্তানী বিমান গিয়ে পাঠানকোটে নামবে এবং সেখান থেকে তাদের সরিয়ে আনবে।

তাদের একটা বিকল্প-পরিকল্পনা ছিল। সেটা এই

কাজ হাসিল করে, গ্রামাঞ্চলের পথে, পদব্রজে তারা পাকিস্তানের দিকে রওনা হবে। সীমান্তের দূরত্ব সেখান থেকে চৌদ্দ মাইল।

পাক-কর্তারা ভেবেছিলেন, যে কাজের দায়িত্ব দিয়ে এই ছত্রীদলকে তাঁরা নামিয়ে দিলেন, তা হাসিল করতে ঘণ্টা কয়েকের বেশী সময় লাগবে না। দলের সংগে ছিল মাঝারী রকমের ছটা মেশিনগান, অন্য-কিছু অস্ত্র-শস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য, যোগরক্ষার যন্ত্রপাতি এবং সেইসঙ্গে কিছু ওষুধপত্র। দলের নায়ক ছিলেন একজন মেজর।

কিন্তু যেমন অন্যত্র, তেমনি পাঠানকোটেও, পাক-ছত্রীদের মতলব ভণ্ডুল হয়ে গেল। মাত্রই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, অস্ত্রশস্ত্রসহ, গ্রেপ্তার করা হল সমগ্র দলটিকে। আমাদের কোনও ক্ষতিই তারা করতে পারল না। সত্যি বলতে কী, আমরা তাদের ধরে ফেলাতেই যেন তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

সন্দেহ নেই যে, যুদ্ধের মোড় ইতিমধ্যে ঘুরে গিয়েছিল।

ভারতবর্ষ যুদ্ধ চায়নি। পাকিস্তান চেয়েছে। শুধু যে চেয়েছে, তা নয়; গোড়ার থেকেই সে যুদ্ধের জন্যে তৈরী হয়েছে। তার প্রস্তুতিটা দীর্ঘ কালের। তার রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক আদর্শ কখনও সম্মান পায়নি; ধর্মীয় গোঁড়ামিই ছিল তার সারকথা। কালক্রমে সেই গোঁড়ামির থেকেই জন্ম নিল জঙ্গী মোল্লাতন্ত্র। ভারতবর্ষের উপরে এই মোল্লাতন্ত্র বার বার হানা দিয়েছে। তাকে প্রতিরোধ করবার প্রয়োজন ক্রমেই অনিবার্য হয়ে উঠছিল। ১৯৬৫ সনের ১লা সেপ্টেম্বর আর ৬ই সেপ্টেম্বর—এই দিন দুটিকে সেই দিক থেকেই বিচার করা দরকার। ১লা সেপ্টেম্বরের জবাব হচ্ছে ৬ই সেপ্টেম্বর। আঘাতের জবাবে প্রত্যাঘাত।

পাকিস্তান যুদ্ধ চেয়েছিল। তাকে যুদ্ধ দেওয়া হল। আয়ুব খাঁ ঘোষণা করলেন, "এ হচ্ছে যুদ্ধ।" আন্তর্জাতিক আইনে যাঁরা বিশেষজ্ঞ, তাঁরা অবশ্য এই ঘোষণাকে সরকারীভাবে যুদ্ধঘোষণা বলে গণ্য করলেন না। ভারতবর্ষও নীরব রইল। এখানে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, সরকারীভাবে ঘোষিত হোক আর না-ই হোক, পাকিস্তান একে প্রকাশ্য যুদ্ধ হিসেবেই গ্রহণ করেছে, এবং কার্যকলাপে প্রমাণ করেছে যে, এই যুদ্ধকে সে সরকারীভাবে ঘোষিত যুদ্ধ-হিসেবেই গণ্য করে। সমুদ্রপথে সে জলদস্যুতা চালিয়েছে, ভারতীয় জাহাজ ও পণ্য সে আটক করেছে, পাঞ্জাব আর রাজস্থানে অসামরিক অধিবাসীদের উপরে নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করেছে, ন্যাপাম বোমা ব্যবহার করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান যে কতখানি দুর্নীতিপরায়ণ, এইগুলিই তার প্রমাণ।

ছাম্ব এলাকায় আমাদের সৈন্যদের উপরে বড়-রকমের চাপ পড়েছিল। জেনারেল চৌধুরী যে রণকৌশল অবলম্বন করলেন, এই চাপ হ্রাস করাই তার

উদ্দেশ্য। এমনভাবে তিনি প্রত্যাঘাত হানলেন, ছাম্ব এলাকা থেকে পাকিস্তানী সৈন্যরা যাতে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। সেই সঙ্গে যেখানে-যেখানে সম্ভব, সেইখানেই তিনি আত্মরক্ষামূলক পদ্ধতিতে শত্রুর শক্তিক্ষয়ের রণকৌশল অবলম্বন করতে চাইছিলেন। ইংরেজীতে একেই বলা হয় "ওয়র অব অ্যাট্রিশন"।

৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনটি জায়গা দিয়ে আমরা লাহোর-খণ্ডের উপরে আক্রমণ চালিয়েছিলাম। (১) গুরুদাসপুর জেলায় ডেরা বাবা নানক, (২) অমৃতসর জেলায় ওয়াগা, (৩) ফিরোজপুর। ওয়াগা-ক্ষেত্রে আমাদের আক্রমণের আর একটি মুখও গিয়ে মিশেছিল। খালরায় তার সূচনা।

আক্রমণের প্রথম দিনেই, পাকিস্তানী স্থল-বাহিনী আর সাঁজোয়া-ব্যূহকে ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়ে আমাদের সেনারা পাকিস্তানের জমির উপর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলেন। পাকিস্তান সেদিন সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়েছিল। গোটা লাহোর-খণ্ডেই পাকিস্তানী সৈন্যরা সেদিন পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। পালিয়ে গিয়ে তারা ইছোগিল খালের পশ্চিম তীরে আশ্রয় নিল। (পশ্চিম পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশের রক্ষাব্যূহ হিসেবেই এই খালটির সৃষ্টি।)

ইরাবতী থেকে শতদ্রু পর্যন্ত উত্তরে-দক্ষিণে ইছোগিল খালের দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০ মাইল। ডেরা বাবা নানকের কয়েক মাইল উত্তরে, উত্তর-বিতস্তা খালের রায়া শাখা থেকে বেরিয়ে ইছোগিল খাল এসে আড়াআড়িভাবে ইরাবতী অতিক্রম করেছে, এবং জালো, ডোগরাই, বার্কি ও গন্দা সিংওয়ালার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কাসুর ও ফিরোজপুরের মাঝখানে শতদ্রুতে এসে মিশেছে। খালটি প্রস্থে প্রায় ১২০ ফুট; ১৫ ফুট গভীর। বছর বারো আগে এটি খনন করা হয়। এর তীরে সারি-সারি কংক্রীটের পিলবক্স আর কামান ঘর তৈরী করা হয়েছে। খালের পাড়গুলি কংক্রীটে-বাঁধানো। দেখেই বোঝা যায়, ট্যাংকের আক্রমণে বাধা দেবার ব্যবস্থা হিসেবেই এই খাল কাটা হয়েছিল।

প্রথম দিনেই ভারতীয় সেনারা এই খালের পূর্বতীরে এসে পৌঁছেছিলেন। কয়েকটা জায়গায় এই খালটিকে অতিক্রমও করেছিলেন তাঁরা। এ যে তাঁদের অসাধারণ শৌর্য আর পরাক্রমেরই পরিচায়ক, তাতে সন্দেহ নেই। যুদ্ধ অবশ্য শেষ হল না; সবে তখন তার শুরু।

একদিকে ভারত-সীমান্ত; অন্য দিকে ইছোগিল খাল। মধ্যবর্তী ভূমির উপরে চলল আক্রমণ আর পাল্টা-আক্রমণের পালা। পাকিস্তানী আক্রমণের হিংস্রতা ইতিমধ্যে কমেনি। একটা কথার এখানে উল্লেখ করা দরকার। আয়তনে পাকিস্তান ক্ষুদ্র বটে; কিন্তু আমাদের এই শত্রু-রাষ্ট্রটি একে ধর্মান্ধ, তায় হিংস্র। সকল খণ্ডের সকল রণাঙ্গণেই আমাদের সেনানীরা সাংবাদিকদের কাছে এই হিংস্রতার কথা বলেছেন। পাকিস্তানী সৈন্যদের রণকৌশলে বুদ্ধির

পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায়নি। তবে একটা কথা ঠিক। তারা গোঁয়ারের মতন লড়েছে। বুদ্ধিতে তারা খাটো বটে, কিন্তু জান্তব গোঁ নিয়ে তারা লড়াই করে। ভারতীয় একটি ডিভিশনের সদর-দপ্তরে ফ্রন্টলাইনের একজন কমান্ডার আমাদের বলেছিলেন, "পাকিস্তানের যে-সব অঞ্চল আমরা দখল করেছি, পাকিস্তানী সৈন্যরা তার প্রতিটি ইঞ্চির জন্যে মাটি কামড়ে লড়েছে।"

ভারত সরকারের, বিশেষ করে নয়াদিল্লিতে তাঁদের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর, নির্দেশে যুদ্ধকালে পাকিস্তানী আক্রমণের এই হিংস্রতার কথা বলা যায়নি। ফলে, ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে অনেকেই প্রথম-দিকে ভেবেছিলেন যে, ভারতীয় বাহিনীর কাজ একেবারে জলের মতন সহজ; অনায়াসেই তাঁরা লাহোর আর শিয়ালকোট দখল করে নিয়ে প্রথম দিনেই পাকিস্তানের সামরিক সামর্থ্যের মুখে লাথি কষিয়ে দিতে পারেন। ধারণাটা ঠিক নয়। যুদ্ধের বিবরণ থেকেই বুঝতে পারা যাবে, আমাদের সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতিকে রুদ্ধ করবার জন্য কীভাবে পাকিস্তান তার সর্বশক্তি নিয়ে যুদ্ধে নেমেছিল। পাকিস্তান জানত যে, অগ্রসরমান ভারতীয় সৈন্যদের বাধা দিতে হলে পাকিস্তানকে তার ট্যাংক নিয়ে ইছোগিল খাল পার হয়ে এগিয়ে আসতে হবে, কেননা ভারতীয় বাহিনীও বিনা-ট্যাংকে আসছে না। পাকিস্তান এও জানত যে, তার ট্যাংকগুলি যদি ঘায়েল নাও হয়, তবু ইছোগিল খালের কয়েকটা সেতু উড়িয়ে দিলেই তার ট্যাংকগুলিকে খরচের খাতায় লিখে রাখতে হবে।

পাকিস্তান যে তার সমস্ত শক্তি নিয়ে উন্মাদের মতন লড়েছিল, খেম করন, ডোগরাই আর ফিলোরার যুদ্ধই তার প্রমাণ। ঠিক উন্মাদের মতই যুদ্ধ করেছিল সে। কিন্তু তার ক্ষতিও হয়েছে প্রচণ্ড। আমাদের অফিসার আর জওয়ানরা এই রণাঙ্গণগুলিতে তাকে বেদম প্রহার দিয়েছেন। এই প্রহারের যন্ত্রণা সে কোনওদিনই ভুলতে পারবে না।

৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে লাহোর-খণ্ডে পাকিস্তানীরা খুবই হিংস্রভাবে পালটা-আক্রমণ চালায়। ফলে তখন অনেকেরই মনে হয়ে থাকবে যে, চূড়ান্ত লড়াই সেইখানেই হচ্ছে, এবং জয়লাভের পুরস্কার হচ্ছে লাহোর। এটাও একটা ভুল ধারণা। শত্রুকে বিভ্রান্ত করবার জন্য আমরা হয়ত চাইছিলাম যে, সে ভাবুক, আমরা লাহোর অধিকার করতে চাই। এমন ছলনার প্রয়োজনও হয়ত ছিল। আসল সত্যটা কিন্তু এই যে, ভারতীয় বাহিনী আদৌ লাহোর দখল করবার কথা ভাবেননি, তার জন্য চেষ্টাও করেননি। চেষ্টা করলে আমরা অবশ্যই লাহোর দখল করতে পারতুম। কিন্তু সামরিক দিক থেকে তাতে কোনও লাভ হত না; রাজনৈতিক দিক থেকেও লাহোর আমাদের পক্ষে একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াত। ভারত আসলে পাকিস্তানের জমি দখল করার উপর কোনও

গুরুত্ব আরোপ করেনি। তার সামরিক সামর্থ্য আর যুদ্ধ-সরঞ্জামকে ধ্বংস করাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। পববর্তী যুদ্ধগুলিতে সেই উদ্দেশ্য অনেকাংশেই সাধিত হয়েছে।

বিভিন্ন খণ্ডের যুদ্ধের বর্ণনা থেকেই বোঝা যাবে, সার্বিকভাবে যুদ্ধ কীভাবে এগোচ্ছিল। যথা খালরা খণ্ডে বার্কির যুদ্ধ, ফিরোজপুর খণ্ডে খেম করনের যুদ্ধ, ওয়াগা খণ্ডে ডোগরাইয়ের যুদ্ধ, জম্মু-শিয়ালকোট খণ্ডে ফিলোরার যুদ্ধ। এ-সব যুদ্ধ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বার্কির যুদ্ধ

৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী খালরা থেকে এগোতে শুরু করেন। হুডিয়ারা খালে পাকিস্তানীরা খুবই প্রবলভাবে তাঁদের বাধা দেয়। শত্রুপক্ষ অবশ্য তাদের ঘাটি আগলে বসে থাকতে পারেনি, ভারতীয় বাহিনীর হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে, খালের উপরকার সেতুটিকে উড়িয়ে দিয়ে, তারা পিছু হটে যায়। সেতু উড়িয়ে দেওয়ায় আমাদের বাহিনী খুবই অসুবিধেয় পড়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা বার্কি-কালানের দিকে এগোতে থাকেন। আমাদের সীমান্ত থেকে এ-জায়গাটা চার মাইল। শত্রুপক্ষ এখানে প্রবলভাবে আমাদের বাধা দিল। কিন্তু আমাদের পথ আটকানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ভারতীয় সৈন্যেরা ঘণ্টা ছয়েকের মধ্যেই এই এলাকা থেকে পাকিস্তানীদের তাড়িয়ে দিলেন।

আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য তখন বার্কি শহর। এখানকার অধিকাংশ বাড়িই মাটির তৈরী; গায়ে-গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে তারা দাঁড়িয়ে আছে। লোকসংখ্যা হাজার আটেক। ভারতীয় সৈন্যদের আগমন-বার্তা শুনেই এখানকার অসামরিক অধিবাসীরা পলায়ন করেছিল। পিছনে পড়ে ছিল থুরথুরে এক বুড়ী আর এক অন্ধ বুড়ো। আপনজনেরা তাদের কথা ভাবেইনি; হয়ত ভেবেছিল, এরা মরুক। ভারতীয় সৈন্যরা, বলাই বাহুল্য, এই বুড়োবুড়ীর গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগতে দেননি; তাঁরাই এখন এদের খাইয়ে-দাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

১০ই সেপ্টেম্বর রাত আটটা নাগাদ শুরু হল আমাদের আক্রমণ। শুধু বার্কি শহর নয়, সেইসঙ্গে ইছোগিল খালের নিকটতম সেতুটিকে দখল করাই এই আক্রমণের উদ্দেশ্য। পাকিস্তানীরা এখানে প্রবলভাবে আমাদের প্রতিরোধ করেছে; খালের পূর্বতীরের ডজন খানেক পিলবক্স থেকে অবিশ্রান্তভাবে তারা আমাদের উপরে গোলাগুলি চালিয়েছে। পরে একজন সেনানী বলেন যে, এইটেই হচ্ছে পাকিস্তানের 'ম্যাজিনো লাইন'।

১০ই সেপ্টেম্বরের সেই অবিস্মরণীয় রাত্রে আমাদের সৈন্যবাহিনীর জওয়ানরা অকুতোভয়ে এগিয়ে গিয়ে এই 'ম্যাজিনো লাইনে'রই বেশ-কিছুটা অংশকে চূর্ণ করে দিয়েছেন। ভারতীয় সামরিক ইতিহাসে তাঁদের এই পরাক্রমের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে। জনেক সৈন্যাধক্ষের ভাষায় ভারতীয় সৈন্যরা সেদিন "আশ্চর্য পরাক্রম দেখিয়েছেন। মৃত্যুকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ করে, পরিণামের কথা না ভেবে, ঘড়ির কাটার মতন অভ্রান্ত নিয়মনিষ্ঠায় তাঁরা সেদিন লড়েছিলেন।"

বার্কি থেকে লাহোরের শহরতলি মাত্র ৪ মাইল। সম্প্রতি আমি বার্কিতে গিয়েছিলাম। পাকিস্তানী সৈন্যদের হটিয়ে দিয়ে আমাদের জওয়ানরা এই শহরটিকে দখল করে আছেন। আমাদের জওয়ান আর অফিসারদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। ভয় কাকে বলে, তা তাঁরা জানেন না। তাঁদের সঙ্গে আমি যখন কথা বলছিলুম, পাকিস্তানীরা তখনও আড়াল থেকে চোরাগোপ্তা গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। বুলেটগুলি কীভাবে এসে মাটির দেয়ালে গেঁথে যাচ্ছে, কথা বলতে-বলতেই তা আমি লক্ষ্য করছিলুম। খানিক বাদেই শুরু হল পাকিস্তানীদের কামান থেকে গোলাবর্ষণের পালা। মাত্রই গজ তিরিশেক দূরে তাদের শেলগুলি এসে ফাটছিল। ব্যাপার দেখে বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে, ইছোগিল খালের পূর্বপার থেকে পাকিস্তানীরা এখানে একটা পালটা-আক্রমণ শুরু করবার চেষ্টায় আছে।

পাকিস্তানী 'ম্যাজিনো লাইনে'র কংক্রীট পিলবক্সগুলি খুবই মজবুত। আমাদের একজন জওয়ান এই পিলবক্সগুলির একটির মধ্যে সরাসরিভাবে একটা হ্যাণ্ড-গ্রেনেড ছুড়ে মেরেছিলেন। সেটা যখন ফাটে পিলবক্সের ভিতরকার তিন-তিনজন পাক-সৈনাই তাতে খতম হয়ে গেল বটে, কিন্তু অতবড় বিস্ফোরণেও পিলবক্সের দেয়ালের বিশেষ ক্ষতি হল না। এর থেকেই আন্দাজ করা যাবে, এগুলি কতখানি মজবুত। আমাদের সৈন্যরা সেদিন যখন বার্কি শহর থেকে ইছোগিল খালের দিকে এগোচ্ছেন, পাকিস্তানীরা তখন তাদের প্রবলভাবে বাধা দিয়েছিল। গোলাগুলির বিরাম ছিল না। প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা জুড়ে যেন অবিশ্রান্ত গুলিবৃষ্টি হচ্ছিল। খালের ওপারে সারি সারি পিলবক্স। এক-একটা পিলবক্সের মধ্যে তিনজন করে পাকিস্তানী সৈ[illegible] একজন কামান চালাচ্ছে, একজন ট্যাংক-বিধ্বংসী গোলা চালাচ্ছে, আর একজন অটোমেটিক রাইফেল চালাচ্ছে। এরা সুইসাইড স্কোয়াডের লোক। প্রাণ যে বিপন্ন, তা জেনেই এদের লড়তে হয়। তাদের পিছনে ছিল গোলন্দাজ-বাহিনী। তারাও অবিশ্রাম গোলা-বর্ষণ করছিল।

পাকিস্তানীদের শক্তিটাকে আঁচ করে নিয়ে আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষরা ঠিক করলেন, রাত্রিকালে আক্রমণ চালানো হবে। রণকৌশলের প্রতিটি খুঁটিনাটি

নিয়ম মেনে শুরু হল সেই আক্রমণ। একদল ভারতীয় সেনা সামনে এগিয়ে যেতেই পাকিস্তানী আগ্নেয়াস্ত্রের দৃষ্টি সেদিকে নিবন্ধ হল। আর-একটি দল সেই অবকাশে পাকিস্তানীদের পিলবক্সগুলিকে লক্ষ্য করে সরাসরি হ্যান্ড-গ্রেনেড ছুঁড়তে লাগলেন। শত্রুকে ধোঁকা দিয়ে বিভ্রান্ত করবার জন্যে আমাদের জওয়ানরা সেদিন প্রাণের মূল্য দিতেও এতটুকু কুণ্ঠিত হননি। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বালান নামে আমাদের একজন জওয়ান স্থির করলেন, শত্রুর দৃষ্টিকে তিনি নিজের দিকে আকর্ষণ করবেন, তার অন্যান্য সঙ্গীরা যাতে সেই সুযোগে পাকিস্তানীদের উপরে অতর্কিতে আক্রমণ চালাতে পারেন। ঠিক তা-ই করলেন তিনি। হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ালেন; আর সঙ্গে-সঙ্গেই তাকে লক্ষ্য করে গর্জে উঠল ও-পারের সব কটা আগ্নেয়াস্ত্র। মাটির উপরে লুটিয়ে পড়লেন বালান, কিন্তু সেই সুযোগেই তাঁর সঙ্গীরা ততক্ষণে অতর্কিতে সামনে এগিয়ে গিয়ে পাকিস্তানীদের পিলবক্সের উপরে সরাসরি হ্যান্ডগ্রেনেড ছুঁড়ে মেরেছেন। পাকিস্তানী গোলায় বালান মৃত্যুবরণ করলেন; ওদিকে ভারতীয় জওয়ানের হ্যান্ডগ্রেনেডে পিলবক্সের মধ্যেকার তিন-তিনজন পাকিস্তানী সেনা খতম হয়ে গেল।

পাকিস্তানীদের প্রায় ডজন-খানেক পিলবক্সকে সেই অবিস্মরণীয় রাত্রে আমরা স্তব্ধ করে দিয়েছিলাম। শত্রুরা অতঃপর বুঝল যে, সেতুটিকে না উড়িয়ে দিয়ে আমাদের অগ্রগতি তারা রোধ করতে পারবে না। সেতু উড়িয়ে তারা তখন পিছু হটতে লাগল।

কথা প্রসঙ্গে আমাদের এক সৈন্যাধ্যক্ষ বলছিলেন, 'আর কিছু নয়, দুর্জয় সাহস আর অটল সংকল্পই বার্কিতে আমাদের জয়ী করেছে। তবে হ্যাঁ, আমাদের শত্রুরাও সেদিন জোর লড়াই করেছিল। প্রতি ইঞ্চি জমি কামড়ে তারা সেদিন আমাদের বাধা দিয়েছে।"

ভারতীয় জওয়ানদের পরাক্রম সেই হিংস্র প্রতিরোধকেও সেদিন চূর্ণ করেছে। আমরা বার্কি জয় করতে চেয়েছিলুম। করলুম।

পাকিস্তানীরা সে-রাত্রে আমাদের ঘাটির উপরে মোট ২,৪০০ রাউন্ড গোলা বর্ষণ করেছিল, কিন্তু তাতেও আমাদের বীর জওয়ানদের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়নি। খালের সেতুর কাছে বার্কির থানা। এই থানা এলাকায় শহরের প্রধান রাজপথের উপরে সেদিন প্রচণ্ডভাবে হাতাহাতি লড়াই পর্যন্ত চলতে থাকে। বার্কির দখল নিয়ে সেতুর দিকে ধাওয়া করবার জন্যে আমাদের সৈন্যরা সেদিন জীবনপণ লড়াই করেছেন। তাঁদের সেই শৌর্যের তুলনা হয় না। সেদিনকার লড়াইয়ে নেতৃত্বও ছিল অসামান্য। অকুতোভয়ে আমাদের তিনজন অফিসার সেদিন একটি খোলা জিপে গিয়ে উঠেছিলেন, এবং মাইন-পাতা মাঠের উপর দিয়ে আমাদের ট্যাংকগুলিকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

বার্কির পতন হল। কিন্তু ইছোগিল খাল তখনও আমাদের দখলে আসেনি। জনকয়েক সাহসী অফিসারের নেতৃত্বে আমাদের জওয়ানরা অতঃপর খালের একটি সেতুর দিকে ধাওয়া করলেন।

বার্কি শহর থেকে এই সেতুটি মাত্রই কয়েক শ গজ দূরে। খালপার থেকে পাকিস্তানী রাইফেল তখন ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট চালাচ্ছে। বুলেটের সেই বৃষ্টি-ধারার মধ্যেই আমাদের একজন কর্নেল তাঁর লোকদের নিয়ে খালের দিকে এগিয়ে চললেন। সেতুর কাছে গিয়ে তাঁরা পৌঁছেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেতুর দখল তবু পাওয়া গেল না। শত্রুসৈন্যরা যখন বুঝল যে, ভারতীয় জওয়ানদের ঠেকিয়ে রাখা তাদের সাধ্যাতীত, তখন সেতুটিকে ধ্বংস করে দিয়ে তারা খালের পশ্চিম-তীরে গিয়ে আশ্রয় নিল। পাকিস্তানী দলের তিনজন অফিসার এই সংঘর্ষে আহত হয়। নিহত হয় আটজন সৈন্য। আহতের সংখ্যা তেইশ।

বার্কির লড়াইয়ে মোট ৪৫ জন পাকিস্তানী সৈন্য মারা পড়েছে। আমাদের দিকে একজন অফিসার ও দুজন জে-সি-ও মারা যান। তা ছাড়া আরও ৪৭ জন জওয়ান হতাহত হয়েছেন।

প্যাটন ট্যাঙ্কের শ্মশান

লাহোর যুদ্ধ-সীমান্তের দক্ষিণতম প্রান্ত খেম করন। এরই বিপরীতে পাক এলাকার মধ্যে কাসুর। আক্রমণের প্রথমদিনই আমাদের বাহিনী কাসুর দখল করে নেয়। উত্তর সীমান্তের থেকে এখানকার অব ' একদমই অন্য।

১০ই সেপ্টেম্বরের চূড়ান্ত যুদ্ধের পর, পাকিস্তানী মতলবের যেসব দলিল আমাদের হাতে আসে তাতে দেখা যায় পাকিস্তান বহুদিন ধরেই তাদের এই অঞ্চলে বড় রকমের বদ মতলব আঁটছিল। সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে ত্রিশূলী অভিযানের সব ব্যবস্থাই ওরা করে ফেলেছিল। ত্রিশূলের একটি শূল ভিকিউইন্দ নামে একটি ছোট্ট শহরে পৌঁছবে। এখান থেকেই খালরা ও অমৃতসর যাবার রাস্তা দুদিকে চলে গেছে। দ্বিতীয় শূলটি ডানদিকে বাঁকা হয়ে অমৃতসর ও জলন্ধরের মধ্যে বিপাশা নদীর উপর রেল সেতু দখল করবে আর তৃতীয় শূলটি বাঁ দিকে বেঁকে জন্দিয়ালাগুরু থেকে অমৃতসরকে বিচ্ছিন্ন করবে। উদ্দেশ্য, আমাদের বাহিনী.. সদর দপ্তরকে আলাদা করে ফেলা আর লাহোর সীমান্তে আমাদের সৈন্যদের সঙ্গে যোগসূত্রটুকু ছিঁড়ে দেওয়া। কাশ্মীর সীমান্তে ছাম্ব এলাকায় পয়লা সেপ্টেম্বরের আক্রমণ এই মতলবেরই আর এক দোসর। (কিন্তু নিছক বুদ্ধিমত্তা আর অস্ত্রের সুকৌশল ব্যবহারের সামনে পাকিস্তানকে নাকে খৎ দিতে হল।)

মতলব অনুযায়ী পাকিস্তান তার প্রথম সাঁজোয়া ডিভিশনকে রিউইন্দে মোতায়েন করে। ৬ই সেপ্টেম্বরে খেম করন থেকে ভারত আক্রমণ শুরু করলে পাকিস্তানের এই ডিভিশনটি কাসুর থেকে এগিয়ে আসে। ৭ই সেপ্টেম্বর ওরা পালটা আক্রমণ চালায়। বার্কি বা ডোগরাইয়ে যেভাবে প্রতি-আক্রমণ করেছিল, এখানেও সেইভাবে করে। ৮ই তারিখে পুরো একটা রেজিমেণ্ট ভারী সাঁজোয়া বাহিনী এবং পদাতিক ব্যাটালিয়নকে ওরা নিয়োগ করে।

এই সময় যুদ্ধ করতে করতে আমরা পিছিয়ে আসি, ভাবখানা এমনি যেন হেরে যাচ্ছি। পিছনে ভারী ট্যাংক রেখে আমাদের হালকা ট্যাংকগুলি যুদ্ধ করে। মাঝারি কামান দিয়েই ২২টি প্যাটনকে হত্যা করা হয় এই একদিনেই। আমাদের পিছু হটে যেতে দেখে পাকিস্তান ভাবল কেল্লা ফতে! ওরা হুড়মুড় করে এগিয়ে আসতে থাকে। প্রায় ১৩ মাইল আমাদের এলাকায় ঢুকেও পড়ে। এইভাবে ওরা সর্বনাশের ফাঁদে পা দেয়। কারণ এরপর যা শুরু হল, ২২ দিনের যুদ্ধের সেটাই চরম যুদ্ধ।

মহম্মদপুরা, ডিবাবিপুরা এবং আসালউতার এই তিনটি গ্রামের আশেপাশে আখ, বজরা এবং তুলাক্ষেতের মাঝে ঘাপটি মেরে ছিল আমাদের ট্যাংক আর কামান। ৯ এবং ১০ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান পাঁচবার আক্রমণ চালায়, কামান আর ট্যাংক নিয়ে। আমাদের কামানও তার যথাযোগ্য জবাব দেয়। এরপর ১০ তারিখে ওরা পঞ্চম সাঁজোয়া ব্রিগেড নিয়ে আমাদের ফাঁদে ধরা দেয়। ওদের হটিয়ে দিতে এগিয়ে আসে চতুর্থ সাঁজোয়া ব্রিগেড। পাকিস্তানী আক্রমণের বাম অংশ ডুবিয়ে দেওয়া হল নালার জলে। এই উদ্দেশ্যেই নালাটা কাটা হয়েছিল। এইসব যখন ঘটছে আমাদের বিমানবাহিনী তখন সমানে স্থল-বাহিনীকে সাহায্য করে যাচ্ছে।

শত্রুপক্ষকে ঘিরে, বৃত্তটা ক্রমে ছোট করে আনতে আনতে আমাদের লুকোনো কামানের পাল্লার মধ্যে ওদের এনে ফেলা হয়।

তারপরই শুধু একটা হুকুম শোনা যায় মারো!

১০৬ মিলিমিটার রিকয়েললেস কামান আর হাতবোমার মুঠোর মধ্যে পড়ে পাকিস্তানী সাঁজোয়া বাহিনী সাবাড় হতে শুরু করে। এই সময়ের যুদ্ধেই কোম্পানী কোয়ার্টার-মাস্টার হাবিলদার আবদুল হামিদ তিনটি প্যাটন খতম ও চতুর্থটিকে অকেজো করে অতুলনীয় বীরত্বের দৃষ্টান্ত রাখেন।

পাকিস্তানের পঞ্চম আক্রমণের সময়ই ওদের প্রথম সাঁজোয়া ডিভিশনের জি.ও.সি. মেজর-জেনারেল নাশির আমেদ খান এবং গোলন্দাজ বাহিনীর কম্যাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার এ. আর. শামিন নিহত হন। এই সময় ওদের সদর দপ্তরে যে খবর পাঠান হয় আমাদের গোয়েন্দা বেতারে তা ধরা হয়। খবরে ছিল, "হামারে সব সে বড়া ইমাম মরে গ্যয়ে।" বন্দী এক পাকিস্তানী

রিশালদারও নাসির খানের মৃত্যুর খবরটি স্বীকার করে। চারটি প্যাটন ওর মৃতদেহটি ঘিরে ফেলে তুলে নেয়। শামিনের মৃতদেহ আমাদের বাহিনী কুড়িয়ে এনে সামরিক মর্যাদায় কবর দেয়।

আসলউত্তর-এর যুদ্ধে পাকিস্তানের প্রথম সাঁজোয়া ডিভিশনটি চূর্ণ হয়ে যায় এবং চতুর্থ ক্যাভালরি সমেত দুটি রেজিমেণ্ট নিশ্চিহ্ন হয়। আসলউত্তর কথাটার হিন্দি এবং উর্দু অর্থ "খাঁটি জবাব"—এমন সার্থকনামা গ্রাম ভারতে আজ আর দুটি নেই। পাকিস্তান ৯৭টি ট্যাংক হারায় এই একটি যুদ্ধেই, তার বেশির ভাগই প্যাটন। এর মধ্যে ৯টিকে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং দুটি লোকজন সমেত আত্মসমর্পণ করে। দুজন লেফটান্যাণ্ট-কর্নেল. ছয়জন মেজর, ছয়জন অন্যান্য অফিসার এবং আরো কিছু পদস্থ লোক ধরা পড়ে।

আসলউত্তরের এই যুদ্ধ যা খেম করন যুদ্ধ নামে অভিহিত হয়েছে, এর সর্বাধিক তাৎপর্য. পাকিস্তানের মতলব হাসিলের ব্যর্থতায়। পাঞ্জাবের বড় একটা অংশকে বিচ্ছিন্ন করতে তারা পারল না। বরং ১৩ মাইল এগিয়ে আসার পর ১১ মাইল পিছিয়ে যেতে হল। যুদ্ধবিরতির সময় খেম করন সমেত মাত্র ২০ বর্গমাইল তাদের দখলে রয়ে যায়।

শিয়ালকোট সীমান্তে

৭ই সেপ্টেম্বর জম্মুর রণবীরসিংপুরার কাছে তিনটি অঞ্চল দিয়ে আমাদের জওয়ানরা বিমান এবং সাঁজোয়া বাহিনীর সাহায্যে শিয়ালকোট সীমান্ত পার হয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করে। সম্প্রতি গঠিত ষষ্ঠ সাঁজোয়া ডিভিশনকে পাকিস্তান ওখানে এনে রেখেছিল জম্মু-কাশ্মীর এলাকায় দ্বিতীয় আক্রমণ চালাবার জন্য।

আমাদের দুটি ইনফ্যান্ট্রি দল মহারাজকে দখল করে সুচেতগড়ের দিকে এগোয়। সাঁজোয়া বাহিনী শিয়ালকোট জেলার চাওয়া গ্রামটি দখল করে দক্ষিণে ফিলোরার দিকে এগোয়। শিয়ালকোটের দক্ষিণ-পূর্বেই ফিলোরা। তখন বদিয়ানা, পাসরুর থেকে ষষ্ঠ সাঁজোয়া ডিভিশনকে পাকিস্তান সরিয়ে আনে আমাদের মোকাবিলা করার জন্য। সীমান্ত জুড়ে চলে এমন ট্যাংক যুদ্ধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যার তুল্য আর দেখা যায়নি। ১৫ দিন সমানে লড়াই চলে। সবথেকে বড় যুদ্ধ হয় ১১ই সেপ্টেম্বর ফিলোরায় এবং ১৪ই সেপ্টেম্বর কলারওয়ান্দায়।

পাকিস্তান ছয়-সাত রেজিমেণ্ট সাঁজোয়া বাহিনীকে এই যুদ্ধে নামিয়েছিল। তাতে ছিল শেরম্যান, শ্যেফ, প্যাটন এম—৪৭ এবং এম—৪৮ ট্যাংক।

বহু প্যাটনই ছিল সদ্য তৈরী, অল্প মাইল মাত্র চলেছে। প্রথম দিন ওদের ২০টি, আমাদের ১০টি ট্যাঙ্ক নষ্ট হয়। পরের দু'দিন লড়াইয়ের তেজ মৃদু থাকে। সে-সময় ওদের কয়েকটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়, আমাদের একটিও না।

আমাদের ট্যাঙ্ক বহরের প্রাথমিক অগ্রগতির হার এত দ্রুত ছিল যে লরীবাহিত ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড তার সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি। ফলে পাশের দিক থেকে আঘাত আসায় আমাদের কিছু ক্ষতি হয়। কিন্তু প্রথম কয়েক-দিনের এই অসুবিধা থেকে সেনাপতিরা চটপট ব্যাপারটা বুঝে ফেলে অগ্রগতির হারে সমতা আনেন। ১০ই সেপ্টেম্বর আবার ফিলোরা অভিমুখে যাত্রা শুরু হয়।

এবারে আরম্ভ হল সবথেকে বড় ট্যাঙ্ক যুদ্ধ—ব্যাটল অফ ফিলোরা। পশ্চিম পাকিস্তানের শিয়ালকোট জেলার ঠিক মাঝখানে ফিলোরা, পাক-বাহিনীর প্রধান নিয়োগ কেন্দ্র। বিশেষজ্ঞরা পরে এই যুদ্ধকে মিশর মরুভূমিতে জর্মন জেনারেল রোমেলের সঙ্গে বৃটিশ জেনারেল বিচির যুদ্ধের তুলনা দেন।

আয়ুবের সুদক্ষ ষষ্ঠ সাঁজোয়া ডিভিশনের 'ওয়াটারলু' হল এই ফিলোরা। প্যাটনের মাথায় বসে আয়ুব সাহেব দিল্লির রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার কবরপ্রাপ্তি হয় এখানেই।

ফিলোরা যুদ্ধে ভারত অনেক বীরের সাক্ষাৎ পায় তাঁর অফিসার ও জওয়ানদের মধ্যে। তবে বীরের মধ্যে বীর ছিলেন মেজর জেনারেল রাজেন্দ্র সিং। যে ভারতীয় ডিভিশন শত্রুর সাঁজোয়া শিরদাঁড়াটি ভেঙে দেয় তিনি হলেন তার সেনাপতি। মিশর মরুভূমিতে রোমেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী এই দুর্বল চেহারার ভারতীয় সেনাপতি জেনারেল "স্প্যারো" (চড়ুই পাখি) নামেই পরিচিত। পাকিস্তানী সেনাপতিদের মত মার্কিন কায়দায় হেলিকপটার থেকে সৈন্য পরিচালনায় ইনি মোটেই বিশ্বাসী নন। জওয়ানদের সঙ্গে ট্যাঙ্কে বসে, তাদের মতই পোষাক পরে ইনি তাদের একজন হয়েই যুদ্ধ পরিচালনা করেন। কাশ্মীর পাহাড়ে জোজিলায় কয়েক বছর আগে ট্যাঙ্ক উঠিয়ে এনে ইনি পাকিস্তানীদের হতভম্ব করে দিয়েছিলেন।

পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, তাঁর প্রধান হাতিয়ার ছিল আচমকা আক্রমণ। তার আসল উদ্দেশ্য কী সেটা কখনোই শত্রুপক্ষকে জানতে দেননি। ১১ই সেপ্টেম্বরের আগে পর্যন্ত পাকিস্তানীরা টেরও পায়নি কী ঘটতে চলেছে। তার পরই হঠাৎ তিনি দলবল নিয়ে শত্রুব্যূহের একেবারে মধ্যিখানে হাজির হয়ে, ডাইনে-বাঁয়ে গোলাবর্ষণ করে ওদের ছিন্নভিন্ন করে দেন। এই দিন আমাদের ছয়টি এবং পাকিস্তানের ৬৭টি ট্যাঙ্ক ঘায়েল হয়।

আচমকা এই আক্রমণে পাকবাহিনী দিশাহারা, ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

হেলিকপটরে ওদের দুজন অফিসার উড়ে আসেন ট্যাঙ্কগুলিকে সামাল দেবার জন্য। কিন্তু তখন আর তাদের কিছু করার ছিল না। বেলা সাড়ে তিনটার সময়ই জওয়ানরা তাঁকে রিপোর্ট দেন, "স্যার, ফিলোরা হামারা।"

উত্তর থেকে দক্ষিণে লাহোর এবং শিয়ালকোটের মধ্যে প্রধান যে রেল ও সড়ক বন্ধন ফিলোরাই তার নিয়ন্ত্রক। এর দক্ষিণে গুরুত্বপূর্ণ রেলজংশন পাসরুর। এখানে একটা জোর ধাক্কা দিলেই উত্তর লাহোরের প্রতিরক্ষা ধ্বসে পড়বে। তার ফলে গুজরাওকল এবং ওয়াজিরাবাদ বিপন্ন হবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে দুটি আলাদা যুদ্ধমঞ্চে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এরই ফলপরিণতি, ছাম্ব এবং জাওরিয়নে পয়লা সেপ্টেম্বর বিশ্বাসঘাতকতা করে আন্তর্জাতিক রেখা ডিঙিয়ে পাকিস্তানের যে বাহিনী আমাদের জমিতে ঢুকে পড়ে, তাদের কচুকাটা করার জন্য অসহায় অবস্থায় পাওয়া। এ সবই ঘটত, আয়ুব-বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত যদি না 'যুদ্ধবিরতি' তাদের রক্ষা করত।

ফিলোরার যুদ্ধে আমাদের ট্যাংক বাহিনীর সাফল্যের অন্যতম কারণ সামগ্রিক রণকৌশল এবং পদাতিক বাহিনীর সাহসিকতা। শিয়ালকোট খণ্ডের মধ্য ও উত্তর ভাগে শত্রুর এক বিরাট অংশকে ব্যস্ত রেখে এরা বিরাট সাহায্য করেন। আমাদের একটি পদাতিক ডিভিশন উত্তর দিক দিয়ে শিয়ালকোট শহরের দিকে এগোন মৃত্যুকে উপেক্ষা করেই। পাকিস্তানের তিনটি পদাতিক ব্রিগেড এবং দুটি ট্যাংক রেজিমেণ্টকে শহর রক্ষায় এঁরা হিমসিম খাইয়ে দেন। এই কৌশল অবলম্বনের ফলে, পাকিস্তানের প্রধান ট্যাঙ্ক বাহিনীর থেকে পদাতিক বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে দক্ষিণভাগে ফিলোরায় ওদের ট্যাঙ্কগুলিকে ধ্বংস করবার কাজে অনেক সুবিধা হয়।

কোর কম্যান্ডার লেঃ জেঃ প্যাট্রিস ডান, এই খণ্ডে আমাদের জয়ের কারণ হিসাবে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। (ক) উন্নত নেতৃত্ব। (খ) উন্নত রণকৌশল। (গ) উন্নত অস্ত্রশিক্ষা। (ঘ) অফিসার ও জওয়ানদের অনন্য রোখ ও দৃঢ়তা। ওঁর কথায় "পাকিস্তানকে কষে ধোলাই দেওয়া হয়েছে।" এই খণ্ডে পাকিস্তান ২৪৩টি ট্যাঙ্ক খুইয়েছে।

যুদ্ধ বিরতির পূর্ব মুহূর্তে এই খণ্ডের তুমুল লড়াইটা প্রায় ঝিমিয়ে এসেছিল। আমাদের বাহিনী শিয়ালকোট-পাসরুর রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে শিয়ালকোটকে এখন দক্ষিণ দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন। উত্তর দিকে শিয়ালকোট-চাপরার রোড বিপর্যস্ত। পূর্বদিকে, শিয়ালকোট শহর থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরে কালারওয়ান্দা গ্রামে আমাদের জওয়ানরা ঘাঁটি গেড়ে বসে আছেন। এখান থেকে শহরের গির্জার উঁচু চূড়া দেখা যায়।

অর্ধবৃত্তাকারে ৩০০ বর্গমাইল ভূখণ্ডে প্রায় ২০০টি গ্রাম এখন আমাদের তাঁবে। গুরুত্বপূর্ণ রেল জংশন চাওইন্দা-র ঘাড়ের উপর এখন আমাদের বাহিনী

বসে আছে। যুদ্ধ বিরতির সময়, ছাম্ব-জাওরিয়ান খণ্ডের ভারতীয় এলাকায় পাকিস্তান বাহিনী বলির পাঁঠার মত শুধু অপেক্ষা করছিল মরণের।

যুদ্ধ বিরতির দুদিন পর একদল সাংবাদিক ফিলোরায় আসেন। ভারতীয় অফিসার ও জওয়ানদের সঙ্গে তাঁদের কথাবার্তা হয়। আমাদের সেনাবাহিনীর লোকদের ধারণা, যুদ্ধ বিরতির ফলে প্রকৃত শান্তি এখনো আসেনি। যুদ্ধ বিরতির কথা শুরু হওয়ার পরই, মরীয়া হয়ে ওরা কয়েকটি জায়গা থেকে আমাদের হটাবার চেষ্টা করে যুদ্ধবিরতি বলবৎ হবার আগেই। ওদের প্রধান চেষ্টাগুলির অন্যতম ছিল শিয়ালকোট-পাসরুর রেল লাইন ভারতীয় বাহিনীর দখল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া। একবার ওরা ট্রেন চালাবার চেষ্টাও করে। আলহার নামে একটি স্টেশন আমাদের দখলে। সেখানকার ভারতীয় কম্যাণ্ডার পাকিস্তানীদের সাবধান করে দেন যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করে ট্রেন না চালাতে। পাকিস্তান ট্রেনটিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়, কারণ ভারতীয় বাহিনী গুলি ছোঁড়ার জন্য তৈরী হয়ে থাকেন। রেল লাইনের কিছুটা অংশ এখন আমাদের বাহিনী উড়িয়ে দিয়েছেন।

পাকিস্তানের গ্রামগুলোকে দেখি খাঁখাঁ করছে। ভারতেব দখলে আসার পর পাকিস্তান বাহিনীই বোমা ফেলে নিজেদের বহু গ্রাম ধ্বংস করেছে। বহু গ্রামে আগুন তখনো জ্বলছে। মহারাজকে গ্রামের মসজিদটি বোমায় ধ্বংস হয়েছে। যেসব শিশু ও বৃদ্ধদের ফেলে রেখে পাকিস্তানীরা পালায়, আমাদের জওয়ানরা নিরাপদ অঞ্চলে তাদের সরিয়ে এনেছে। এখন ভারত সরকার তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেছেন।

পরিত্যক্ত বহু গ্রামে দেখেছি, বাড়ির মধ্যে মজবুত বাঙ্কার। অর্থাৎ বহুদিন ধরেই পাকিস্তান যুদ্ধের মতলব আঁটছিল। এইসব বাঙ্কার থেকেই ভারতীয় বাহিনীর উপর চোরাগুলি ছোঁড়া হয়। একটি গ্রামে রাস্তার উপর এক দেয়ালে দেখি বড় বড় করে লেখা : ভারত।

অথচ এরই এক সপ্তাহ আগে যুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছে, তখন কয়েকটি গ্রামে গেছলাম। তখন একদম অন্য ব্যাপার - শুধু কামান গর্জন, মেসিনগানেব কটকটানি আর আকাশে জেট-এর কর্কশ চীৎকার। আর এখন সেখানে শুধুই স্তব্ধতা—অস্বস্তিকর স্তব্ধতা।

কলারওয়ান্দার যুদ্ধ

শিয়ালকোট সীমান্তে আর যে যুদ্ধটি খ্যাতিলাভ করেছে, তা কলার-ওয়ান্দায়। জম্মু-শিয়ালকোট খণ্ডের উত্তর ভাগের এই যুদ্ধ পাক বাহিনীর

"দিয়েন বিয়েন ফু" হয়ে দাঁড়ায়। ১৪ই সেপ্টেম্বর যুদ্ধ শুরু হয়ে তিনদিন ধরে চলে।

এখানকার যুদ্ধটা ছিল গ্রামের উঁচু জমি দখল করা নিয়ে। তিনদিন পর পাকিস্তান রণে ভংগ দেয়। ভারতীয় সেনাপতির সঙ্গে পরে দেখা হওয়ায় তিনি বলেন, কলারওয়ান্দা দখল করার পর তাঁর সমস্যা হয়, শত্রুকে খুঁজে বার করা। কারণ ওরা খালি পালিয়ে লুকোতে শুরু করে। ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকেই পাকিস্তানীরা শিয়ালকোট শহরে জমায়েত হতে থাকে শেষরক্ষার যুদ্ধ করতে।

কলারওয়ান্দায় যুদ্ধ শুরু হয় ১৪ই সেপ্টেম্বরের রাত্রে। ট্যাঙ্কের সাহায্য ছাড়াই আমাদের কিছু পদাতিক গ্রামের উঁচু জমি দখল করতে এগোয়। কিন্তু ভীষণভাবে বাধা পাওয়ায় পিছিয়ে আসেন। পরদিন রাত্রেই ট্যাঙ্ক এবং কামান এসে পড়ে এবং আমরা জমিটি দখল করে শক্ত হয়ে বসি। ১৬ই এবং ১৭ই এই দুদিন পাকিস্তান ভারী কামান আর বিমান নিয়ে নাগাড়ে আঘাত হেনেও আমাদের একচুলও হটাতে পারেনি। বরং ওদেরই হটতে হল ৭০টি মৃতদেহ ফেলে রেখে। আর কত মৃতকে যে পাচার করেছে তার ইয়ত্তা নেই। এ যুদ্ধে আমাদেরও হতাহত হয়েছে। একজন তরুণ কোম্পানী কম্যান্ডার মারা গেছেন। শত্রুর অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণের আচ্ছাদন হিসাবে পালটা জবাব দেওয়ার মত কিছু যখন ছিল না তখনো আমাদের জওয়ানরা একটুও টলেননি। এ সাহসের তুলনা হয় না।

এ রকম সাহস শুধু এখানেই নয়, সীমান্তের সবখানেই আমাদের জওয়ানরা দেখিয়েছেন। জম্মু-শিয়ালকোটের উত্তরভাগের মেজর জেনারেল থাপার আমাকে বলেন, ৭ই এবং ৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রে যখন তিনি বাহিনী নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করেন, পাকিস্তান বিদেশ থেকে পাওয়া এমন সব ভারী অস্ত্র নিয়ে তখন প্রত্যাঘাত শুরু করে যার কোন জবাব দেবার উপায় ছিল না। একমাত্র অতুলনীয় সাহস সেদিন ছিল আমাদের প্রধান হাতিয়ার। এরপর পুরো একটা ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্ট আর বিমান নিয়ে ওরা চারবার আমাদের উপর আঘাত হানতে আসে। আমাদের ৩০০ গজের মধ্যেও ওরা হাজির হয়। এসবই আমরা হটিয়ে দিই। তারপর শুরু হয় আমাদের আক্রমণ। ওদের তিনটি পদাতিক ব্রিগেড ও দুটি ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্টকে কোণঠাসা করে ফেলি। শত্রুর প্রধান ট্যাঙ্ক বহরকে পদাতিক বাহিনীর থেকে বিচ্ছিন্ন করার যে রণকৌশল আমরা জম্মু-শিয়ালকোট সীমান্তের দক্ষিণভাগে অবলম্বন ক..., তারই পরিণতি উত্তরভাগের এই জয়।

শিয়ালকোট সীমান্তে আমাদের আক্রমণ আবার শুরু হয় ১৮ই ও ১৯শে সেপ্টেম্বর। ২২শে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর থেকে শিয়াল-কোট শহরকে ঘিরে ফেলি। যুদ্ধবিরতির সময় শিয়ালকোটের নাভিশ্বাস উঠেছিল। মেজর জেনারেল থাপার সাফল্যের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

শত্রুর উন্নত কামান ও ট্যাঙ্কের সামনে "আমার ছেলেদের সাহস আর বীরত্বই সবকিছুর ফয়শালা করেছে।"

কলারওয়ান্দায় দাঁড়িয়ে শিয়ালকোট শহরের গীর্জার চূড়া দেখলাম। পাকিস্তান বাহিনী কয়েকশো গজ দূরেই। ওদের সামনে আমাদের গোলার ঘায়ে বিধ্বস্ত তিনটি শেফ ট্যাঙ্ক মুখ থুবড়ে পড়ে যুদ্ধ ফলাফলের সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করে চলেছে।

ডোগরাই-ওয়াগা খন্ডের যুদ্ধ

আমাদের ওয়াগা সীমান্ত থেকে ৭-৮ মাইল দূরে ইছোগিল খালের উপর ছোট্ট শহর ডোগরাই। ২৩শে সেপ্টেম্বর ভোর সাড়ে তিনটেয় যুদ্ধবিরতি বলবৎ হবার আগের দুই রাত্রে এখানে মারাত্মক যুদ্ধ হয়। এটাই ছিল যুদ্ধ-বিরতির আগে শেষ বড় যুদ্ধ।

তখন যুদ্ধবিরতির জন্য চারদিকে কথা উঠেছে। পাকিস্তান ভাবল, ভারত বোধহয় এইবার কিছুটা আলগা দেবে। এখন জোর আক্রমণ করে ভারতকে পাকিস্তানের ভেতর থেকে সীমান্ত পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যাওয়া যাবে।

৬ই সেপ্টেম্বরই ওয়াগা থেকে আমরা পাকিস্তানের মধ্যে প্রবেশ করি। ৭ই থেকেই ওরা ব্যর্থ চেষ্টা করে যায় আমাদের রুখতে। আক্রমণ আর প্রতি-আক্রমণ, আমাদের অগ্রগতি আর পাকিস্তানের পলায়নের চিহ্ন ওয়াগা পর্যন্ত গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের দুধারে ছড়ানো- দগ্ধ গাড়ি, অকেজো প্যাটন ও শ্যেবম্যান ট্যাঙ্ক আর গোলার আঘাতে অর্ধবিধ্বস্ত ওয়াগা শহর।

২১-২২ সেপ্টেম্বরে আমরা ঠিক করি আর ওদের আক্রমণ চালাবার সুযোগ দেওয়া হবে না। পিলবক্সের আড়ালে এবং ইছোগিল খালের দ্বারা শত্রুরা সুরক্ষিতই ছিল। ডোগরাই-এ প্রবেশের মুখেই খাল থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে ছিল পিলবক্স। চায়ের দোকানের ছদ্মবেশ পরিয়ে এগুলো লুকোনো ছিল।

ডোগরাই-এর কিছু দূরে পাকিস্তানের একটা গোলন্দাজ ও একটা পদাতিক ব্যাটালিয়নকে আমাদের একটা ছোট ইউনিট যুদ্ধে ব্যস্ত রাখে। ওদের ছিল ট্যাঙ্ক, রিকয়েললেস গান, মরটার আর অজস্র অটোমেটিক রাইফেল। এর বিরুদ্ধে আমাদের খুদে বাহিনীটি লড়ে চলে। যখন এই লড়াইয়ে শত্রুপক্ষ ব্যস্ত, তখন গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের দুধার দিয়ে পরিত্যক্ত গ্রামের মধ্য দিয়ে ঘুরে গিয়ে আমাদের দুটো বাহিনী আচমকা দু পাশ দিয়ে শত্রুকে চেপে ধরে সাবাড় করে। কয়েকজন মাত্র খাল পেরিয়ে পশ্চিমে সেতুটি ধ্বংস করে দেয়। ওদের

নিজেদের পোঁতা মাইনেই অনেকে মরে। প্রায় ডজনখানেক চালু জীপ আর একটি প্যাটন সমেত এগারোটি ট্যাঙ্ক আমাদের হস্তগত হয়। আরো এক ডজন প্যাটন এবং শ্যেরম্যান আমরা নষ্ট করে দিই। পাকিস্তান হারায় ৩৪৫ জনকে, ধরা পড়ে ১০১। তার মধ্যে ছিল, কর্নেল গোলওয়ালা (এরই অধীনে ছিল অষ্টম ও ষষ্ঠদশ পাঞ্জাব এবং দ্বাদশ সীমান্ত বাহিনী), মেজর বেগ এবং কিছু জুনিয়ার অফিসার।

বেগ পরে বলেন, "মার্কিন দেশ থেকে আমি যুদ্ধ শিক্ষা করেছি কিন্তু ভারতীয় গোলন্দাজদের এমন নিখুঁত গোলা ছোঁড়ায় হতভম্ব হয়ে যাই।"

এই যুদ্ধে আমাদের জওয়ানদের যে সাহস ও শৌর্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তা দিয়ে রূপকথা তৈরী হতে পারে। মেজর আশারাম ত্যাগী মৃত্যুবরণের আগে নিজেই দুটি শত্রু ট্যাঙ্ক খতম করেন। চার বছর আগে তিনি সেনা-বাহিনীতে যোগ দেন। মৃত্যুর মাত্র তিন মাস আগে বিয়ে করেছিলেন।

পাকিস্তানী পিলবক্স ধ্বংস করার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিলেন এমন দুজন জওয়ানের কথা শুনেছি। অন্ধকার রাতে হামা দিয়ে ওঁরা দুজন এগিয়ে যান। পিলবক্সের ফোকর দিয়ে হাতবোমা ফেলে দেন। ভিতরের লোকেরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। পরদিন সকালে পিলবক্সের কয়েক হাত দূরে এই দুই জওয়ানের মৃতদেহ পাওয়া গেল। মুঠোয় হাতবোমা।

সমগ্র সীমান্তে এখন এই প্রতীক। হাতিয়ার হাতে ভারতীয় জওয়ানরা সতর্ক রয়েছেন। এ যুদ্ধবিরতি ভারী অস্বস্তিকর।

স্যাবার-হন্তা প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় বৈমানিকগণ এবং পশ্চিম সীমান্তের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিমানঘাটির অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে আমাদের প্রায় ছয় ঘণ্টা আলাপ-আলোচনার পর দুটি বিষয় পরিষ্কার বোঝা গিয়েছে ১। ভারতের এখন আর অন্তত কিছুদিনের জন্য মার্কিন স্যাবার জেট বিমান অথবা এফ ১০৪ ধরনের উচ্চশ্রেণীর বিমান ভিক্ষা করার প্রয়োজন নেই। ২। ভারতীয় বিমান বাহিনীকে অবিলম্বে নৈশযুদ্ধ এবং শত্রুকে বাধাদানের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন।

আমি ভিতরের ও বাইরের সমস্ত বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ অফিসারদের মধ্যে যে সব তরুণ বৈমানিক পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে অসমসাহসিক বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন এবং যথোচিত পুরস্কার গ্রহণ করেছেন তাঁদের সঙ্গেও আলাপ করেছি। এই আলাপ-আলোচনার পর আমার যা মনে হয়েছে তা শুরুতেই বলে নিলাম। আমার ধারণা, আমাদের দলে যে সব সাংবাদিক ছিলেন তাঁদের কেউ আমার সঙ্গে দ্বিমত হবেন না।

সাংবাদিকগণ এই প্রথম আমাদের বিমান বাহিনীর ঘাটিগুলি পরিদর্শন করলেন। দেরিতে হলেও একথা দেশবাসীকে জানতে দেওয়া উচিত যে, আমাদের বৈমানিকগণ শুধু পাকিস্তান বিমান বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করেন নি, তাঁরা পাক ছত্রী বাহিনীর আক্রমণ থেকে আমাদের দুটি ঘাটিকেও রক্ষা করেছেন। এই প্রশংসনীয় কাজে ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারিগণেরও (মেকানিক্স, ইনজিনিয়ার প্রভৃতি) কৃতিত্ব আছে।

সাংবাদিকগণ, বিশেষত মার্কিন সংবাদ সরবরাহ এজেন্সীর একজন সাংবাদিক, আদমপুরের গ্রুপ ক্যাপটেন লয়েড, হালওয়ারার গ্রুপ ক্যাপটেন জন এবং ব্যুচকে পাক বিমান বাহিনীর মারাত্মক অস্ত্রসজ্জিত স্যাবার জেট বিমানের সঙ্গে যুদ্ধ সম্পর্কে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাপ্রকার প্রশ্ন করেছেন। এই যুদ্ধে ভারতীয় জেট বিমানগুলি যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছে তার জন্য তিনজন অফিসারই বেশ গর্বিত।

একজন আমেরিকান সাংবাদিক আমাদের কমান্ডিং অফিসারদের জিজ্ঞাসা করলেন, কী কারণে পাকিস্তানের স্যাবার জেট ভারতীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারেনি।

অফিসারদের মতে পাকিস্তানীদের ব্যর্থতার তিনটি প্রধান কারণ : (১) দক্ষতার অভাব, (২) অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং (৩) মানবিক অসুবিধা।

৬ সেপ্টেম্বর যুদ্ধের আকার ঘোরালো হয়ে ওঠার পরেই পাকিস্তান পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আদমপুর এবং হালওয়ারা বিমান ঘাটিতে অন্তর্ঘাত-মূলক কাজের জন্য ছত্রী সৈন্য নামিয়ে দেয়। কোথায় কী কী ধ্বংস করতে হবে তার যথাযথ নির্দেশপত্র ছত্রীদের সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পেশোয়ার থেকে প্রেরিত ছত্রীদের সঙ্গে নানা রকম অস্ত্রশস্ত্রও ছিল।

আশ্চর্যের কথা, ধৃত ছত্রীদের দেহ তল্লাসী করতে গিয়ে দেখা গেল, ওদের মধ্যে তিনজন নারী। ওদের বোধহয় "কমফরট্ গারল" হিসাবে পাঠানো হয়েছিল।

পাক ছত্রী সৈন্যদের সব পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে গিয়েছিল। গ্রুপ ক্যাপটেন লয়েড ছত্রীদের ধরার ব্যাপারে স্থানীয় জনগণের সতর্ক তৎপরতা ও সক্রিয় সাহায্যের ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

আদমপুর আর হালওয়ারা—দু জায়গাতেই ছত্রীদের কাছ থেকে সংগৃহীত রাইফেল, স্টেনগান, ৬০ মিলিমিটার মরটার, হ্যান্ড গ্রেনেড, অ্যানটি-ট্যাঙ্ক রকেট, ওয়ারলেস সেট ইত্যাদি দেখেছি।

অন্যান্য বস্তুর মধ্যে হালওয়ারায় এক টুকরো কাগজই আমাদের বেশি আকর্ষণ করলো। কাগজখানা জনৈক ছত্রী সৈন্যের প্রতিজ্ঞাপত্র, উর্দুতে লেখা। বার বার আল্লার নাম করে ছত্রী মহম্মদ ইয়াকুব এর গোপন প্রতিজ্ঞার কথা ফাঁস না করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এই প্রতিশ্রুতি পত্র লেখা হয়েছে ৫ সেপ্টেম্বর বেলা তিনটের সময়।

বলা বাহুল্য, ইয়াকুবের মতো অনেকেই তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি।

ভারতীয় বিমানবাহিনীর আমাদের ছিপছিপে তেজী ছেলেরা শত্রুর বিমানবাহিনীর মনে মৃত্যুভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। গুণে এ'রা চিতাবাঘের মত—চটপটে, নীরব, অথচ ধ্রুবলক্ষ্যেই তাঁরা আঘাত হানতে পারেন।

সেইজন্যই কি আমবালা বিমানঘাটির হলঘরে, একটি পূর্ণাবয়ব চিতাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে?

পুরস্কারবিজয়ী কীলর-ভাইদের মত এই সব উড়ন্ত চিতা—ন্যাব, মজুমদার, সান্ধু, জাতার, হান্ডা ও অন্য অনেকের চোখই তারার মত জ্বল-জ্বল করে। তাঁদের সঙ্গে কথা বলেই বুঝতে পেরেছি এই সব বীর বৈমানিক মনের দিক থেকে ভয়ঙ্কর সজাগ। সব কিছু সহজ সরলভাবে নিয়ে সর্বদিকে সমন্বয়সাধনের সামর্থ্য তাঁদের অসাধারণ। আকাশে বিমান নিয়ে উঠতে সর্বদাই তাঁদের এই গুণের সদ্ব্যবহার হয়। কেন তাঁরা পাক বিমানবাহিনী আর প্যাটন ট্যাঙ্কের কপালে মরণ হয়ে দেখা দিয়েছিলেন, তা টের পেলাম।

অথচ বাইরে থেকে দেখতে তাঁরা মোটেই বীরের মত নয়। আমি কীলর ভাইদের বড়জন ড্যানজেলকে এই প্রশ্ন করতে স্যাবার-ঘাতক মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন, 'আমি বীর নই—সবটাই দল বেঁধে এক সঙ্গে কাজ করা সুফল।'

আমি বললাম, 'আপনি সত্যিই আমাদের মত লক্ষ লক্ষ মানুষের চো' বীর।'

ভারতীয় বিমানবাহিনীর অন্য বৈমানিকদের মতই কীলর ভাইরাও বিমা- যুদ্ধে গিয়ে একই অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছেন। তা হল, পাক বৈমানিকরা এগিয়ে এসে লড়াই করতে একেবারেই অনাগ্রহী।

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ন্যাব বললেন, 'কারণটা কী, তা জানি না। সব সময়েই দেখেছি—তাঁরা আমাদের এড়িয়ে দূরে পালিয়ে যেতেই ব্যস্ত। নিশ্চয় ভীষণ ভয় পেয়েছিল—নয়ত, তাঁদের দূরে দূরেই থাকতে বলা হয়েছিল।'

দেখতে একেবারেই কলেজের ছেলে, স্কোয়াড্রন লীডার মালিক বললেন, 'একবার আমরা আচমকা স্যাবার জেটের সহজ লক্ষ্য হয়ে পড়েছিলাম। পিছন থেকে বেশ ভালভাবেই তাঁরা আমাদের আক্রমণ করতে পারত। তখনও তাঁরা শঙ্কিত অবস্থায় পালিয়ে যায়।'

ন্যাব আর তাঁর স্কোয়াড্রনের সঙ্গী ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রাঠোর বড় বড়
; অভ্যস্ত নন। তাঁদের হানটার বিমান দিয়ে কীভাবে তাঁরা দু'টি
ট শিকার করেছিলেন, সংক্ষেপে ছোট ছোট শব্দে ন্যাব তা বললেন :
মান থেকে প্রায় ৬ হাজার ফুট দূরে একটা রূপোলি জিনিস দেখতে
রাঠোর ডান দিকে গেল—আমি বামে। রাঠোর একটা পেল। আমি
নিয়ে পড়লাম। প্রথমে আমার হালকা কামান থেকে গোলা দেগে

দিলাম। স্যাবার জেট বিমানটি উপরে উঠে গেল। কিন্তু আমার কামান তাকে পাল্লার ভিতরেই পেয়ে গেল।'

পাঞ্জাবের আকাশে তিন মিনিটের ওই যুদ্ধ ন্যাব এই ভাষায় বলে গেলেন।

কলকাতার কাছে বেলুড়ের ব্রজনন্দ রায় বিমানবাহিনীর আর-একটি জ্বলজ্বলে তারা। তাঁর বাবা বেলুড় কলেজে পড়ান। সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করতে তিনি ছাম্ব ও শিয়ালকোটে লড়াইয়ে নেমে রকেট ছুঁড়ে কামান চালিয়ে কয়েকটি প্যাটন ট্যাংক ধ্বংস করেন।

রায় বললেন, যুদ্ধের সময় পাকিস্তানী বৈমানিকদের তিনি মার্কিন চিহ্ন দেওয়া স্যাবার জেট নিয়ে উড়তে দেখেছেন।

কলকাতার ফ্লাইং অফিসার চাকলাদার বললেন, তিনিও একবার মার্কিন চিহ্ন দেওয়া একটি স্যাবার জেট দেখেছেন।

হালওয়ারা বিমানঘাটিতে আমাদের একটি স্যাবার জেটের কিছু অংশ দেখানো হল। দেখলাম, পাকিস্তানীরা মূল পাকিস্তানী চিহ্ন মুছে সেখানে ভারতীয় চিহ্ন লাগিয়েছিল।

ভারতীয় বৈমানিকদের বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কী কারণে পাক বিমানবাহিনী এই পথ নিয়েছিল, তা জানা যায়নি। কিন্তু এভাবে ভারতীয় বৈমানিকদের ঠকানো যায়নি।

আর একটি চিতার সঙ্গে কথা হল। স্কোয়াড্রন লিডার জাতারেব বাড়ি মহারাষ্ট্রের পুণায়। তিনি বীরচক্রে সম্মানিত হয়েছেন।

'৬ সেপ্টেম্বর স্যাবার জেট শিকার করার পর কেমন লেগেছিল আপনার?'

'কেমন লেগেছিল? এমন একটি সুযোগের জন্য ভারতীয় বিমানবাহিনীতে আমি দীর্ঘ ১১ বছর অপেক্ষা করে ছিলাম। আমার ট্রেনিং ও বিদ্যাবুদ্ধির সদ্ব্যবহারের জন্য আমি অপেক্ষা করেছিলাম।'

'আপনার সাফল্যের রহস্য কী?'

'রহস্য হল ভারতীয় বিমানবাহিনীর ট্রেনিং।'

'শিকারের ঠিক পরেই প্রথমে আপনার মনে কী এসেছিল?' দীর্ঘদেহী, ফরসা, সদাহাস্যময় অফিসার বললেন, 'প্রথমেই দেখলাম আমার উড়ন্ত সঙ্গীরা সবাই ঠিক আছেন কি না। সবাই ঠিক ছিলেন

ফ্লাইং অফিসার ন্যাবের বাড়ি দেরাদুনে। একজন সাংবাদিক জানতে চাইলেন, তিনি কোত্থেকে এসেছেন। ন্যাব বললেন, তাঁদের পরিবার অবিভক্ত পাঞ্জাব থেকে এসেছে—বাড়ি দেরাদুনে- বাবা-মা বোমবাইয়ে থাকেন। তিনি জানতে চাইলেন, 'কোত্থেকে, কোন্ রাজ্য থেকে এসেছি বলা কি উচিত?'

আর একজন সাংবাদিক বললেন, 'আমার মনে হয়—একটি রাজ্য অতি বিশাল রাজ্য, ভারত থেকে আপনি এসেছেন।'

চলতি প্রশ্ন এল, 'আপনার সাফল্যের রহস্য কী?'

ন্যাবের জবাব, 'এক সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাওয়া।'

কেবল পাক-বিমান শিকারেই নয়, পাক সাঁজোয়া গাড়ি আর ট্যাংক ধ্বংসেও ওই রহস্য কাজ করেছে।

ট্রেভর কীলর অনেক ব্যাপারেই 'প্রথম'। লখনউর এই স্কোয়াড্রন লীডার ৩ সেপ্টেম্বর ছাম্ব খণ্ডে প্রথম একটি স্যাবার জেট শিকার করেন। 'ন্যাট' বিমান চালনার প্রথম শিক্ষার্থী বৈমানিক দলেও তিনি ছিলেন। পরে অনেককেই তিনি ওই বিমান চালাতে শিখিয়েছেন। একদা এই বিমানকে ঝড়তি মাল হিসাবেই দেখা হত—এখন তার নাম দেওয়া হয়েছে, 'খুদে দৈত্য।' গত বার বছর তিনি ভারতীয় বিমানবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠেছেন।

স্যাবার শিকারের পরেই তাঁর কী মনে হয়েছিল? -এই প্রশ্নে ট্রেভর বললেন, 'আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার নিকটতম সংগীকে বললাম, দেখছো?'

সঙ্গী বলল, 'ভয়ঙ্করভাবে দেখেছি।'

ট্রেভর বললেন, স্যাবার জেট শিকার করার পরই একখানি পাকিস্তানী এফ—১০৪ জঙ্গী বিমান তাঁর ন্যাট বিমানের দিকে উড়ে আসে।

কিন্তু তাঁর সংগী বিমানটি ট্রেভরের বিমানের আগে আগে ঢালের মত আড়াল দিয়ে উড়তে থাকে। তখন এফ -১০৪ বিমানটি সরে পড়ে।

*

বাইশ দিনের ভারত-পাক বিমান যুদ্ধের পর এ কথা হলফ করে বলা চলে আমাদের বিমানবাহিনী তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। সে প্রমাণ রয়েছে বাইশ দিনের যুদ্ধের খুটিনাটি বিবরণে। পাকিস্তানের ৭৩টি বিমান ঘায়েলের আশ্চর্য রোমাঞ্চকর সেই কাহিনী শুনলে তা নিশ্চিত মালুম হবে।

ছাম্ব এলাকায় পাকিস্তানের ব্যাপক আক্রমণের মুখেই আমাদের বিমানগুলি শিকারীর দৃষ্টি নিয়ে প্রথম আকাশে ওড়ে। জেট ইনজিনের গর্জনে শত্রু প্রতিরোধের দুর্দম সংকল্প জেগে ওঠে এক মুহূর্তে। বিমানগুলি এগিয়ে আসে আমাদের স্থলবাহিনীর সমর্থনে। পয়লা দফার আক্রমণেই পাকিস্তানের ১৪টি ট্যাংক ঘায়েল হয়। এর মধ্যে অন্তত ১১টিকে দেখা গিয়েছে দাউ দাউ করে জ্বলতে। তা ছাড়া সমরাস্ত্রবাহী ভারী ভারী গাড়িগুলিরও ক্ষতি হয়েছে বিস্তর। তার সংখ্যাও কম করে ৩০ থেকে ৪০ হবে। যুদ্ধের শেষে দেখা গেল, আমাদের মাত্র দুইটি ভ্যামপায়ার নিখোঁজ হয়েছে। হ্যাঁ, বলে রাখা ভাল আমরা সবসুদ্ধ ৩৫টি বিমান হারিয়েছি। পাকিস্তানের তুলনায় অর্ধেকেরও কম।

সেদিন ৩ সেপ্টেম্বর। সকাল ৭টা। ছাম্ব এলাকায় পাক বিমানগুলি যখন আমাদের বৃত্তাকারে ঘিরে ফেলার মতলবে ছিল ঠিক তখনই আমাদের ন্যাটবাহিনী এগিয়ে এল শত্রুর সাধ চূর্ণ করতে। এ যুদ্ধের নায়ক স্কোয়াড্রন লীডার ট্রেভর কীলর। সেদিনের সম্মুখ-সমরে বীর কীলর পাক-স্যাবারকে গুলি করে নামিয়ে দিলেন মাটিতে। যুদ্ধের হালচাল প্রমাণ করেছে কীলরের এই বীরত্ব ঐতিহাসিক বীরত্ব।

স্মরণীয় দিন ৬ সেপ্টেম্বর। হালওয়ারা আক্রমণ করে বসল ৪টি পাক-স্যাবার জেট, কিন্তু ফিরে যাবার সময় হলো না বিহংগের। আমাদের হানটারের হাতে ঘায়েল হয়ে চুরমার হয়ে গেল চার-চারটি স্যাবার। কলাইকুন্ডাতেও সেই একই ইতিহাস। এখানে দুটি ঘায়েল হয় আমাদের হানটারের হাতে, দুটি যায় বিমান বিধ্বংসী কামানের গোলার আঘাতে।

আমাদের বিমানঘাটিগুলির উপর পাকিস্তানের এই আক্রমণ আমাদের বাধ্য করেছিল পাকিস্তানের বিমানঘাটির উপর আক্রমণ চালাতে। সুতরাং সারগোধা ও চাকলালায় আমরা বোমা ফেলে এলুম। সে হলো ৬-৭ সেপ্টেম্বর রাত্রের ঘটনা। কম করেও শ'দুয়েক বার হানা দিয়েছি শত্রুর ঘাটিতে। আমাদের ক্ষতি মাত্র একটি ক্যানবেরা। হাতে হাতেই ফল পাওয়া গেল। অতঃপর শত্রু আর দিনের আলোয় আক্রমণ করতে সাহস পেল না।

পাকিস্তান মরীয়া হয়ে আমাদের যেসব এলাকায় আক্রমণ চালিয়েছে সে-গুলি হলঃ পাঠানকোট, আদমপুর, হালওয়ারা এবং আম্বালা। আমাদের বিমানের তাড়া খেয়ে পড়ি কি মরি করে বোমা ফেলেছে কখনো লক্ষ্যস্থলে, কখনো লক্ষ্যের বাইরে। পাকিস্তান দাব করেছে এই চারটি জায়গা তার সুযোগ্য পাইলটরা বোমা ফেলে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে। এত মিথ্যেও বলতে পারে। জোর গলায় কবুল করছি, এ হেন পাক-বচন বিলকুল ঝুটা। নিজের চোখে দেখে এলাম যে। আমি এদের তিনটি এলাকা ঘুরে দেখে এসেছি, পাকিস্তান যে পরিমাণ ক্ষতির কথা বলছে তার তুলনায় কিছুই হয়নি।

রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানের বি--৫৭ বোম্বার আদমপুরে মোট ১২টি বোমা ফেলেছে। দুটি বিমানঘাটির হ্যাংগারের কাছে পড়েছিল, বাকি দুটি অন্যত্র যেখানে-সেখানে। ছটি বোমায় আমাদের ক্ষতি হয়েছে অতি সামান্য। গুলি ছিটকে এসে কয়েক জায়গায় গর্ত হয়েছে। এক সার অফিসঘর ভেঙে পড়েছে আর একটি ঘরের টিনের ছাউনিটা ফুটো কেটে গিয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ শুধু-মাত্র এই। রানওয়ের উপর কোন আঘাতই ওরা হানতে পারেনি—একপ্রান্তের একটুখানি জায়গা বাদে। তাতে আমাদের বিমান চলাচলের কোন অসুবিধেই হয়নি। বিমানঘাটির অদূরে একটি দোতলা বাড়ির ঠিক কুড়ি গজ দূরেই একটি হাজার পাউন্ডের বোমা ফেটেছিল। বাড়িটিতে তখন কোন বাসিন্দা ছিলেন না।

আমি নিজের চোখে দেখলাম বিমানগুলির গায়ে একটি আঁচড়ও লাগেনি।

হালওয়ারায় পাকিস্তান কম করেও ৮৩টি বোমা ফেলেছে। মোট ২৩ বার হানা দিয়েছে। কিন্তু বোমাগুলি সবই বিমান ক্ষেত্রের দুই থেকে চার মাইল দূরে পড়েছে। বিমান ক্ষেত্রের কয়েকটি ট্রলির উপর কিছু আঘাত ওরা হেনেছিল। এ ছাড়া আর কোন ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন নেই কোথাও।

আমবালার ঘটনা পাক-বর্বরতার এক জ্বলন্ত উদাহরণ। ১০৮ বছরের পুরোনো গীর্জাটির উপর ওরা বোমাবর্ষণ করেছে। কয়েকটি অসামরিক বাড়িতেও বোমা ফেলেছে। সবসুদ্ধ ১৬টি বোমা ফেলেছে এখানে। এর মধ্যে মাত্র তিনটি বিমান ক্ষেত্রের উপর। এর মধ্যে আবার দুটো মোটে ফাটেইনি। একটি ফেটেছিল। তাতে পিস-টাইম কণ্ট্রোল টাওয়ারের কিছু ক্ষতি হয়েছে।

তা ছাড়া দেখলাম আমবালা ক্যানটনমেনটের সেই সামরিক হাসপাতালটি। কলকাতার গাঙ্গুলী বাগানের মেজর পাল ঘুরে ঘুরে দেখালেন। পাক-নির্দয়তার আর একটি উদাহরণ।

পাকিস্তান দাবি করেছে, ওরা আমাদের ৯টা মিগ—২১ ধ্বংস করেছে। সর্বৈব মিথ্যা। আমরা ৯টা মিগ নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছিলাম এবং এখনও তার ৮টা বহাল তবিয়তেই আছে। চাক্ষুষ দেখেছি। আরও দেখেছি হানটার, ফাইটার, বোমবার যেগুলি দিনের আলোয় উড়ে গিয়ে পাকিস্তানের বৃহত্তম বিমানঘাটি সারগোধায় আক্রমণ চালিয়েছিল। ক্ষতির পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। সেই সঙ্গে অন্যান্য বিমান সহ পাকিস্তানের দুটি এফ- ১০৪ বিমান ধ্বংস হয়েছে অথবা মাটিতে ঘায়েল হয়েছে।

বাইশ দিনের এই বিমান যুদ্ধে আমাদের বিমানগুলি পাক-ট্যাংক ধ্বংসেরও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছে। প্রায় ১২০টিরও বেশী ট্যাংক আমাদের বিমান-গুলি ধ্বংস করেছে বা ঘায়েল করেছে। মনে করা যেতে পারে ৮ সেপ্টেম্বরের কথা। সেদিন আমাদের ৪টি হানটার পাকিস্তানের একটি মালগাড়ির উপর বোমা বর্ষণ করে। খেম করনে আমাদের বিমান চারটি পাক-ট্যাংক ও ৬০টি সমরাস্ত্রবাহী গাড়ি ধ্বংস করে দেয়।

উল্লেখযোগ্য, ভারতীয় বিমানবাহিনী সরকারীভাবে জানান যে, ক্যামেরায় তোলা ছবি—বিমানচালকদের সাক্ষ্য ও বিমানের ধ্বংসাবশেষ থেকে পাকিস্তানের ৭৩টি বিমান ধ্বংসের হিসেব বার করা হয়েছে।

আমাদের এই 'উড়ন্ত চিতা'র গৌরবে কোন্ ভারতীয় গর্বিত হবে না?

ফসল আবার ফলবে

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫-র ঘটনা। উত্তর রেলপথের একটি মালগাড়িকে পাক বিমান আক্রমণ করল গুরুদাসপুর স্টেশনে। তাতে ছিল সমরসম্ভার আর ডিজেল তেল। তিনটি তেল-ভর্তি ওয়াগনে আগুন ধরে যায়। সে আগুন অন্য-গুলিতে ছড়িয়ে পড়লে সীমান্তে আমাদের জওয়ানরা সরবরাহ থেকে বঞ্চিত হবেন। ফায়ারম্যান চমনলাল এঞ্জিন থেকে ছুটে এলেন আগুনধরা ওয়াগন তিনটিকে অন্যগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে। কাজ সম্পন্ন করলেন চমনলাল কিন্তু আগুন তাকে রেহাই দিল না।

চমনলাল বীর। তিনি কামান দাগেন নি, স্যাবর মাটিতে ফেলেন নি, প্যাটন গুঁড়ো করেন নি কিন্তু সবই তিনি করলেন। যুদ্ধ শুধু সৈনিকেই করে না, তাদের পিছনের লোকও করে, এই ভাবে—চমনলালের মত। হয়তো, সেদিন যদি অন্য ওয়াগনগুলো না বাঁচাতো, তাহলে পাকিস্তানের আরো দশখানা প্যাটন কিংবা পাঁচখানা স্যাবার কমিয়ে দেওয়া যেত না।

সরবরাহের নিরবচ্ছিন্ন ধারাটি অব্যাহত রাখা, সাফল্যের প্রাথমিক সোপান। তাই চমনলাল বা তাঁর মত বীরদের, যাঁদের অনেকের নাম হয়তো কোনদিনই জানা যাবে না, গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করতে হয়।

নাম জানি না, তবু সেই লোকটিকে মনে থাকবে। মিলিটারি ট্রাকের ড্রাইভার মারা গেছে। অসহায় ভাবে ট্রাকটি নিশ্চল অথচ সীমান্তে জওয়ানরা সরবরাহের অপেক্ষায়। কোথা থেকে ছুটে এসে লোকটি ট্রাকে উঠল। তার নিজের ট্রাকটি বোমায় নষ্ট হয়েছে, তাই বলে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকতে পারেন না। পৌঁছে দিয়ে এলেন অস্ত্র এবং রসদ। যদি তা না করতেন, হয়তো পাক আক্রমণের চাপে আমাদের কোন জওয়ানদলকে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হারাতে হত। এই ট্রাক ড্রাইভার জানতেন তিনি মারা যেতে পারেন, কারণ তাঁর মত বহু বেসামরিক ড্রাইভার নিজেদের ট্রাক নিয়ে এগিয়ে আসেন সরবরাহ অব্যাহত রাখতে এবং তাদের অনেকেই নিহত হন। কামান-বন্দুক নিয়ে এরা যুদ্ধ করলেন না, কিন্তু এরা যুদ্ধ করলেন পিছনের সীমান্তে। এই সীমান্তে ব্যর্থ হলে আমাদের সামনের সীমান্তের জওয়ানরা সফল হতো না।

সেই পাঞ্জাবী কৃষকটিকে মনে না করে উপায় নেই। এঁরও নাম জানি না। বহু কষ্টে, যত্নে সম্বচ্ছরের ফসল, জওয়ার ফলিয়েছেন ক্ষেতে। এল ছদ্মবেশী পাকিস্তানী হানাদার। তাদের অনেকেই লুকোল জওয়ার, বাজরা, আখের ক্ষেতে। এই গরীব কৃষক, ক্ষেত থেকে লুকোনো হানাদার বার করার জন্য ফসলে আগুন

ধরিয়ে দিলেন। নিজ হাতে পুড়িয়ে দিলেন বছরের ফসল, পরিশ্রম, স্বপ্ন।

কেন? বুক চিতিয়ে কৃষক জবাব দিলেন, "ফসল আবার সামনের বছর ফলবে, কিন্তু স্বাধীনতা ফলবে না।" একে বীরত্ব বলব। অসাধারণ বীরত্ব! ক্ষেত পুড়িয়ে যে হানাদারটিকে তিনি ধরলেন, ধরা না পড়লে হয়তো সে গোপনে নষ্ট করত আমাদের বিমানক্ষেত্র, সেতু বা আরো কিছু। পাঞ্জাবের এই কৃষক প্যাটন মারেন নি, স্যাবার নামান নি, তবু তিনি যুদ্ধ করলেন। অনন্য যুদ্ধ।

এই বিরাট বীর-বাহিনী পিছনে আছেন, আমাদের আগুয়ান জওয়ানরা তা জানতেন। এই জানাটা মনে বল যোগায়। পাকিস্তানের উন্নত অস্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান হাতিয়ারই ছিল মনোবল। এর ক্ষমতা যে কি বিপুল তার অজস্র উদাহরণ পাওয়া যাবে সেপ্টেম্বরে তিন সপ্তাহের যুদ্ধে। মাত্র একটির কথাই এখন বলব।

৯ই সেপ্টেম্বর সকালের কথা। খেম করন এলাকায় পাকিস্তান বিরাট সাঁজোয়া আক্রমণের তোড়জোড় চালাচ্ছে। আমাদের বাহিনী তখন কঠিন চাপের মধ্যে। এই চাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য বিমানবাহিনীকে বলা হল, পাকিস্তানের কামান এবং ট্যাঙ্কের উপর হাণ্টার বিমান দ্বারা আক্রমণ চালাতে। আমাদের বিমান দু খেপ আক্রমণ চালিয়ে এসেছে। তৃতীয় খেপের জন্য চার জন পাইলটকে সব কিছু বুঝিয়ে দেওয়া হল। এদের নেতা হলেন স্কোয়াড্রন লীডার বিশোনী। আগের দিন সন্ধ্যাতেই ইনি রাইওয়ান্দি স্টেশনে কাসুরখণ্ড অভিমুখে সমরসম্ভার পূর্ণ একটি ট্রেন ধ্বংস করে এসেছেন।

তাঁর সঙ্গে আর যে তিন জন পাইলট যাচ্ছেন, তাঁরা হলেন, ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্ট আহুজা, ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্ট শর্মা এবং ফ্লাইং অফিসার পারুলকার। এদের বলা হল ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি এবং কামানঘাঁটিগুলি ধ্বংস করার জন্য। দুজন-দুজন করে এরা আকাশে উঠলেন। বিশোনী এবং আহুজা আকাশে উঠেই বেঁকে গেলেন যাতে পরবর্তী দুজনের জেটএর ধোঁয়াতে উঠতে অসুবিধা না হয়। মাটি থেকে ১০০ ফুট উপর দিয়ে ওরা উড়ে চললেন লক্ষ্যবস্তুর দিকে। বিশোনীর বাঁ দিকে একটু পিছনেই আহুজা। ৫০০ গজ পিছনে শর্মা ও পারুলকর।

এই রকম ছকেই, ওরা লক্ষ্যবস্তুর এলাকায় পেঁাছলেন। বিশোনী তাঁর বাঁ দিকে দেখলেন ধুলো উড়ছে মাটিতে। বুঝলেন ওখানে ট্যাঙ্ক বা অন্যান্য গাড়ি চলছে। অন্য তিনজনকে হুঁশিয়ারী জানিয়ে নির্দেশ দিলেন, প্রত্যেকে যে যার লক্ষ্যবস্তু বেছে নাও। আহুজা, শর্মা ও পারুলকর নিজেদের বিমানের রকেট নিক্ষেপের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা প্রস্তুত অবস্থায় রাখলেন। এক ঝাঁক করে গোলা ছুঁড়ে ওরা পরখ করে নিলেন সামনের কামান ঠিক আছে কিনা।

গত দিনের অভিজ্ঞতা থেকে বিশোনী জানতেন পাকিস্তানী এ্যাণ্টি এয়ার-

ক্রাফট এবার গর্জে উঠবে। ৪০ মিলিমিটারের অ্যাক-অ্যাক কামান তাদের চার-পাশের আকাশটাকে প্রায় কালো করে ফেলল। প্যাটন ট্যাঙ্কের কামানগুলোও আকাশটাকে ভয়াবহ করে তুলল। তবে এই চারটি হান্টার বিমানের সুবিধা ছিল তাদের নিচুতে ওড়া। ৪০ মিলিমিটারের গোলা বিমানের বহু উপরে ফাটছিল। পাক গোলন্দাজরা কামানগুলোর পাল্লার মাপ বদলায়নি। কারণ, রকেট আক্রমণ চালাতে হলে বিমানগুলিকে উঁচুতে তুলতে হবে। আর উঁচুতে উঠলেই অ্যাক-অ্যাকের নাগালের মধ্যে পড়বে।

লক্ষ্যবস্তু বেছে নেওয়ার কোন সমস্যায় চারজনকে পড়তে হল না, কারণ ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য সাঁজোয়া গাড়িতে জায়গাটা এমনই ভরা! বিশোনী বেছে নিলেন তাঁর বাঁ দিকের তিনটি ট্যাঙ্ককে। অর্ধচন্দ্রাকৃতি হয়ে তারা দাঁড়িয়ে। অ্যাক-অ্যাক এবং প্যাটনের প্রচণ্ড গোলা উপেক্ষা করে বিশোনী ৩০০ ফুট উঠে গেলেন, তারপর কাৎ হয়ে ছোঁ মেরে নামলেন। ট্যাঙ্কগুলি থেকে প্রায় ৪০০ গজ দূরে যখন, পরপর আটটি রকেট ছাড়লেন। তার হান্টার তখন মাটি থেকে ৫০ ফুট উপরে পৌঁছে গেছে। বিমানটিকে সিধে করে নিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখলেন। তিনটি ট্যাঙ্কই দাউ দাউ জ্বলছে।

নেতার সাফল্য দৃষ্টান্তে বাকি তিনজনও ট্যাঙ্কগুলিকে লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিলেন। অ্যান্টি এয়ারক্রাফট কামানের মারণ-উদ্গারী এলাকায় নিজেদের বিমান উঠিয়ে এনে তারাও রকেট ছুঁড়লেন তিনজনে; আরো সাতটি ট্যাঙ্ক খতম করলেন।

রকেট নিঃশেষিত হবার পর, চারজন মন দিলেন সাঁজোয়া গাড়িগুলোর দিকে। এবার বিমানের সামনের কামানের গোলা ব্যবহার করতে হবে।

বিশোনী আবার উপরের বিপজ্জনক এলাকায় উঠে এলেন। তারপর ছোঁ মেরে গোলা ছুঁড়তে ছুঁড়তে নিচু হয়ে লক্ষ্যবস্তুর উপর দিয়ে উড়ে গেলেন।

বাকি তিনজনও একই ভাবে আক্রমণ চালিয়ে গেলেন। বার বার তারা উপরে উঠে আক্রমণ করতে থাকলেন যতক্ষণ না কামানের গোলা নিঃশেষিত হয়। বলা বাহুল্য, শত্রুর খুনী অ্যাক-অ্যাক কামানগুলো মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম নেয়নি।

শেষবারের মত আক্রমণ চালিয়ে চারজন নিচু হয়ে উড়ে রওনা দিলেন নিজেদের ঘাঁটির উদ্দেশ্যে। শত্রু-এলাকা ছাড়বামাত্র পারুলকর দলনেতা বিশোনীকে জানালেন, তাঁর ডান বাহুতে গুলি লেগেছে। শোনা মাত্র ভাবনায় পড়লেন বিশোনী। দ্রুতগামী জেট বিমানকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ডান হাতটাই বিশেষ করে দরকার লাগে। ঘাঁটি পর্যন্ত উড়ে চলার জন্য পারুলকর বাঁ হাতেই বিমান সামলালেন, কিন্তু নামতে হলে দুটো হাতই এবং রানওয়ে স্পর্শ করার ঠিক আগে ডান হাত দরকার হবেই।

বিশোনী জানতে চাইলেন, বিমানটিকে সে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে কি না!

বিন্দুমাত্র না ঘাবড়ে, ধীরস্বরে পারুলকর বললেন, পারব। এরপর বিশোনী খবর পাঠালেন ঘাঁটিতে। রানওয়ে প্রান্তে পারুলকরের জন্য অ্যাম্বুলেন্স যেন প্রস্তুত থাকে।

এদিকে শর্মার হান্টারের ডানার তেলের ট্যাঙ্ক থেকে তেল বেরিয়ে যাচ্ছে। অ্যাক-অ্যাক বুলেট সেখানে ঘা দিয়েছে। ঘাঁটি পর্যন্ত পেঁছবার মত তেল থাকবে কি না সেটাই তখন তার একমাত্র চিন্তা। কিন্তু পারুলকরের সমস্যার কথা শুনে, শর্মা নিজের বিপদের কথা বলে বিশোনীকে আরও ভাবনায় ব্যস্ত করতে চাইলেন না।

পারুলকরের জীবনে এইটিই তার প্রথম অভিযান। অথচ এমনভাবে তিনি বিশোনীকে আশ্বাস দিতে লাগলেন যেন একশো-দুশো অভিযানের অভিজ্ঞতায় পোক্ত।

ওরা ঘাঁটিতে পেঁছিলেন। বিশোনী দেখলেন, তাঁর নির্দেশমত নিচে সব কিছু প্রস্তুত। প্রথমে তিনি মাটিতে নামলেন। এরপর নামলেন শর্মা। বিমানটিকে রানওয়ে থেকে পাশে সবে সরিয়ে নিয়ে গেছেন অমনি হেঁচকি তুলে এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। আর কয়েক মুহূর্ত দেরী হলেই তাঁর তৈল-ক্ষুধার্ত হান্টার আকাশ থেকে মাটিতে আছড়ে পড়ত।

এবার সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন পারুলকরের অবতরণের জন্য। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি নামবার জন্য মোড় ঘুড়লেন, তারপর নীচে ক্রমশ নীচে তার হান্টার নেমে আসতে থাকল। কোন অস্বাভাবিকতা কারুর চোখে পড়ল না। বিমানটি রানওয়ে স্পর্শ করে ছুটতে ছুটতে অবশেষে থামল। থামবার জন্য পারুলকরকে ডান হাতেই ব্রেক কষতে হয়েছিল। দেখে মনে হয় কিছুই তাঁর ঘটেনি। উচিত ছিল থামিয়েই বিমান থেকে নেমে পড়ার। কিন্তু অন্য সকলের মত তিনিও বিমানটিকে ঘুরিয়ে নিয়ে রাখার জায়গায় এনে রাখলেন।

বিমান থেকে নেমে আসার পর সকলে দেখলেন তাঁর ওভারঅল রক্তে জবজবে। বুলেটের আঘাতে ডান হাত থেঁতলে গেছে। এতে যে যন্ত্রণা হবার কথা তা সহ্য করে এবং রক্ত মোক্ষণের ফলে অজ্ঞান না হয়ে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন, অমানুষিক ব্যাপার।

হাসপাতালে ডাক্তারদের নটি সেলাই করতে হয় পারুলকরের বাহুতে। এইটি তাঁর প্রথম অভিযান সুতরাং উত্তেজিত হওয়া অল্পবয়সী পারুলকরের পক্ষে স্বাভাবিকই। হাসপাতালে সেলাই হবার তিন ঘণ্টা পরই দেখা গেল পারুলকর বৈমানিকদের ঘরে বসে এন্তার বলে যাচ্ছে সেই দিনের প্যাটন মারার গল্প।

সে সময় একজন ওকে বলেন, "যদি বুঝতে হান্টারটাকে সামলাতে পারবে

না, তাহলে কি, ওকে ফেলে প্যারাস্যুটে নেমে আসতে?"

"পাগল হয়েছ," পারুলকর জবাব দেন, "কত কষ্টের পয়সায় বিদেশ থেকে এই দামী জেট কিনতে হয়েছে, প্রাণ থাকতে কি তা নষ্ট করতে পারি!"

পিছনের সীমান্তের বীরত্বের খবর বোধহয় পারুলকরের কাছে পৌঁছে গেছে।

এইভাবেই গণতান্ত্রিক দেশের মানুষরা লড়াই করে—সামনে এবং পিছনে। পাল্লা দিয়ে।

'তোমরা অমর'

কেদার রায়-ঈশা খাঁ দূর অতীতের, মোহনলাল-মীরমদনও; হালে এই বিংশ শতাব্দীতেই বহু বাঙালী স্থলে জলে অন্তরীক্ষে অতুল শৌর্যের পরিচয় দিয়ে বীরের সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। দেশ ভোলেনি প্রথম মহাযুদ্ধের কৃতী যোদ্ধা পরেশলাল রায়, ইন্দ্রলাল রায়কে; ভোলেনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালী চৌধুরী আর উইং কমানডার মজুমদারকে। এবং জেনারেল চৌধুরী, এয়ার মারশাল সুব্রত মুখার্জি আর ভাইস অ্যাডমিরাল চক্রবর্তী আপন কৃতিত্বে স্বাধীন ভারতের সর্বোচ্চ সমর অধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন মসীজীবী বাঙালী অসিজীবীও হতে পারে।

স্বাধীন ভারতের প্রত্যেকটি যুদ্ধজয়ের কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালী সেনাপতির নাম। হায়দরাবাদ আর গোয়া অভিযানের সঙ্গে জেনারেল চৌধুরী আর ১৯৪৮ সালের কাশ্মীর-যুদ্ধে লাওনেল প্রতীপ সেন। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধেরও সফল সমরনায়ক জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী। শুধু তাই নয়, আলাদা বাঙালী রেজিমেন্ট নেই বটে, আরও দশজন ভারতীয় যোদ্ধার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে এগিয়ে গিয়েছেন শত সহস্র বাঙালী বীর বিপুল বীর্যে শত্রুর [illegible] ক্ষতি করে প্রাণ দিয়েছেন অনেকে রণক্ষেত্রে। ইতিহাসের পাতায় রক্তের অক্ষরে লেখা হয়ে গিয়েছে অভিজিৎ, তপন, মনোজ, ভাস্কর, অসিত, প্রবাল, পীযূষ, দীপ্তেন্দ্র প্রভৃতি চিরউজ্জ্বল কয়েকটি নাম।

প্রথম খবর এল অভিজিতের। ছোট্ট খবর। ১৯ আগস্ট কাশ্মীরের কারগিলে তরুণ যোদ্ধা অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় শহীদ হয়েছেন। অভিজিৎ

কৃষ্ণনগরের ছেলে, সংসদ-সদস্য শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র সন্তান। ১৯৬২ সালের অকটোবরে চীনারা যখন ভারত আক্রমণ করে, তখন হরিপদ বাবু বৃদ্ধ হয়েও নিজেই যুদ্ধে যোগ দিতে চেয়েছিলেন এবং তাঁরই ইচ্ছাতে অভিজিৎ আশুতোষ কলেজ থেকে স্নাতক হবার পর ১৯৬৩ সালে এমারজেনসি কমিশনে যোগ দেন। চতুর্থ রাজপুত রেজিমেনটের অধীন ষোলজনের একটি দলের তিনি নেতৃত্ব করেন। এই বছরেরই মে-জুন মাসে যে-দুঃসাহসী দলটি কারগিল ঘাঁটি দখল করে, অভিজিৎ সেই দলে ছিলেন। এবং তেইশ-চব্বিশ বছরের এই তরুণ সেকেনড লেফটেনানট বীরের মত লড়তে লড়তে পরে ওই কারগিল-প্রান্তরেই প্রাণ দিয়েছেন। ভূস্বর্গ কাশ্মীরের হরিৎ উপত্যকা অভিজিতের উষ্ণ রক্তে পবিত্র হয়েছে।

দেশ সেবার প্রেরণা অভিজিৎ পেয়েছিলেন তাঁর মা-বাবার কাছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁরা দুজনেই দুঃখবরণ করেছেন। হরিপদবাবু বরাবরই অক্লান্ত সৈনিক। শিশু অভিজিতের বয়স যখন এক মাস, তখনও তিনি জেলে। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুশোকে তিনি ভেঙে পড়েননি, আট মাসের নাতিকে বুকে চেপে গর্বের সঙ্গে তিনি বারবার বলেছেন, 'অভিজিতের বীরের মৃত্যু হয়েছে, আমিই তাকে সেনাবাহিনীতে ঢুকতে উৎসাহিত করেছিলাম।'

অভিজিতের স্ত্রী জয়ন্তীও সাহসের সঙ্গে বুক বেঁধে আঘাত সহ্য করছেন। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে তাঁদের বিয়ে, কিছুদিন পরেই অভিজিৎ রণাঙ্গনে চলে যান। শেষ দেখার সময় অভিজিৎ বলে গিয়েছিলেন "তোমাকে শীগগীরই শ্রীনগরে নিয়ে যাব।" উনিশে আগস্ট জয়ন্তী তাঁর কাছ থেকে শেষ চিঠি পান। লিখেছেন—"তুমি আমার সঙ্গে যেখানে আসতে চেয়েছিলে, সেখান থেকে লিখছি।" শ্রীনগরে জয়ন্তীকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। সেই রাত্রেই অভিজিৎ শত্রুর হাতে জীবন বিসর্জন দেন।

১৯৪২'র ১০ সেপটেমবর অভিজিতের জন্ম। ঠিক সেই তারিখেই অভিজিতের দেহভস্ম আসে দিল্লিতে। জেনারেল চৌধুরী ও মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সারা দেশ সেদিন বলেছে "এ মৃত্যু মহান, এ শোক একার নয়, সমস্ত দেশের।"

অভিজিতের মতই মহান মৃত্যু তপনের। ফ্লাইট লেফটেনানট তপনকুমার চৌধুরী পনের সেপটেমবর লাহোর-শিয়ালকোট রণাঙ্গনে আত্মাহুতি দিয়ে শহীদ হয়েছেন। ১৯৫৫ সালে তপন ভারতীয় বিমান-বাহিনীতে যোগ দেন। কলকাতার শ্রীরামচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র তপনকুমার ছোটবেলায় ছিলেন সিনেমা-থিয়েটারের খ্যাতিমান শিশু-অভিনেতা। পরবর্তীকালে মাত্র সাতাশ বছর বয়সেই অভিনেতা তপন হলেন বীর তপন, মৃত্যুঞ্জয় তপন।

ছাম্বের আকাশ-যুদ্ধে তিনি প্রাণ দিয়েছেন। বহু শত্রু-বিমান ভূপাতিত

করে তিনি যখন সম্মুখের দিকে ধাবমান, ঠিক সেই সময়ই গুলিবিদ্ধ হয় তাঁর বিমান। তবু তিনি ধরা দেননি। ক্ষতিগ্রস্ত বিমানটিকে নিরাপদে দেশের মাটিতে ফিরিয়ে এনেই বরণ করেন বীরের মৃত্যু।

বীর-লোকে পাড়ি দেবার আগে তপন বাবার কাছে যে-চিঠি দেন, তা পৌঁছয় তাঁর মৃত্যুর পরে। তিনি লেখেন :—

> বাবা, আমরা ৫ সেপটেমবর থেকে শত্রু ঘাটির উপর আক্রমণ চালাচ্ছি। প্রত্যেকবার আমরা উঁচু আকাশ দিয়ে চলাচল করছি। আমরা পাকিস্তানী ট্যাংক গুঁড়িয়ে দিয়েছি, একের পর এক শত্রুর সামরিক আস্তানাগুলি ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছি।
>
> আমি মাতৃভূমির সম্মান রক্ষার্থে আমার পবিত্র দায়িত্ব নিষ্ঠার সংগে পালন করে যাচ্ছি।
>
> শত্রু আমার বিমানটির গায়ে একটি আঁচড়ও কাটতে পারেনি। মা কালীর আশীর্বাদ ও আমার বাবা-মার আশীর্বাদেই এটা সম্ভব হচ্ছে। আমার উদ্দেশ্য সাধনের পথে এই আশীর্বাদই বড় কথা। তোমরা আমার জন্য প্রার্থনা করো যাতে প্রত্যেকদিন আমি শত্রুদের পংগু করে দিতে পারি।
>
> ৫ সেপটেমবর থেকে একটুও বিশ্রাম নিইনি। সেদিন থেকে আজ হল মোট বারদিন। তুমি সবাইকে বলো তারা যেন আমাকে চিঠি দেয়। চিঠিগুলি আমাকে উৎসাহ দেবে।
>
> দেশের জন্য জাতির জন্য আমি আমার [illegible] করে যাব।
>
> মাকে আলাদা চিঠি দিলাম না। তুমি মাকে বলো তাঁর তৃতীয়পুত্র সাধ্যমত কাজ করে যাচ্ছে।
>
> এখন আর সময় নেই। এখন আমাকে আকাশে উঠতে হবে—উদ্দেশ্য শত্রুহনন। সে এক আশ্চর্য রোমাঞ্চকর ব্যাপার।

প্রায় একই ধরনের "আশ্চর্য রোমাঞ্চকর" অভিজ্ঞতার আর একজন অংশীদার মেজর পীযূষকুমার চৌধুরী - যিনি অভিজিৎ ও তপনের মতই মৃত্যুঞ্জয় হয়েছেন এবারের ভারত-পাক যুদ্ধে।

সেদিন পাটনায় লোক আর ধরে না। সেই ভিড়ের মাঝখানে ছয় বছরের ছোট্ট ছেলে অভিজিৎ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভ সহায় অভিজিতের হাতে তুলে দিলেন টাকার একটি তোড়া। আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে জনতা চিৎকার দিল— 'মেজর চৌধুরী জিন্দাবাদ।"

লাহোর রণাংগনে দেশরক্ষার পবিত্র যুদ্ধে উৎসর্গীকৃত প্রাণ মেজর পীযূষ-কুমার চৌধুরীরই পুত্র এই অভিজিৎ। মেজর দানাপুরের ছেলে। দানাপুরের

জনসাধারণ তাঁদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্যস্বরূপ এই টাকা তুলেছেন।

মেজর চৌধুরীর পিতা শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী একজন সম্মানিত ব্যক্তি। দানাপুর বলদেও একাডেমিতে দীর্ঘকাল প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। বছর ত্রিশ আগে নোয়াখালি থেকে তিনি পশ্চিমবঙ্গে আসেন, তারপর সেখান থেকে বিহার।

ছেলের কাছ থেকে শেষ চিঠি পান ১০ সেপটেম্বর। তাতে লেখা "আমাদের জয় সুনিশ্চিত।" তার তিনদিন পরেই ১৩ সেপটেম্বর ৩৬ বছর বয়সে মেজর চৌধুরী রণক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন।

ক্যাপটেন প্রবাল রায়ের বয়স হয়েছিল ২৯। সৈন্যবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে গত ২৬ সেপটেম্বর ক্যাপটেন রায়ের বিধবা মায়ের কাছে যে-তারবার্তা এসেছিল, তাতে শুধু লেখা ছিল—'২০ সেপটেম্বর আপনার পুত্র যুদ্ধরত অবস্থায় নিহত হয়েছেন।'

অল্প কয়েকটি লাইনের সংক্ষিপ্ত সংবাদ। বিশদ বিবরণ পরে জানা গেল। প্রবালের জেঠতুতো ভাইয়ের একটি চিঠিতে। তিনিও সেনাবাহিনীর একজন পদস্থ অফিসার। প্রবাল রায়ের মায়ের কাছে লেখা চিঠিতে জানিয়েছেন, "বাবু (প্রবালের ডাক নাম,) আর নেই। আমি জানি এতে আপনি প্রচণ্ড আঘাত পাবেন। কিন্তু আপনাদের ভবিষ্যতের জন্যে যে সে তার বর্তমানকে বিসর্জন দিয়েছে, একথা ভেবে নিশ্চয়ই আপনি সান্ত্বনা পাবেন।"

ওই জেঠতুতো ভাই-ই জানিয়েছেন প্রবালের মৃত্যুবরণের তিনটি কাহিনী। লাহোর রণাঙ্গনে পাকিস্তানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি আক্রমণ করার কথা সেদিন। প্রবালের ব্যাটালিয়নের উপর সেই ভার। আমাদের সৈন্যদলের অভিযান যখন সাফল্যের মুখে, তখন তিনজন লোক এসে বলে, "আমরা চতুর্দশ রাজপুত রেজিমেনটের লোক, আমাদের গুলি কর না।"

একথা শুনে প্রবাল সামনে থমকে দাঁড়ান। হঠাৎ ওদের দুজন ছুটে এসে তাঁর দুহাত ধরে ফেলে, এবং তৃতীয় জন কাপুরুষের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বুকে বেয়নেট বসিয়ে দেয়। সেই মুহূর্তে প্রবাল টের পেলেন, ওই তিনজন খল পাকিস্তানী। প্রবাল শেষবারের মত উচ্চারণ করলেন –'জয় হিন্দ।'

দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাহিনী মোটামুটি একই রূপ। প্রবাল সেদিন তাঁর ইউনিটে যোগ দিলেন। পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘাঁটি দখলের সময় শত্রুর গোলাবর্ষণে তিনি নিশ্চিহ্ন হয়ে যান। আকাশে মিলিয়ে যায় তাঁর 'জয় হিন্দ' ডাক।

প্রবাল রায় দক্ষিণ কলকাতার ছেলে। তাঁর বাবা নীরদকুমার রায় ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক। ১৯৫৫ সালে তিনি দেরাদুনের মিলিটারি কলেজে যোগ দেন। চার বছর জম্মু ও কাশ্মীর সীমান্তে কর্তব্য-

রত ছিলেন। ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণের সময়ও তিনি সংগ্রাম চালান। এবার পশ্চিম রণাঙ্গনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে বুকের রক্ত ঢেলে গৌরবের জয়টিকা পরিয়ে দিয়েছেন বাঙালীর ললাটে।

প্রবালের মতই ভাস্বর আর একটি নাম—ভাস্কর গুহরায়। কুয়ালালামপুরে লালিত বাঙালী তরুণ ফ্লাইট লেফটেনান্ট ভাস্কর মাত্র বাইশ বছর বয়সে জেট জঙ্গীবিমানের বৈমানিকরূপে বহু শত্রুবিমান আর শত্রুর বহু প্যাটন ট্যাংক ধ্বংস করেছেন ছাম্ব-এর রণক্ষেত্রে। অতর্কিতে শত্রু যখন আন্তর্জাতিক সীমারেখা অতিক্রম করে এগিয়ে এল, জেট জঙ্গী বিমান নিয়ে শত্রুর দর্প চূর্ণ করেছিলেন এই ভাস্কর গুহরায়।

ভাস্কর শ্রীরবি গুহরায়ের পুত্র। জঙ্গী বিমান চালনায় উচ্চতর শিক্ষা নিতে তিনি গত বছর আমেরিকা গিয়েছিলেন।

মেজর মনোজমাধব মৃত্যুবরণ করেন রাজস্থান সীমান্তের স্থলযুদ্ধে, আর দীপেন্দ্রকুমার ও অসিতকুমারের মৃত্যু বিমানযুদ্ধে। লখনউয়ের বিশিষ্ট ঘোষ-পরিবারের সন্তান অসিতকুমার বিমানবাহিনীতে কমিশন পান ১৯৫৪ সালে। হান্টার বিমান শিক্ষাবাহিনীর প্রথম দলেব তিনি একজন। একাধিক কৃতিত্বের অধিকারী অসিতকুমার ১৯৬২ সালের নেফাযুদ্ধে অতুলনীয় বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। সেদিন পরলোকগত এয়ার ভাইস মারশাল শ্রীযশবন্ত সিং মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছিলেন তাঁর রণকুশলতার।

অসিতকুমারের পিতা পরলোকগত। মা, স্ত্রী আর ছোট্ট একটি ছেলে আকস্মিক আঘাতে দিশাহারা। উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় জীবনের এই পরিণতিতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে এয়ার মারশাল অর্জন সিংয়ের সমবেদনা-পত্র পেয়ে তাঁরা সেই আঘাতকে ভুলতে পেরেছেন। দুঃখ সহার তপস্যাতে বিজয়িনী বিধবা মা আর বিধবা স্ত্রী বলেছেন—অপরিসীম দুঃখ, তবু সান্ত্বনা, আমাদের দুঃখের অংশীদার সারা দেশ, সারা জাতি।

দেশ ও জাতির সম্মান রক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ এই সব মরণজয়ী বাঙালীর স্মৃতিতে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য রইল। নিঃশেষে প্রাণ বলি দিয়ে যাঁরা আমাদের হৃদয়ে স্বাধীনতার অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করে রেখেছেন, তাঁদের ক্ষয় নেই, তাঁরা মৃত্যুঞ্জয়, তাঁদের বার বার নমস্কার।

দিল্লি—লাহোর

॥ এক ॥

দিল্লি আর লাহোর, দুই শহর। কোনও কালে এক হয়েছিল ছড়ায় এবং কিংবদন্তীতে; "কিউ এর পরে ইউ"-এর মত একটির নাম মুখে এলেই আর-একটিও অনিবার্য এসে পড়ত, তা সেই যোগ বহুকাল নেই। আলাদা ভাগ হয়ে গেছে।

দিল্লি আর লাহোর, পথে অমৃতসর আবার জুড়ে গিয়েছিল আমার সফরে। বলা যায়, লাহোর-দরওয়াজা থেকে এইমাত্র ফিরে এলাম।

সফর, না ঘূর্ণিঝড়? এবারে বুঝেছি, একেবারে হাড়ে হাড়ে, শব্দ দুটি ইংরাজী বর্ণনায় হামেশাই এক জোয়ালে বাঁধা কেন। কয় মুলুকে, কোন্ কদমে গতি বোঝাতে অগত্যা ওই একটিমাত্র শব্দ : ঘূর্ণি।

এক শনিবার থেকে আর এক শনিবার। সাতটি দিনের মনে-মনে লেখা রোজনামচার উপরে ইতিমধ্যেই ধুলো যা পড়েছে, তাতে আর ঢিলে দিলে পাঠোদ্ধার করতে লিপি-বিশারদদের ডাকতে হবে। তার আগেই ঝাড়ন বুলিয়ে শাদা-চোখে-দেখা কথা কয়টিকে ফুটিয়ে রাখি।

সেই শনিবার। ছিলাম এক কোণে, সেখান থেকে সটান সরেজমিন রণাঙ্গনে। ধূলিস্নান, ধূলিপান, ধূলিভোজন। সেই সঙ্গে চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন।

তাই তো স্পষ্ট বলতে পারলাম, "লাহোর দরওয়াজা থেকে ফিরে এলাম। শুনবন্তু।"

হাঁ, সংশয়ীরা ইশারায় যতই হাসুন, শান্তির নামে মূর্চ্ছাতুর মৃগী রোগীরা যতই কেন নাকে কাঁদুন—আমরা সত্যিই সেপ্টেম্বরের ছয় তারিখেই প্রায় লাহোর অবধি কদম কদম বাড়ায়ে গিয়েছি, এবং জওয়ানদের জয় হোক–আজও লাহোর তালুকের বুকে দাঁড়িয়ে আছি।

শহর লাহোর আর তেরঙ্গা ঝাণ্ডার মধ্যে একটিমাত্র নহর ইশোগিল। "লাহোরের পতন আসন্ন" এই শিরোনামাঙ্কিত ঘোষণায় সেদিন উল্লাসের আতিশয্য হয়ত ছিল, কিন্তু দাবিটা মিথ্যা ছিল না।

অমৃতসর থেকে আটারি গ্র্যানড ট্রাংক রোড বরাবর সরাসরি। সীমান্ত। পা বাড়ালেই ওয়াগা, চূর্ণ চেক পোসট, আন্তর্জাতিক সীমারেখার লুপ্তপ্রায় চিহ্ন ইতস্তত। তালুক লাহোর। সোজা ডোগরাই গ্রাম, তথা ইশোগিল। আবার অমৃতসর থেকে ঈষৎ নেমেই খালড়া, আর একটি সড়ক। আজ এগিয়ে যান অকুতোভয়ে একেবারে বারকি অবধি। সেখানেও ইশোগিল সেও লাহোর।

অতএব অতিরঞ্জন নেই। ছিল না। কিন্তু, অস্বীকার করব না, অপূর্ণ একটি আশার অঞ্জন শুকিয়ে গিয়ে চোখ একটু চড়চড় করছে। সে-প্রসঙ্গ পরে।

॥ দুই ॥

এখন স্বপ্নসম মনে হয়। স্মৃতি রোমাঞ্চ আনে বেলা দ্বিপ্রহরে দিল্লি—এই জেট-যুগে পৌনে প্রহরের রাস্তা। রাতের ে. গাড়ি, ফ্রনটিয়ার মেল অমৃতসরের পথে পাড়ি দিচ্ছে। ঝমঝম চাকায়, লাইনে লাইনে, শিকলে শিকলে ঐকতান, নির্ভীক পরুষ অরকেস্ট্রা।

গাজিয়াবাদ ছাড়াতেই কে যেন বলে গেল "আলো নিবিয়ে দিন, এখান থেকে ব্ল্যাক-আউট।" মীরাট, সাহারানপুর পেরিয়ে পাঞ্জাব—সব অপ্রদীপ। আর তখনই মনে সেই সময়োপযোগী, সমুচিত পটভূমিটি নেমে এল, এতক্ষণ যাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

যুদ্ধ। বিরতির ঘণ্টা বেজেছে মাত্র, ছুটি হয়নি। এই যুদ্ধ আমাদের। সেই যুদ্ধ নয় যা এককালে আমাদের জওয়ানেরা লড়েছেন নুবিয়ায়, লিবিয়ায়, মেসোপটেমিয়ার মরুতে, সাদা সরদারদের ইঙ্গিতে। পলাসী এখন ইতিহাস মাত্র—কারণ "কাঁপাইয়া আম্রবন" তার পরে আর কোনও ধ্বনি ওঠেনি। এ যুদ্ধ পাণিপথেরই আর-এক প্রস্থ, বলা যেত চতুর্থ, রণাঙ্গন যদি পাণিপথ থেকে আরও বহু যোজন পশ্চিমে না হত, এবং বিস্তৃততর এলাকায় ছড়িয়ে না থাকত।

এই বিস্তার মানসপটেও বটে। কেবল দুই পক্ষের সেনানী নয়, গভীরতর মূল্যবোধ আজ মুখোমুখি।

ধর্মান্ধতার সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতা আজ আখেরী একটা বোঝাপড়ায় অবতীর্ণ। হিন্দু-মুসলিম সংঘাত নয়, পাক-ভারত হানাহানিও না--এ লড়াইয়ে যুযুধান দুটি জীবনাদর্শ, সমন্বয়ের সঙ্গে বিরোধ অসহিষ্ণু সংকীর্ণতার। রাষ্ট্র ভাঙা-গড়ার ইতিহাসে পাকিস্তান একটা শস্তা চাতুরি, একটা ধূর্ত ভাঁওতা; বিশেষ একটি সম্প্রদায়কে জাতিত্বের কলমা পড়ানোর আপাত-সফল চক্রান্ত, কিন্তু তাদেরও সকলকে নিয়ে 'হোমল্যান্ড' রচনার খেলাপ প্রতিশ্রুতি। যে মিথ্যার গ্রাসে গেছে পাঞ্জাবের অর্ধ, সিন্ধু এবং পূর্ববঙ্গ ইত্যাদি, সেই উদ্ধত মিথ্যাই বিষ-শিষ হয়ে আজ বিদ্ধ করতে উদ্যত কাশ্মীরকে। বিশেষ একটি সম্প্রদায় বিশেষ একটি অঞ্চলে সংখ্যাধিক হলেই পৃথগন্ন হবে কি না, পাঞ্জাবের প্রান্তরে শহীদ আবদুল হামিদের তোপের মুখে এই প্রশ্নটাই প্রজ্জ্বলন্ত পিন্ডাকারে ঝলসে উঠেছে জবাব চাই জরুরী। বিরতির বিলাস বয়ে যাবার পরও এই জিজ্ঞাসার মীমাংসা না হলে শেষ পর্যন্ত অনুদার জাতি-বোধই কায়েম হতে বাধ্য; কেন না, একটি পিকরবে যেমন বসন্ত আসে না, একটি দুটি আবদুল হামিদ দিয়ে তেমনই যথার্থ সেকুলারি ভূমিকা রচিত হতে পারে না। বীরের এ রক্তস্রোত ব্যর্থ করার অধিকার এই তরফ বা ওই তরফের শাসককুলের নেই।

দেখুন না, আঠারো বৎসর পরেও, যদিও একটি খণ্ডকে বলি পাকিস্তান, অন্যটিকে ভারত--তবু সাবকনটিনেণ্ট, শব্দটি আজও কথায় কথায় এসে পড়ে। অর্থাৎ যে ভূখণ্ড ইতিহাসে ভূগোলে, সংস্কৃতি অর্থনীতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি মিলিয়ে এক, ইচ্ছা মাফিক তাকে সত্যিই টুকরো করা যায় না। ভারত ভাগ হয়েছে, তবু সাব্‌কণ্টিনেণ্ট্,—অর্থাৎ "মহা-ভারত" সত্য হয়ে আছে।

এই "মহা-ভারতে" বিপরীত দুই জীবনাদর্শ ছাড়া দুই রাষ্ট্রিক আদর্শও যুধ্যমান—গণতন্ত্র বনাম স্বৈরাচার। তার মৌখিক বুলিতে বিন্দুমাত্র সাধুতা এবং সার অবশিষ্ট থাকলে শ্বেতাঙ্গ দুনিয়াকেও এই সত্য আজ হোক কাল হোক, মানতেই হবে।

আপাতত ভারতের স্কন্ধেই একাকী ক্রুশবহনের দুর্বহ ভার।

॥ তিন ॥

অন্ধকারের অসীম পাথার পার হয়ে ছুটছে ফণ্টিয়ার মেল। জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখছি, আকাশে তারায় তারায় দীপ্ত দীপাবলী। অপ্রদীপের আইন আকাশে খাটে না।

কত তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে গেলুম, ভাবছিলুম। বাক্স যখন সাজানো হচ্ছিল, বলয় তখন বাজছিল। পরদেশে গিয়ে অবিকল সেই সনাতন লাইন ক'টি শুনতে পেলুম।

আসলে বঙ্গললনামাত্রেই জানেন, তাঁদের পতিপ্রবরদের বীরত্বের দৌড় কত।

"নিতান্তই যুদ্ধে যদি যাবে প্রাণনাথ, আলুভাতে ভাত দু'টি দিই চড়াইয়া, খাইয়া যাইও যুদ্ধে।"

ইন্দ্রনাথের এই লাইন ক'টির জুড়ি নেই। আয়েসী মনের এমন নকশা আর আঁকা হয়নি।

সত্যি বলতে কী, যুদ্ধ নেই, আপাতত মুলতুবি, তবু শমনখানি পেঁছিতে স্নায়ুতে ছোট ছোট ভীরু ঢেউ শিহরিত হয়ে গিয়েছিল। "সরেজমিন রণাঙ্গনে" এই শিরোনামার তলায় হাজির হতে আমারও ডাক পড়বে, আগে ভাবিনি তো।

সংবাদপত্র দফতরের বন্দোবস্তের কথা সকলের জানা নেই। চলিয়ে-বলিয়ে বলতে একমাত্র রিপোর্টারেরা ফটোগ্রাফাররাও-তাঁদের চাল দাবার ঘোড়ার মত আড়াই-পা। বাদবাকী আমাদের অনেকেই গজ কিংবা মানোয়ারি তরী, সহজে নড়িনে।

আমিও সেই নট-নড়নচড়নদেরই একজন, তাই বলে কি নট-কিচ্ছু? মানবো কেন। আর কিছু না হোক থারমাপলির পুণ্যকাহিনী থেকে হলদিঘাটের ধনাবাহিনী- পাতার পর পাতা কি মুখস্থ করিনি নির্দিষ্ট কোটরে বসে সখা-সচিবদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বকবকম। অগ্যযুদ্ধ থেকে ঋষিশ্রাদ্ধ সর্বব্যাপারেষু তড়িঘড়ি ফতোয়া দিতে কবে আমরা পিছ-পা?

টেলিপ্রিণ্টার ঝটপট কাগজ চিবোয় আর দিস্তা দিস্তা উগরে দেয়, টাইপরাইটারে ফটফট হরফ ফোটে, সব ছিঁড়ে জুড়ে কাঁচিকাটা বিদ্যা ফলিয়ে আমরা নিজেদের বলি 'শাবাস'।

কিন্তু আসলে তো আমরাও এক-একটি ধৃতরাষ্ট্র? কান দিয়ে দেখি, সঞ্জয়েরা সবিস্তারে যা বলেন তার বাইরে বিন্দু কিংবা বিসর্গও জানি না।

সঞ্জয় হতে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের এবার কাল হল। রিপোরতাজ তাকে দিয়ে হবে না।

তবু তার মনে অবিস্মরণীয়ভাবে আঁকা হয়ে গেল কয়েকটি ছবি। ছবির পর ছবি।

বাঘের কপিশ চোখে আমরা যেমন জঙ্গলের ছায়া দেখি, তেমনই—'আমরা যাইনি যুদ্ধে।' যাই না। 'শব আর মানুষের মাঝখানে জানি নাই কম্পিত মুহূর্ত।'

তবু তার আভা দেখেছি, বুঝি, আর নাই বুঝি, কিছু পেয়েছি অনুমানে।

› সীমানা পেরিয়ে অসীম প্রান্তর, ইতস্তত ছায়া। জালের মশারির তলায় ঘুমন্ত সাঁজোয়া গাড়ি। বাতাসে বারুদের গন্ধ এখনও মেলায়নি, দূরে দূরে দেখা যায় ধূমকুণ্ডলী, কোন্ গ্রাম পুড়ছে? থেকে থেকে দিগন্তে আচম্বিতে গুম্ গুম্ ধ্বনি, কাদের তোপের তেষ্টা এখনও মেটেনি?

শুখাভুখা কুকুর-বেড়াল সেই আওয়াজে ইতিউতি পালায়, দিশাহারা কাক-চিলে ত্রস্তে উড়ে যায়।

খানিক খাওয়া খানিক ঝলসানো পশুর লাশ। বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে, নাকে রুমাল দিয়ে আগন্তুক আমরা ক'জন এগোচ্ছি।

"সাবধানে পা ফেলবেন, এখানে ওখানে ওরা মাইন ফেলে রেখে গেছে"—পিছন থেকে বেজে উঠল হুঁশিয়ার গলা, পথপ্রদর্শক সামরিক অফিসারের।

রাস্তার পিঠে যত্রতত্র পিচের ছাল ছাড়ানো। ক'দিন আগেই এখানে প্রতি ইঞ্চির জন্যে প্রাণপণ লড়াইয়ের পরে আমাদের জওয়ানেরা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছে।

চিহ্ন তার সর্বত্র ছড়ানো। গুলি-কারতুজের ছড়াছড়ি, চোট-খাওয়া ট্যাঙ্কের গড়াগড়ি। অপরপক্ষ ফেলে পালিয়েছে। এরই কি কৌলিক নাম প্যাটন আমরা গুনতে চাইলাম। কিন্তু ডোগরাইয়ে, বার্কিতে, ডিবিপুরায়, মেহমদপুরে—কোনটার শুঁড় নেই কোনটা অস্থিসার, গুনব কত?

অধুনা পরিত্যক্ত ইমারতের পর ইমারতের দেয়ালে দেয়ালে বসন্তের ক্ষত। অনুভব করলাম সেইদিন, যেদিন বাদলের বারিধারাপ্রায় গোলাগুলি পড়ছিল, রক্ত ঝরছিল। শূন্য অক্ষিগোলকের মত কুতকুতে বাংকার, পাকিস্তানী বিবর-ঘাটি। ইশোগিল নহর বরাবর। চোখ ঝলসে উঠেছিল। আবার কি ঝলসাবে?

"ভেবে দেখুন সেই রাত্রি ভয়ঙ্কর। অন্ধকারে দিশা মেলে না, নিশানা ঠিক থাকে না। বাইরে লড়াই, ভিতরে লড়াই, লড়াই গলিতে গলিতে। ক্রমাগত গুলি ছুড়ে ছুড়ে এগোনো। সেই প্রেতলোকে কে বলে দেবে কাকে ঘায়েল করছি, মারছি কাকে—দুশমনকে না আপনার জনকে।"

তা ঠিক। কে, কোন্ জাতের, অন্ধকারের গায়ে সেই তকমাটা থাকে না।

ইশোগিল খালের পাড়ে দাঁড়ালুম। আমাদের পতাকা পতপত উড়ছে। ওপারে বিপক্ষের টহলদারেরা ভুরু কুঁচকে আমাদের লক্ষ্য করছে।

"থানা বার্কি, জেলা লাহোর।" সেখানেও ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা। কিন্তু কত পিছে সেই জগৎ, স্বপ্ন দিয়ে যা তৈরী, এবং স্মৃতি দিয়ে ঘেরা?

বেশি পিছনে নয়। বার্কি থেকে চলেছি ডিবিপুরার পথে। দু'ধারে খেত, স্তোকনম্র ফসল, শিসে-শিসে ফড়িং, হেমন্তের হাওয়া, কাঁচা রোদ। ফসলগুলি নতুন সুখে কাঁপছে। কী ঘটে গেল, কী ঘটবে, ওরা তার খবর পেলে না।

জানে না পলাতক চাষী, গ্রামবাসী আবার ফিরে ওদের গোলাজাত করবে কি না।

বুনো ঘাসের আড়ালে কয়েকটা বক বসে ছিল, আমাদের জিপ্-এর চক্রনেমির ঘর্ঘর রবে নির্বিকার ঐকতানে উড়ে গেল।

আর দেখেছি কাপাসের ফুল, অজস্র, অপর্যাপ্ত। মরা ট্যাংকের শবাধার ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে।

সীমানার এপারে আমাদের ক্ষেতে দেখেছি অশ্বারোহী শিখচাষীকে। প্রশান্ত, অটল। ঝড় বৃষ্টি মেঘের পর আকাশ যেমন আবার নীল-নির্মল। এই সেদিন এরা দলে দলে ভাড়েকা অথবা নিজী ট্রাক চালিয়ে নির্ভয়ে রসদ পেঁাছে দিয়ে এসেছিল ফ্রণ্টের জওয়ানদের। আজ আবার দলে দলে মাঠের কাজে নেমে পড়েছে।

ডোগরাইয়ের জঞ্জালে কুড়িয়ে পাওয়া একটি চিঠি। এক পাক সিপাহীকে লিখেছিল তার আত্মীয়, "কাফেরকো খুব মারো। ইনশা আল্লা ফতে হমারি হোগী।" এই জাতিবৈর আর জংগী প্ররোচনা যেমন ভুলতে পারব না, তেমনই ভুলতে পারব না, বারকি গ্রামের সেই আশির কোঠার বুড়িকে। তার সমর্থ ছেলে-বউ তাকে ছেড়ে কা-কস্য উধাও।

"কতকাল ওদের খাওয়ালাম, পরালাম, অথচ ওরা কিনা পালাবার সময় বুড়ি মায়ের পানে একবার ফিরে তাকাল না?"

আমাদের জওয়ানদের দেওয়া দুধের বাটিতে চুমুক দিচ্ছিল বুড়ি, আর বলছিল। দুধের সঙ্গে ওর চোখের জল মিশছিল।

কেউ রাস্তার উপর উপুড় হয়ে ছোট ছোট জিনিস কুড়িয়ে নিচ্ছিলুম, স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে যেতে হবে না! ভাঙা বন্দুক, ফাঁকা 'শেল', আরও কত কী। বিধ্বস্ত একটা ছোট দোকান, টুকরো কাঁচ, দোমড়ানো টিন।

—"এখানেও বুলেট পাবেন, এই দেখুন", সামনের ভদ্রলোকের প্রেরণায় আমিও হাত বাড়িয়ে দিলুম। নরম ঠেকল কী -আরে, এ-যে জুতো এক পাটি।

আলোয় এনে দেখলুম—ঠিক আমার ছোট মেয়ের মাপের।

জুতোটা ওখানেই নামিয়ে রেখে এসেছি।

কুড়িয়ে পাওয়া স্মৃতিচিহ্ন।

রাজধানী দিল্লির সান্ধ্য সাংবাদিক-চক্রে এই সেদিনও অভিজ্ঞানগুলি হাতে হাতে ফিরেছে। ইনি দেখিয়েছেন ওঁকে, উনি একে, যিনি যাকে পেয়েছেন। প্রায় দুটি গোষ্ঠী—হ্যাভ আর হ্যাভ-নট, যাঁরা ফ্রনট-ফেরত তাঁরা আজ কৌলীন্যে যেন সেকালের বিলাত-ফেরতদের সমান।

স্মৃতিচিহ্ন।

যাঁদের হাত খালি, তাঁরা ঝুঁকে পড়ে বলেন, "কোথায় তুমি কুড়িয়ে পেলে ইহুরে।"

"কেন, জম্মু থেকে শিয়ালকোটের পথে।"

কিংবা—

"লাহোর সেকটরে।"

বলা বাহুল্য, "লাহোর" শব্দটি উচ্চারিত হয় জোরে, কিন্তু "সেকটর" কথাটা তার চেয়ে একটু আস্তে, ইতি-গজ গোছের লেজুড় হিসাবে।

লাহোর সেকটর কিন্তু লাহোর শহর নয়। কেন নয়, কেউ জানে না। ব্যাখ্যা বিস্তর ও বিবিধ, তার কোনটা স্ট্র্যাটেজিক, কোনটা রাজনৈতিক, কিন্তু মন মানে না।

—"এ কি ঠিক যে, আমরা পহেলা দিনেই লাহোর-শহরগুলির কয়েক রশির মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিলুম?"

—"ঠিক। মাইল ফলকের ছবি তো ছাপা হয়েছে। দেখেননি, '১৫' অংকটি অঙ্কিত হয়ে আছে?"

—"দেখেছি।"

—"ইশোগিলের পাড় থেকে আরও কিছু কম। মনে রাখবেন, ওই দূরত্বের হিসাব শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে। বড় বড় শহরের ব্যাসার্ধ শহুরগুলি মিলিয়ে কম-সে কম আট-দশ মাইল তো হবেই। বাস্, বাদ দিন। হাতে রইল কত? চার পাঁচ মাইলের বেশি না। কোন-কোন পয়েনটে আরও কম সোজা অঙ্কের হিসেব।"

"এ কি ঠিক যে, কসুরের এ পাশের লড়াইয়ে আমরা ভিবিপুরার প্রান্তরে যে-ফাঁদ পেতেছিলুম, ওরা তাতে এগিয়ে এসে পা দিয়েছিল?"

"ঠিক। বেহাল হাড়গোড় ভাঙা ট্যাংকের পর ট্যাংক, স্বচক্ষেই দেখে এলাম। পাকিস্তান সেদিন পালাতে পথ পায়নি। চ্যবন বলেছিলেন, 'ডিসাইসিভ ভিকটরি'—যথার্থ।"

সবই ঠিক। টুকরো টুকরো যত খবর এ-যাবৎ বেরিয়েছে, তার কোনটাতে ভুল নেই। তবু এ-যেন বিচিত্র এক জমাখরচের খাতা, হিসাবের টোকাটুকি সব ঠিক, কিন্তু যোগফল ঠিক মিলছে না, উনিশ বিশ নয়, বিশ উনিশ হয়ে যাচ্ছে।

"অভীষ্ট সিদ্ধ?" অহরহ প্রচারিত এই ঘোষণা নিয়ে তর্ক তুলব না। সিদ্ধ নিঃসন্দেহে। পাক মুর্গী জবাই না হোক, মুর্গী ঠিক বুঝেছে, এখানে-ওখানে ঠোঁট ঠোকরালে কোন ফয়দা হবে না।

সেই অর্থে সিদ্ধ। তবু সব চাল সিদ্ধ হয়ে গেলেও কাঁকর থাকে। তারই কয়েকটি দাঁতে বাজছে।

সাপটা ঝাঁপিতে মুখ লুকোল মাত্র, তার বিষ দাঁত ভাঙেনি।

মনে রাখতে হবে এ-যুদ্ধ আমাদের বটে, কিন্তু আমরা সৃষ্টি করিনি, পাকিস্তানী ফরমাসে তৈরি। কাশ্মীরকে মুসলিম জাহানের খাস করার খোয়াব তার অনেক দিনের। শ্বেত-পীত নানা দরগায় সিন্নি চড়িয়ে আয়ুব শেষ কথা বুঝেছিলেন, কোনও দয়াল সত্যপীর তাঁর হয়ে মুশকিল আসান করে দেবে না, তাঁর হয়ে কেউ বাদাম ভেজে তুলে আনবে না উনুন থেকে। পিঠ-চাপড়ানি, সেই সঙ্গে হয়ত কিছু পকেট-মনি, বড় জোর "ডু-ইট-ইয়োরসেলফ" উসকানি।

সুতরাং "নাউ অর নেভার" (নারায়ে তগদির?) সোর তুলে দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি সমরে চলিনু হামি। কে? না আয়ুব সাহেব।

কিন্তু আয়ুব সাহেব তো আর ঘোড়সওয়ার নন, সওয়ার তিনি শেরের। ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে আসীন হওয়ার বিপদই ওই, প্রাণপণে তাকে জড়িয়ে হাঁকাতেই হয়, নামলে বিপদ, পড়ে গেলে তো কথাই নেই, একেবারে বাঘের পেটে।

"হেট ইনডিয়া" ক্যামপেন বস্তুত "হেট হিন্দু।" আমাদের প্রচারে আমরা কিন্তু পাকিস্তান যদিও ইসলামী মুলুক, তবু তাকে বিপক্ষীয় রাষ্ট্ররূপেই উল্লেখ করেছি, মুসলিম স্টেট হিসাবে দেখিনি। এই কাওয়ালি গানে দোহার, তবলচি সংগত করনেবালা সারেঙ্গ। বিস্তর, প্যালা দেনেবালা মুরুব্বিও অঢেল, কিন্তু মূল গায়েন জঙ্গীশাহ আয়ুব স্বয়ং।

এই রণসাধ পাকিস্তানের জন্মগত, তা সাধটুকু তার অক্ষয় হোক, কিন্তু সাধ্যটা আমরা ঘুচিয়ে দেব, এই তো ছিল আমাদের লক্ষ্য?

সেই লক্ষ্য আর লাহোর, এই দুই লক্ষ্য এবার এক হতে পারত। ফৌজী জওয়ানদের অবস্থিতি পরিদৃষ্টে আমার দৃঢ় ধারণা, লক্ষ্যভেদ অসম্ভব ছিল না।

লাহোর দখল করলে অশেষ দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়ত, অসামরিক জনসাধারণের শাসন এবং পোষণের ভার -ঠিকই। কিন্তু এও কি ঠিক নয় যে, দুচারটে তোপ লাহোরের বুকে এসে পড়লে অসামরিক অধিবাসীদের অন্তত দশআনা বারোআনা আতঙ্কেই পলাতক হত? সব দেশে সব যুদ্ধের নজির তাই।

প্রায় পরিত্যক্ত হত লাহোর-নগরী, পাকিস্তানের কলিজা বন্ধ হত।

কেন না, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের আত্মাটি যদিও আলিগড় থেকে আহৃত (একালের শল্যশাস্ত্রে যাকে গ্রাফটিং বলে) তার হৃৎকেন্দ্র হল পশ্চিম পাঞ্জাব। সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, পূর্ববঙ্গ প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ মাত্র।

একটি শহরের কয়েক বর্গমাইল দখল করলে যে ফল হত, হাজার বর্গ-মাইল হস্তগত করলেও তার সমান হয় না। আয়ুবশাহীর তখ্‌তখানি টলে যেত।

কিন্তু দখল করা পরের কথা, লাহোর তাক করে আমরা নাকি একটি তোপও দাগিনি।

অথচ আমরা লাহোরের চৌকাটে দাঁড়িয়ে আছি। শিয়ালকোটেরও।

এ কী করুণা, হে করুণাময়?

এই করুণা কিন্তু পাক-চরিত্রে লেখে না। তারা অসামরিক লক্ষ্য রেয়াত করেনি, এমন-কী লড়াইয়ের হাউই ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে পূর্বাঙ্গনেও।

অমৃতসরের উপকণ্ঠে আক্রান্ত সেই বাজারটি দেখেছি। এক-একটি গৃহ ধ্বংসস্তূপ হয়ে আছে। একটি ভাঙা দেওয়ালের গা ঘেঁষে শীর্ণ একটি ঝলসানো নিমগাছ কাঁপছে। অন্ধ্রবীর রাজু (বিজয়ী, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে বিনয়ী, স্বল্পবাক, অর্থাৎ সে কথার নয়, কাজের মানুষ। ভুলব না আমাদের বাসের চালক সেই সরদারজীকে। রাজু সেখানে আছে শুনে, লম্বা লম্বা পা ফেলে সে ছুটে এসেছিল, তার কাঁচাপাকা দাড়ির ফাঁকে কৃতজ্ঞ কৃতার্থ আনন্দের আকুলতা ফুটেছিল। রাজুকে জড়িয়ে, তার বুকে মুখ ঘষে ঘষে সে কেবলই বলছিল—'রাজু, তুম্ রাজু!'), অমৃতসরকে বাঁচিয়েছে তার শব্দভেদী কৌশলে, নিপুণ-নির্ভুল নিশানায়। অন্যথা আরও অগুনতি অগ্নিকুণ্ড তৈরি হত।

॥ পাঁচ ॥

ভেবে দেখুন, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের সেই উদ্দীপক রাগিণীর দিনটি। "লাহোর-চলো।" জওয়ানদের জয়যাত্রার পিছে পিছে চলেছে জাতির প্রার্থনা, উন্মূল হিন্দু-শিখ নরনারীর স্বপ্নটি আবার মুকুলিত হয়েছে : ফিরে যাব, আমাদের সেই কেড়ে-নেওয়া ঘর আবার ফিরে পাব।

সেই দুর্বার জলতরঙ্গ রোধিল কে?

কোন্ ক্যানিউটের "তিষ্ঠ" মন্ত্রে শাসিত হল সমুদ্র?

রাজধানী দিল্লির কোন-কোন মহল নাকি বিদেশী লবির প্রম্পটিং শুনতে পেয়েছেন।

কিন্তু প্রত্যহ হয় না। জাতির নেতৃত্বের হাঁটা, চলা, বলা সর্বতোভাবেই আজ জাতীয়, এবং মণ্ডোপরি তার স্বচ্ছন্দ বিহার– কুশীলবদের মুখে অমায়িক আন্তর্জাতিকতার মুখোস আঁটা নেই।

তবু এ-ও ঠিক, বিদেশী মক্ষিকাগুঞ্জন দিনে দিনে সোচ্চার হচ্ছিল অলক্ষ্য চাপ বাড়ছিল। ঈশানকোণে জমছিল (রাষ্ট্র)পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ, আহা, বরিষ ধরার মাঝে শান্তির বারি!

কিন্তু প্রতিজ্ঞা যখন, তখনও তো এ-সম্ভাবনা বিলক্ষণ ছিল। মাঝখানে

সময় ছিল প্রায় পক্ষকাল। আর দুর্জয় ছিল সংকল্প—চাব না পশ্চাতে মোরা। পশ্চাতে কেন, আশেপাশেও না। তবু কি মধ্যপর্বে লজ্জা এসে বাধা দিল, অলঙ্ঘনীয় হয়ে দাঁড়াল জন্মার্জিত কোন সংস্কার, সেই সাবেকী "পাছে লোকে কিছু বলে"?

তা লোকনিন্দা বাঁচল কি? আয়ুবের আয়ুষ্কালই কিছু বাড়ল।

বহুকাল জপমালায় বোঝাই করেছি আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের সপ্ত-ডিঙা মধুকর। সওদা বিকোয়নি, খরিদ্দার জোটেনি। রপ্তানির ফর্দ থেকে একেবারে বাদ যাক জপমালা, বাদ যাক কুঁড়োজালি এবং নামাবলী।

শোনা যায়, দিল্লিতে এখন সক্রিয় দু'টি লবি। একটি বামমার্গী, তার পরামর্শ, চীনের সঙ্গে মিটিয়ে ফেলে পাকিস্তানের সঙ্গে শক্ত হাতে পাঞ্জা লড়ি। দক্ষিণমার্গীদের মনোবাঞ্ছা, চীনের সঙ্গে মোকাবিলার আগে পাকিস্তানের সঙ্গে উদ্বাহ ক্রিয়াটা যেন সেরে ফেলি। সেই শুভকর্মে সম্ভবত পিছে দাঁড়াবেন ইঙ্গ-মারকিন পুরোহিতকুল। কিন্তু যৌতুক কি হবে কাশ্মীর?

ভারতের শাস্ত্রীয় নীতি তার পতাকার মতই জাতীয়তার কঠিন ভূমিতে প্রোথিত, এবং ধ্রুব লক্ষ্যে অবিচল, সেই ভরসা। অনুমান, কোন পক্ষের ফুসলানিতেই সে হেলবে না।

॥ ছয় ॥

শুক্রবার সকাল, দিল্লিতে। বেতারযন্ত্রটি খুলতেই কানে এল, 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম।' যন্ত্রটির কান মুচড়ে বোবা করে দিলুম, কেননা, সদ্য-সদ্য রণাঙ্গন থেকে ফিরে মনে যে-সুর অনুরণিত, তার সঙ্গে এ-গান মিলছিল না।

ভুল বুঝবেন না, যিনি রঘুপতি তথা রাঘব, তাঁর সম্পর্কে আমার কিছুমাত্র অভিযোগ নেই, শ্রদ্ধা আছে। তিনি বীর, ধনুর্ধর—সীতাপহরণরূপ অসম্মানের প্রতিকারে বদ্ধপরিকর, প্রয়োজনবোধে, অন্যায়ের শোধ তুলতে, দেশের সীমানা লঙ্ঘন করতে তাঁরও অরুচি হয়নি। আমার আপত্তি ওই গানের ইনানো-বিনোনো সুরে। আঠারো বছর ধরে ওই সুর ক্রমাগত বেজেছে—আর না। জাতির প্রার্থনার কথাগুলি যদিও-বা যা ছিল তাই থাকে, তবু তা নতুন, বলিষ্ঠ সুরে টঙ্কৃত হোক না!

আধুনিক যুদ্ধ ও সাঁজোয়া বাহিনী

আধুনিক যুদ্ধে ফয়সালাকারীর ভূমিকাটি সর্বদাই নিয়েছে সাঁজোয়া বাহিনী। এর সফলতায় বা ব্যর্থতায় বহু অভিযানেরই ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পশ্চিমা মরুভূমিতে রোমেলের প্যানজার বাহিনীর হাতে বৃটিশ সাঁজোয়া বাহিনী যেভাবে সাবাড় হচ্ছিল, তাতে মিশর প্রায় হাতছাড়া হচ্ছিল এবং অষ্টম বাহিনীকে সিরিয়ায় পিছু হটে আসতে হয়। নেহাৎ ভাগ্য-জোরেই, কয়েক মাস আগে পোঁতা একটি 'মাইন ফিলডের' খবর জার্মানরা জানত না। বৃটিশ ঘাঁটি ঘেরাও করতে গিয়ে জার্মান প্যানজাররা সেই মাইন ক্ষেত্রের উপর এসে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পিছু হটে।

বৃটেনের ভাগ্য ভাল, তাই আমেরিকাকে মিত্ররূপে পায়। সে আমলের শক্তিশালী শেরম্যান ট্যাঙ্ক পাঠিয়ে আমেরিকা সেদিন বৃটেনের ছিন্নভিন্ন সাঁজোয়া বহর আবার গড়িয়ে দেয়।

সাম্প্রতিক ঘটনাদৃষ্টে বোঝা গেল, ভারতের ভাগ্য বৃটেনের মত নয়। বস্তুতঃ, একটুও না বাড়িয়েই বলা যায়, ভারত তাঁর সাঁজোয়া বাহিনীকে ভাইকার ট্যাঙ্কের দ্বারা নতুন শক্তিতে সঞ্জীবিত করার যে চেষ্টা করছে, তাতে বৃটেন বাধাই দিয়েছে। এই ভাইকার ট্যাঙ্ক আমাদেরই নির্দেশিত বৈশিষ্ট্যসহ আমাদেরই জন্য, এবং ভারতীয় করদাতাদেরই টাকায় তৈরি হয়েছিল। তৈরি সম্পূর্ণ, ভারতে তা পাঠাবার জন্যও সবকিছু ঠিকঠাক। কিন্তু বৃটিশ সরকারের হুকুমে পাঠানো বন্ধ হল। যে সময় ট্যাঙ্কগুলি ইংল্যানড থেকে এসে পেঁছিত, তখন পাক-ভারত যুদ্ধের ফলাফলে এমন কিছু হেরফের ঘটত না। যুদ্ধ শুরুর পরই অরডার দেওয়া হয়েছিল। এতদ্দ্বারা এই হুঁশিয়ারিই আমরা পেলাম যে, আমাদের
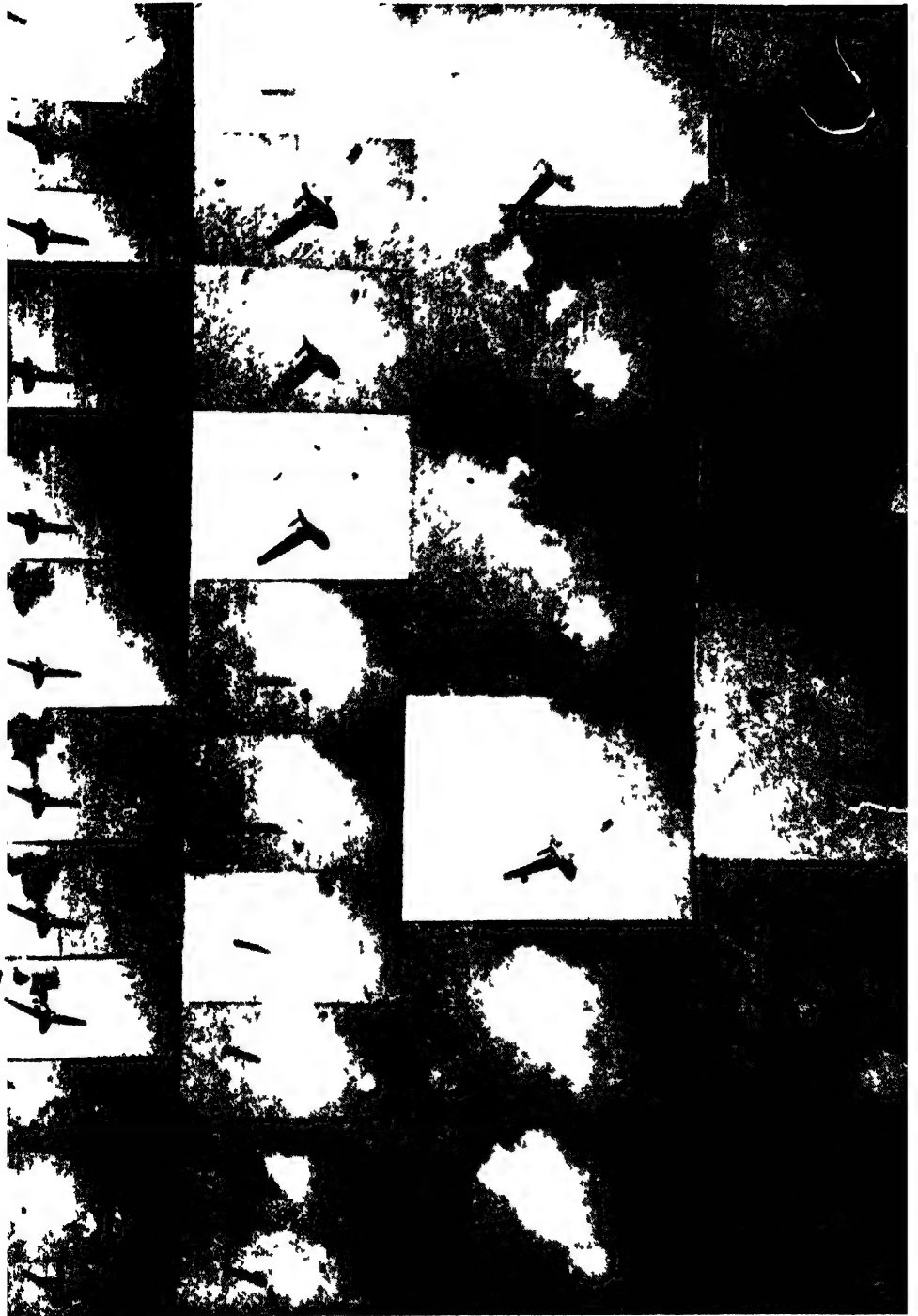
চলচ্ছবিতে পাক-বিমানের অন্তিম কয়েকটি মুহূর্ত। ভারতীয় বিমান-বাহিনীর ফ্লাইং অফিসার ডি কে নেব তাঁর ন্যাটার বিমান থেকে, হালওয়ারার উপরে, একটি পাকিস্তানী এফ ৮৬ স্যাবর জেটের উপরে গুলি চালান। তারপর আগুন ধরে গিয়ে স্যাবরটি যখন টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, শ্রীনেবের সিনে-গান্ ফিল্মে তখন এই ছবিটি ধরা পড়ে।

বাহিনীকে আধুনিক কবে গড়ে তোলাব ব্যাপারে পরনির্ভবতা কি মারাত্মক!

গত কযেক মাস ধবে পাকিস্তান আমাদেব প্রতি যে মনোভাব দেখাচ্ছিল, এবং আক্রমণেব জন্য যে সমযটি সে বেছে নেয প্রথমে কচ্ছেব বানে, তাবপব ছামবে এবং শেষে পাঞ্জাবে বড বকমেব আক্রমণেব প্রস্তুতি—এ সবই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এক মার্কিন পর্যবেক্ষক বলেছেন মাবচ মাসেই তিনি বুঝেছিলেন পাকিস্তান আমাদের আক্রমণ কবতে চায। যুদ্ধোপযোগী কবে ওদেব ট্যাংক-গুলিকে তখন বঙ কবা হচ্ছিল এবং কিছু একটা প্রস্তুতিব জন্য চাপা উত্তেজনাব ভাব তখন ওদেব মধ্যে দেখা যায। প্যাটন ট্যাংকেব কামানেব থেকেও উন্নত ১০৫ মিলিমিটাবেব কামানওলা ট্যাংকেব জন্য ইংল্যাণ্ডেব ভাইকাব প্রতিষ্ঠানেব সঙ্গে ভাবত যোগাযোগ কবেছে, এটা কোন গোপন কথা নয, আমবাই তা খোলাখুলি ঘোষণা কবি। পাকিস্তানও ভালভাবেই জানত অকটোবব নাগাদ ভাইকাব ট্যাংকেব চালান ভাবতে পৌছবে। আমাদেব সাঁজোযা বাহিনী যদি এই ট্যাংক দ্বাবা পুষ্ট হয, তাহলে অন্ততঃ এমন একটি ট্যাংক বেজিমেনটও আমবা গডতে পাবব, যাব তুল্য কোন ট্যাংক পাকিস্তানেব নেই। এই কাবণেই কি পাকিস্তান ভেবে নেয তাদেব থেকে উন্নত ধবনেব ট্যাংক ভাবতেব জন্য আসাব আগেই, আক্রমণ কবে জিতে নেবে? এটা ভাবা মোটেই অযৌক্তিক হবে না যে মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রকে প্রকাশ্যেই প্যাটন ব্যবহাবেব দ্বাবা অগ্রাহ্য কবে ছামবে তাবা যে ধাক্কা দেয তাব সময নির্বাচনেব হেতু ওই ভাইকাব ট্যাংক এবং এব ফলে ভাবতেব যে প্রতিক্রিযা হবে সেটাকে সর্বাত্মক যুদ্ধেব জন্য অজুহাত হিসাবে ব্যবহাব কবতে পাববে।

পাকিস্তান যেভাবে পবাজিত হল এবং যে পবিমাণ ক্ষতি তাব হযেছে, বিশেষ কবে সাঁজোযা বিভাগে তাতে কিছু বিশেষজ্ঞ এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে কযেক বছবেব জন্য ওদেব সমব যন্ত্রটি বিকল হযে গিযেছে। কথাটা ঠিকই, তবে ততক্ষণই যদি না কেউ পর্যাপ্ত পবিমাণে ক্ষতিপূবণ কবে দেয। একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ এই সূত্রে এসে পডে। সাঁজোযা বহবেব ক্ষেত্রে ভাবত ও পাকিস্তানেব যে তুল্য মূল্য অবস্থা, অন্তত সংখ্যাব জোবেব দিক থেকে তাতে সাঁজোযা বিভাগকে কি বর্তমান পর্যাযেই বেখে দেওযা চলে? পাকিস্তানেব যা ঘটল, তাকে যদি উদাহবণ হিসাবে বাখি তাহলে বলব এটা "একটি ঝুডিতে সব ডিম বাখাব" মত ব্যাপাব যুদ্ধে অভাবনীযেব স্থান আছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত বহবেব ক্ষতিপূবণ কবাব যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যতক্ষণ না থাকছে, বিপর্যযেব সম্ভাবনা ততই প্রকট হবে।

সাঁজোয়া বিভাগকে বর্তমান শক্তিব পর্যাযে বেখে দিলে বিপজ্জনক ঝুঁকি নেওয়া হবে। বর্তমানেব থেকে দ্বিগুণ, পাবলে তিন গুণ এর ক্ষমতা বাডানো দবকার। প্রতিবেশীর মতিগতি যখন অনিশ্চিত, তখন আত্মতুষ্টিব ভাব

দেখানোটা অবিজ্ঞজনোচিত। ডিম আর প্রতিজ্ঞা যে সহজেই ভাঙ্গা যায়, তা কে না জানে!

এই যুদ্ধে পাকিস্তানীদের দ্বারা চালিত প্যাটন ট্যাংকের মর্যাদা বেশি রকমেই খোয়া গিয়েছে। ক্রমাগতই ধ্বংসীকৃত প্যাটনের সংখ্যার কথা বলা হচ্ছে এবং কাহিল প্যাটনের ছবি থেকে এমন একটা ধারণাই হয়, এর সম্পর্কে যত হাঁকডাক শোনা গিয়েছিল ততটা ক্ষমতাবান নয়। এর থেকে ভুল কথা আর কিছু হতে পারে না। অন্যদিকে সেনচুরিয়ান এবং ক্ষেত্রবিশেষে শেরম্যানের কৃতিত্বের কথা বড় করে বলা হচ্ছে।

কোরিয়ার যুদ্ধে প্যাটন প্রথম তার লড়ুয়ে ক্ষমতার পরিচয় দেয়। উত্তর কোরিয়া যখন মাঝারি আকারের রুশ ট্যাংক দিয়ে শেরম্যানদের কচুকাটা করছিল তখন প্যাটন মঞ্চে অবতীর্ণ হয়।

এর ৯০ মিলিমিটারের কামান, গতিবেগ, গোলা ছোঁড়ার ক্ষমতা ও চটপটে ঘোরাফেরার সঙ্গে আরো বহু ব্যাপার যুক্ত হয়ে একে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মাঝারি আকারের ট্যাংক পরিণত করেছে। পদাতিক বাহিনীকে সাহায্য করার এবং আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে দখলদারি পর্যায়ে ব্যবহারের মত করেই প্যাটন তৈরি হয়েছে এবং এসব কাজে তার যোগ্যতাও প্রমাণ করেছে। দিনে বা রাতে দ্রুতগামী কনভয়ের সঙ্গে তাল রেখে যেমন চলেছে, তেমনি ঘণ্টায় দুই থেকে তিন মাইল গতিতে পদাতিকদের সঙ্গ দিয়েছে। সরাসরি ট্যাংকধ্বংসী কামান হিসাবে যেমন গোলা ছুঁড়েছে, তেমনি গোলন্দাজ বাহিনীর কামানের মত অপ্রত্যক্ষ শত্রুর উদ্দেশ্যেও গোলা ছুঁড়েছে। কোরিয়া যুদ্ধে প্যাটনই ছিল সেরা ট্যাংক। পদাতিক এবং ট্যাংক এই দুই বাহিনীর লোকেদেরই আস্থা সে দ্রুত অর্জন করেছিল।

কোরিয়ার যুদ্ধে সেনচুরিয়ানেরও প্রথম মঞ্চাবতরণ, যে মুশকিলটি হবে বলে আশা করা গিয়েছিল, সেই মাটি আঁকড়ে চলার অসুবিধাটাই দেখা দেয়। সব থেকে বেশি করে নরম ধানখেতে এবং দ্রুত ঘোরার সময় চাকার শিকলের আবরণ খুলে যাওয়া। অসুবিধাগুলি অবশ্য পরে দূর করা হয়, তবে কঠিন লড়াইয়ে এই ট্যাংক পরীক্ষিত নয় ফলে এর পূর্ণ কার্যকারিতা জানা যায়নি। আমেরিকানরা সেনচুরিয়ান সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ না করলেও এর বৃটিশ চালকদের ধারণায় এটি ভাল ট্যাংক। এর ২০ পাউনড গোলা ছোঁড়ার কামানটি নিখুঁত লক্ষ্যভেদী হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। দেড় হাজার গজ দূরে থেকে একটি ভাতের থালায় পর্যন্ত আঘাত হানতে পারে। সেনচুরিয়ানকে বাতিল করে বৃটেন এখন চীফটেনকে স্থান দিয়েছে। কিন্তু প্যাটন রয়েই গিয়েছে এবং 'ন্যাটো'ভুক্ত বহু দেশেরই সামরিক ক্ষমতার উপাদান হয়ে রয়েছে। তাই প্যাটনের ক্ষমতাকে তুচ্ছ করে দেখলে ব্যাপারটা মোটেই বুদ্ধিমানোচিত হবে না।

অন্যান্য যন্ত্রের মত ট্যাংকেরও পারদর্শিতা নির্ভর করে তার যন্ত্রীর উপর।

এমন কি হাল্কা ট্যাঙ্কও, উদাহরণস্বরূপ ফরাসী এ এম এক্স-এর কথা বলা যায়, লড়াই করে সেঞ্চুরিয়ানকে ঘায়েল করেছে। আসলে যুদ্ধটা ট্যাঙ্ক করে না। করে এর চালকরা। এদের উপরই ট্যাঙ্কের বিনাশ বা বিজয় নির্ভর করে। সাহস, দৃঢ় সংকল্প এবং জয়ের বাসনা সাফল্যের মূল জিনিস। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধে অসংখ্য সূক্ষ্ম অস্ত্র এবং যন্ত্রপাতি যেখানে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেখানে এইসব গুণাবলী ছাড়া আরও কিছু জিনিস সৈনিকদের মধ্যে থাকা চাই। এইসব অস্ত্র ও যন্ত্রপাতির লক্ষণ বিচার করে সেগুলি মেলাবার দক্ষতা ও বিবেচনা সহকারে তাদের চালাবার বা লক্ষ্যবস্তু ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝে বুদ্ধি ও দ্রুততার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা তাদের থাকা চাই। রীতিমত তালিমের সাহায্যে এইসব যোগ্যতা অর্জন করা যায়, কিন্তু কতখানি দক্ষ সে হয়ে উঠবে, সেটা প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে তার বুদ্ধি ও প্রবণতা এবং জ্ঞানকে অধিগত করার ক্ষমতা ও সঠিকভাবে বিবেচনা সহকারে তা কাজে লাগানোর উপর। এই-সবের অভাবের জন্যই কি প্যাটনের এমন হতাশজনক ফল প্রদর্শন? অথচ এই ট্যাঙ্ক সম্পর্কেই বলা হয়, এমন সব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এতে আছে যে, সাধারণ বুদ্ধির একটু উপরের স্তরের চালকের হাতেই এর পূর্ণ ক্ষমতার প্রকাশ সম্ভব।

প্যাটনের ব্যর্থতার এইটিই হয়ত কারণ, কিন্তু তা স্বীকার করে নেওয়া কঠিন, অন্তত পাকিস্তানী বাহিনীর মারকিন উপদেষ্টাদের রিপোর্ট যদি খাঁটি হয়। তাদের কথা থেকে এই বিশ্বাসই হয় যে, মার্কিন যন্ত্রপাতি চালাবার ক্ষমতা বা তালিম দেবার বহর খুবই উঁচু পর্যায়ে পেঁাছেছিল। মার্কিন যন্ত্রসজ্জিত ইউনিট এবং ছকগুলি মহড়াকালে পাকিস্তানী সেনাধ্যক্ষ ' এমনই রণকুশলতার সংগে পরিচালনা করেন, যার পরিণতি শেষ পর্যন্ত ফুলের তোড়া বিলোনোয় গিয়ে পেঁাছয়। এইসব যন্ত্রের ব্যবহার বিষয়ে পাকিস্তানীদের ক্ষমতা সম্পর্কে যদি তাদের বিন্দুমাত্রও দ্বিধা থাকত, তাহলে মারকিন উপদেষ্টারা শত কষ্ট স্বীকার করেও ওদের এই ত্রুটি সারিয়ে দিতে কার্পণ্য করত না। শত্রুকে কদাচ খাটো করে দেখবে না, এটাই হল প্রধান মন্ত্র। পাকিস্তানী সেনারা নির্বোধ, এর থেকে বিভ্রান্তিকর এবং বিপজ্জনক ধারণা আর কিছুই হতে পারে না। সুতরাং ওদের ব্যর্থতার কারণ অন্যত্র খুঁজতে হবে।

কোরিয়ার যুদ্ধে আধুনিক সবরকমের অস্ত্রই প্যাটন সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করেছে। এইবারের যুদ্ধে এক ত্র যে অস্ত্রটি কোরিয়া যুদ্ধের অস্ত্র-গুলি থেকে উন্নত, তা হল বাজুকার বদলি হিসাবে ব্যবহৃত ১০৬ রিকয়েললেস রাইফেল। কোরিয়ায় অবশ্য প্যাটনকে বিমান দ্বারা আক্রান্ত হতে হয়নি। কিন্তু এই যুদ্ধের হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে, ট্যাঙ্কের সব থেকে বড় খুনী হল বিমান। "ট্যাঙ্ক সাবাড়" অভিযানে তাদের সঙ্গে লড়বার যোগ্যতা কোন ট্যাঙ্কেরই নেই। একবার যদি তাদের দেখতে পায়, তা সে বনে জঙ্গলে, নালায় বা পাহাড়ের

আড়ালে যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন আর রক্ষা নেই। বিমান তাদের উপর মারাত্মক আঘাত হানতে সক্ষম।

সাম্প্রতিক যুদ্ধে ভারতীয় বিমানবাহিনী চমৎকার সহায়তা দিয়েছে স্থল-বাহিনীকে। হানটার ও মিসটেয়ার বিমানগুলি এ কাজের জন্য নিজেদের আদর্শ হিসাবে প্রতিপন্ন করেছে। তাদের আক্রমণ পাকিস্তান সাঁজোয়া বাহিনীর অবর্ণনীয় ক্ষতির কারণ হয়। এবং এর ফলেই পাকিস্তানী ট্যাংক চালকদের মনোবল ভেংগে যাওয়ায় তারা ট্যাংক চালনায় নিম্নমানের পরিচয় দেয় এবং উন্নতভাবে চালিত সেনচুরিয়ান ও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবীণ শেরম্যান তাদের উপর কর্তৃত্বের কারণ হয়, এই যুক্তির সম্ভাবনাটাই বেশি। বিমান আক্রমণের ফলে সাঁজোয়া বাহিনীর অসহায়ত্বের দ্বারা, এ কথা অবশ্য ধরে নেওয়া যায় না যে, আধুনিক যুদ্ধে ট্যাংক বিলাসসামগ্রী। তা হলে তো বলতে হয়, মাটি থেকে শূন্যে ক্ষেপণাস্ত্র প্রচলনে বিমানবাহিনীরও আর কোন মূল্য নেই। সাজোয়া বাহিনীর নির্দিষ্ট ভূমিকা নিশ্চয়ই আছে, তবে এর কার্যকারিতা সুনিশ্চিত করতে বিমান আক্রমণ থেকে এদের রক্ষা করার জন্য আকাশ-পাহারার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার।

সাঁজোয়া বিভাগকে আধুনিক ট্যাংক দ্বারা বলশালী করতে হবে, এ কথা মেনেই নেওয়া হয়েছে। আবাদিতে আমরা ট্যাংক কারখানা স্থাপন করেছি। আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সেখান থেকে প্রথম ট্যাংকটি বেরিয়ে আসবে বলে আশা করা যায়। এটি হবে আগামী বহুর অগ্রদূত। প্রশ্ন হচ্ছে, পরের গুলি কত তাড়াতাড়ি দেখা দেবে। ট্যাংক যেদিন তৈরি হল, সেদিন সে আধুনিক, কিন্তু বছর গড়াবার সংগে সংগে সে পুরনো হতে থাকে, তারপরই বাতিল। সুতরাং উৎপাদনের হার এমন হওয়া চাই, যাতে চাহিদার সময় ট্যাংকগুলিকে আধুনিক শ্রেণী বলে গণ্য করা যায়।

সাঁজোয়া বাহিনীকে ঢেলে সাজাবার জন্য যে পরিমাণ ট্যাংক দরকার, তা দশ-বিশ করে গুনলে চলে না, শ' হিসাবে গুনতে হবে। আবাদি কি এই লক্ষ্য পূরণ করতে পারবে? একমাত্র সময়ই এর উত্তর দেবে। তবে একটি ব্যাপারে কোন ভুল নেই, সাঁজোয়া বাহিনীকে সব থেকে কম পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে যদি সত্যিকারের কার্যকরী যুদ্ধ-যন্ত্র করে তুলতে হয়, তাহলে আবাদিকে বছরে ২০০ ট্যাংক উৎপাদন করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয়, অন্য দেশ থেকে ট্যাংক কেনা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। বিশেষ করেই তা করতে হবে যদি দ্বিতীয় একটি সাঁজোয়া ডিভিশন গড়ার সিদ্ধান্ত আমরা করি।

আবাদি কারখানার কার্যক্ষমতা কতখানি তার প্রতি সযত্ন লক্ষ্য রাখা দরকার। একটি ট্যাংক উৎপাদনে হাজার রকম জিনিস লাগে। যদি তার প্রতিটি জিনিসই দেশে তৈরি না হয় তাহলে বরাবরই বিদেশের উপর ভরসা করে থাকতে হবে।

তারা যদি অবশ্য-দরকারী কোন জিনিস সরবরাহ অস্বীকার করে, তাহলে শুধু পরিকল্পনাটিই নয়, সাঁজোয়া বাহিনীরও ভরাডুবি ঘটবে। ট্যাঙ্ক উৎপাদনের জন্য দরকারী প্রতিটি জিনিস একটি কারখানাতেই তৈরি করা খুব সহজ ব্যাপার নয়, আর্থিক দিক থেকেও সুবিধার নয়। এবং তা করার ক্ষমতা আবাদির আছে কিনা সন্দেহ। সম্ভবত কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রকে এই পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করে থাকবেন। তা করলে কাজটা বিজ্ঞজনোচিতই হবে। একথা তো ঠিক যে, আমাদের নতুন ট্যাঙ্কের প্রথম ফসল যারা ফলিয়েছেন, তারা ইংল্যানডের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান।

ছোটখাট ধরনের শিক্ষা সহজেই মানুষ ভুলে যায়, বড় ধরনের হলে পাকা ছাপ পড়ে। যে শিক্ষা আমরা পেলাম, তা হল, সেকেলে সরঞ্জাম নিয়ে আরামে বসে থাকা চলে না। অস্ত্র এবং সরঞ্জামের আধুনিকীকরণের সঙ্গে যথাসম্ভব পাল্লা দিয়ে চলা ছাড়া আমাদের আর অন্য উপায় নেই। তা করলে পাকিস্তান যে শিক্ষা পেয়েছে, তাতে পাকা ছাপ ফেলা যাবে এবং মারকটোয়েনের কথা, 'ওরা আমার দাঁত শানাল যতক্ষণ পর্যন্ত না তা দিয়ে দাড়ি কামাতে পারি পরে দেখলাম শুধু অজানা লোকেরাই তেঁতুল খায় তবে একবারই", এর মধ্যে যে সত্য নিহিত, তাও পাকিস্তান সমঝাতে পারবে।

কূটনীতি

মৌচাকে গুঞ্জন

কচ্ছ বিরোধ মীমাংসার কর্মপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করে ১৯৬৫ সালের ৩০ জুন দিল্লিতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এপ্রিল মাসে কচ্ছের মরু অঞ্চলে যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছিল, এই চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে তার সমাপ্তি ঘোষণা করল। কিন্তু কার্যত, সংঘর্ষ অনেক আগেই থেমে গিয়েছিল। অবশ্য এ চুক্তি দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত সম্পর্কিত সমস্ত বিরোধের সামগ্রিক সমাধানের পদক্ষেপ বলে সূচিত হল না, যা ও পাকিস্তান টোপ ফেলেছিল এইরকম সমাধানের উদ্দেশ্য নিয়েই, কিন্তু চুক্তির বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে এই আশা প্রকাশ পেল যে, এর দ্বারা সমগ্র সীমান্তব্যাপী উত্তেজনা হ্রাস পাবে।

কিন্তু যে দলিল তৈরীর মূলে আমেরিকার আশিসধন্য ব্রিটেন মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল, তার পাতায় দুই দেশের স্বাক্ষরের কালির আঁচড়টি শুকিয়ে যেতে না যেতে, শঠতার ঐতিহ্যবাহী পাকিস্তান কাশ্মীরের মাটিতে তার জঘন্য খেলার পুনরাবৃত্তি শুরু করল। পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ছিল খুবই স্পষ্ট। বেশ কিছু-দিন ধরে যে কাশ্মীর সমস্যা অনেকটা সুপ্ত অবস্থায় ছিল, পাকিস্তান চেয়েছিল তাকে জীইয়ে তুলতে এবং জোর করে সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার মুরুব্বিদের মদতের জোরে সমস্যার এক পছন্দমাফিক সমাধান করে নিতে।

কয়েকমাস ধরে মুরিতে অবিরাম ট্রেনিং দিয়ে তথাকথিত যে "জিব্রালটার বাহিনী" পাকিস্তান গঠন করেছিল, তাকে তারা কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতি রেখার দিকে পাঠাতে শুরু করল। জুলাই মাসের শেষ দিকে যুদ্ধবিরতি রেখা বরাবর বহুলাংশে পরস্পরবিচ্ছিন্ন অথচ সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি স্থান এবং

আন্তর্জাতিক সীমানার দু-একটি জায়গার উপর পাকিস্তানী সৈন্যেরা গুলি বর্ষণ শুরু করল। এই সব কার্যকলাপের উদ্দেশ্য যে প্রধানত ভারতকে দিশাহারা করা এবং সেই অবসরে পাকিস্তানের স্থায়ী এবং সাময়িক সৈন্যবাহিনী থেকে সংগৃহীত সশস্ত্র হানাদারদের কাশ্মীরে ঢুকিয়ে দেওয়া, তা পরে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

৫ আগস্ট তারিখের মধ্যে বিপুল সংখ্যক হানাদার আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীকে সুকৌশলে এড়িয়ে যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করে কাশ্মীর উপত্যকা এবং জম্মুতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি তাদের মধ্যে কয়েকটি দল শ্রীনগরের উপকণ্ঠে পর্যন্ত পেঁৗছে গিয়েছিল। হানাদাররা সংখ্যায় ৫,০০০-এরও বেশি ছিল। তাদের উপর হুকুম ছিল, রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে যুগপৎ অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে এবং জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে সমস্ত ব্যাপারটিকে ভারতের বিরুদ্ধে এক গণ-বিদ্রোহের রূপ দিতে হবে। কথা ছিল, ৯ আগস্ট তারিখে শেখ আবদুল্লার প্রথম গ্রেপ্তারের দ্বাদশ বার্ষিকী বিক্ষোভ দিবসের সঙ্গে এই বিদ্রোহকে একাকার করে দিতে হবে।

নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে হানাদারদের প্রথম সংঘর্ষ হল ৫ আগস্ট তারিখে, যদিও আন্তর্জাতিক আইন এবং ১৯৪৯ সালের যুদ্ধবিরতি ব্যবস্থার সমস্ত সর্তভঙ্গকারী পাকিস্তানী চক্রান্তের মারাত্মক তাৎপর্য বোঝা গেল আরও তিন দিন পর। শক্তির রাজনৈতিক খেলা ভিয়েৎনামকে এশিয়া এবং বিশ্বের শান্তির পক্ষে প্রতিকূল এক অগ্নিগর্ভ ভূখণ্ডে পরিণত করেছে। এখন আবার কাশ্মীরেও পাকিস্তানের কুকীর্তি একই রকমের আর-একটি অবস্থার সৃষ্টি করল। সুতরাং আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, পরিণামে এই ঘটনা যাতে বৃহৎ যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়ে অন্যান্য দেশকেও তার আওতায় টেনে আনতে না পারে, তার জন্য বিশ্বের তাবৎ রাজধানীতে রীতিমত কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়ে গেল।

ভারত-পাক বিরোধের এই নতুন তরঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত এইসব কূটনৈতিক প্রয়াসের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শান্তি প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা, রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রচেষ্টায় ২৩ সেপ্টেম্বর যে যুদ্ধবিরতি বলবৎ হল, তা এখনও রীতিমত অস্বস্তিকর এবং ক্ষণে ক্ষণে সেখানে গুলিবিনিময় অব্যাহত রয়েছে। এই কম্পমান অবস্থা কতদিন বিরাজ করবে এবং কবে, এমনকি আদপেই কখনো কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হবে কিনা, তা কেউ বলতে পারে না। যেটুকু ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে তা হল এই যে, পাকিস্তানের দীর্ঘকালব্যাপী শত্রুতার সম্মুখীন হওয়ার জন্য ভারতকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

॥ এক ॥

প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নন্দার পরবর্তী সময়ের ভাষ্য অনুযায়ী, পাকিস্তানী অনুপ্রবেশের ফলে যে "মারাত্মক পরিস্থিতি"-র সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রথম পর্যালোচনার জন্য ৮ আগস্ট তারিখে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের জরুরী কমিটির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানী আক্রমণকে "ভারতীয় ভূমির উপর অভিযান" হিসেবে বর্ণনা করার ব্যাপারে ভারত সরকার দীর্ঘ সময় ধরে ইতস্তত করেছিলেন। এমনকি ৯ আগস্ট তারিখেও, যখন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী এক বেতার বক্তৃতায় এই রাজ্যের উপর পাকিস্তানের ব্যাপক আক্রমণপ্রয়াসের কথা উল্লেখ করলেন, তখনও দিল্লির কণ্ঠস্বর দ্বিধাজড়িত। কাশ্মীর কংগ্রেসের নেতা এবং বর্তমানে একজন মন্ত্রী শ্রীমীর কাশেম বলেন, অনুপ্রবেশকারীরা চীনাদের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কম্যুনিস্ট পরিচালিত গেরিলা যুদ্ধের সঙ্গে এই অনুপ্রবেশের পরিকল্পনা ও প্রয়োগের এক অদ্ভুত সাদৃশ্য দিল্লির চোখ এড়াল না। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বললেন, হানাদারদের কাছ থেকে চীনা এবং পাকিস্তানী ছাপ দেওয়া কিছু অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে।

অনুপ্রবেশ সম্পর্কে জরুরী ক্যাবিনেটের প্রথম বৈঠকের দুদিনের মধ্যেই কূটনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবে কাশ্মীরে রাষ্ট্রসংঘের মুখ্য সামরিক পর্যবেক্ষকের কাছে প্রেরিত এক নোটে ভারত ১৯৪৯ সালের যুদ্ধবিরতি ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গের দায়ে পাকিস্তানকে অভিযুক্ত করল। করাচীতে ভারতীয় হাই কমিশনারকে রাওয়ালপিণ্ডির কাছে এক তীব্র প্রতিবাদ জানাবার নির্দেশ দেওয়া হল এবং ভারতের প্রতিবাদকে পাক সরকারের গোচরীভূত করবার জন্য দিল্লিস্থ পাকিস্তানী দূতকে বহির্বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ডেকে পাঠান হল। আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন এবং অন্যান্য সুহৃদ দেশকে পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল করার ব্যাপারেও ভারত আগেভাগেই ব্যবস্থা অবলম্বন করল। রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলকেও পাকিস্তানী আক্রমণের সর্বশেষ সংবাদ এবং তার মারাত্মক পরিণামের কথা জানান হল। সমস্ত শক্তি নিয়ে পাকিস্তানের যুদ্ধবিরতি রেখা লঙ্ঘনের দুরভিসন্ধির মোকাবিলা করবার ব্যাপারে ভারতের সংকল্পও রাষ্ট্রসংঘকে জ্ঞাপন করা হল এবং পাকিস্তানকে তার হানাদার সরিয়ে নিতে এবং ভবিষ্যতে তাকে এই জাতীয় কার্যকলাপে বিরত হতে বাধ্য করতে উ থান্টকে অনুরোধ জানান হল।

১১ আগস্ট রাওয়ালপিণ্ডি থেকে এই মর্মে খবর এল যে, পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো ভারতের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করেছেন। এটা অবশ্য আগেই অনুমান করা গিয়েছিল এবং দিল্লি তাতে বিস্মিত হল না। অত

সহজে এবং অত তাড়াতাড়ি পাকিস্তান তার অপরাধের দায়ভাগ যে স্বীকার করে নেবে না, সেটাই স্বাভাবিক। একদিন বাদেই শ্বাপদের হুংকার শোনা গেল। হানাদারদের কার্যকলাপকে "ভারত-অধিকৃত কাশ্মীরের অভ্যুত্থান" বলে বর্ণনা করে সে এই বলে ভারতকে ভয় দেখাল যে, "ভারত অবশ্যই জানে যে পাকিস্তান নিঃসঙ্গ নয়। পাকিস্তানের প্রতি সারা পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীনতা-প্রিয় মানুষের এবং আফরো-এশীয় দেশসমূহের সমর্থন আছে।......যদি আক্রান্ত হই, তাহলে অত্যাচার এবং পীড়নের পাল্লায় পড়ার চেয়ে বরং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ারই মহত্তম পরিণামের সম্মুখীন হব। কিন্তু সেই পরিণামের গতিপথ সমগ্র উপমহাদেশকে বহ্নিমান করে তুলবে।"

ভারতের প্রেরিত বার্তার উত্তরে ব্রিটেন তৎক্ষণাৎ কিছু বলতে পারল না এই অদ্ভুত অজুহাতে যে, মিঃ হ্যারল্ড উইলসন তখন সিসিলিতে ছুটি উপভোগে ব্যস্ত এবং ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব মিঃ স্টুয়ারট ও কমনওয়েলথ সেক্রেটারী মিঃ বটমলি তখন লন্ডনের বাইরে। পরদিন অবশ্য খবর পাওয়া গেল যে ব্রিটেন যদিও সম্পূর্ণ বিবরণ জানবার জন্য অপেক্ষা করছে, তবু ইত্যবসরে সে ভারত-পাকিস্তান উভয় পক্ষকে সংযম অবলম্বন করতে অনুরোধ করেছে। লন্ডনের ভারতীয় হাইকমিশনার কমনওয়েলথ রিলেসন্স ডিপার্ট-মেন্টে সমগ্র পরিস্থিতির এক "তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ" দিলেন।

আমেরিকার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে, প্রথম দিকে সেখানকার ভারতীয় সংবাদ-দাতারা যে সংবাদ পাঠালেন, সেগুলি অনেকাংশে আশাব্যঞ্জক। কাশ্মীরে এক স্থানীয় বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে বলে পাকিস্তান যে ব্যাখ্যা পাঠিয়েছিল, তার তুলনায়, পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করে সশস্ত্র হানাদার পাঠাচ্ছে এই মর্মে দিল্লির অভিযোগ নাকি ওয়াশিংটনের কাছে অধিকতর সন্তোষজনক মনে হয়েছিল। ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের পর্যবেক্ষকদল পাকিস্তানী অনুপ্রবেশের সত্যতা স্বীকার করে সেক্রেটারী জেনারেলের কাছে এক রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। খুব সম্ভব এই রিপোর্টই আমেরিকাকে ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হতে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল বলে অনুমান করা যায়।

॥ দুই ॥

১২ আগস্ট তারিখে কাশ্মীর-পরিস্থিতির গতিপ্রকৃতি এবং বিশ্বের প্রধান প্রধান রাজধানীর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ভারতীয় ক্যাবিনেট আলোচনায় বসলেন। নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা গেল যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং অনেকগুলি দেশ যে পাকিস্তানী খেলার মর্ম অনুধাবন করতে পেরেছেন, তার ইঙ্গিত সরকার

পেয়েছেন। কাশ্মীর পরিস্থিতির ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘ অথবা অপর কোনো বাইরের পক্ষকে "খুব বেশি" নাক গলাতে দেওয়ার পক্ষপাতী ভারত ছিল না। সরকারের মনোভাব এই ছিল যে, এইসব ঘটনাকে কোনোমতেই বিবাদ বলে মনে করা যায় না এবং সেই কারণেই কোনো তৃতীয় পক্ষের দ্বারা মধ্যস্থতার প্রশ্নও ওঠে না। ভারতীয় কূটনীতিবিদরা আমেরিকা ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে সমগ্র বিষয়টি ব্যক্ত করেন এবং রাষ্ট্রদূত বি কে. নেহরু আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব ডীন রাস্‌কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। এইসব প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল, পরিস্থিতি যাতে আরও সাংঘাতিক হয়ে না ওঠে, তার জন্য হানাদারদের সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করতে আমেরিকা ও রাষ্ট্রসঙ্ঘকে প্রভাবিত করা। শ্রীনেহরু মিঃ রাসক্‌কে বলেন যে, ভারতের দিক থেকে যথেষ্ট সংযম অবলম্বন করা হচ্ছে কিন্তু তার আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং নিরাপত্তা রক্ষার বিষয়ে সে যে তার দায়িত্ব জলাঞ্জলি দেবে, তা আশা করা নির্বুদ্ধিতা। ভারতীয় প্রতিনিধির বক্তব্যে ওয়াশিংটনের প্রতিক্রিয়া কয়েকটিমাত্র শব্দে ব্যক্ত হল : আমেরিকা "দুই পক্ষের এক মীমাংসায় উপনীত হওয়ার আশায় উদ্বিগ্ন রইল"। এদিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পাক প্রতিনিধি মিঃ আমজাদ আলী হানাদার সম্পর্কে তাঁদের দায়িত্ব অস্বীকার করবার জন্য উ থান্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল কিন্তু ইতিমধ্যেই ভারত-পাকিস্তান উভয়ের কাছে সংযত হওয়ার আবেদন জানিয়ে আক্রমণকারী ও আক্রান্তকে সমান পর্যায়ে ফেলেছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই ভারতের পক্ষে এটা উষ্মার বিষয় হল। দিল্লিতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কণ্ঠে এই উষ্মা প্রকাশ্য অভিব্যক্তি পেল। বিশেষত উ থান্ট সম্পর্কে আমাদের রাগত হওয়ার কারণ আরও বেশি এইজন্য যে, এর আগেই রাষ্ট্রপুঞ্জ পর্যবেক্ষক দলের প্রাথমিক রিপোর্টে হানাদার পাঠানোর জন্য পাকিস্তানকে যে দায়ী করা হয়েছিল, তা কারুর অজানা ছিল না।

সংঘর্ষ এক নতুন পরিচ্ছেদে পা দিল, যখন ১৩ আগস্ট তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী এক সুস্পষ্ট প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করে বললেন যে, ভারত বলপ্রয়োগের মোকাবিলা বলপ্রয়োগের দ্বারাই করবে এবং "আমাদের দেশের উপর 'নামমাত্র' ছদ্মবেশী সশস্ত্র আক্রমণের যথোচিত জবাব দেওয়া হবে। দেশের স্বাধীনতা যেখানে বিপন্ন এবং আঞ্চলিক সংহতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন, তখন কর্তব্য একটিই সে কর্তব্য হল সমস্ত শক্তি নিয়ে চ্যালেনজের মুখোমুখী দাঁড়ানো।" শ্রীশাস্ত্রী বহু জায়গাতেই এই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। কিন্তু অপরপক্ষে পাক ডিক্টেটর আয়ুব খান কাশ্মীরীদের "আত্মনিয়ন্ত্রণের দ্বারা ভবিষ্যৎ নির্ধারণের" সেই একই বাঁধা বুলিতে অবিচল।

ইতিমধ্যে পাকিস্তানের চীনা রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে মিঃ ভুট্টোর ৪৫ মিনিটব্যাপী

এক মন্ত্রণা হল। এক সপ্তাহে এটা তাঁদের দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার। জুলাই মাসে পিকিংয়ে চীন সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে চীনা রাষ্ট্রদূত ফিরে এসেছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্ট আয়ুবের সঙ্গেও মোলাকাত করেছিলেন। এই সমস্ত সাক্ষাৎকার এবং পাকপ্রধানদের সঙ্গে মার্শাল চেন ঈ-র কয়েকদিন পরের আর একটি সাক্ষাৎকার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তারপর থেকেই পাকিস্তানের উদ্ধত আচরণ আরও নগ্নভাবে প্রকাশ পেতে লাগল। সাক্ষাৎকারগুলি ভারতের দুই শত্রুর মধ্যে গাঁটছড়া বাঁধা হওয়ারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১৪ আগস্ট লোকসভার বৈঠক। অধিবেশনের প্রাক্ মুহূর্তে কংগ্রেস এম পি.-দের সামনে শ্রীশাস্ত্রী বললেন, কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানের সঙ্গে আর কোনো আলাপ-আলোচনা সম্ভব নয় এবং কাশ্মীর উপত্যকায় পাক আক্রমণের মোকাবিলা করবার পন্থা স্থির করতে হবে। পাকিস্তানীরা যাতে লাদকে ভারতীয় সরবরাহ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে তার দুদিন পর, যুদ্ধবিরতি সীমার পাকিস্তানী দিকের কার্গিল এলাকায় অবস্থিত ঘাটিগুলি ভারত পুনরায় অধিকার করে নিল। মে মাসে প্রথম এই ঘাটিগুলি অধিকার করা হয়েছিল কিন্তু ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ পথটির উপর পাকিস্তানকে আর কখনো উপদ্রব করতে দেওয়া হবে না এই মর্মে রাষ্ট্রসংঘের গ্যারান্টি পেয়ে ভারত ঘাটিগুলি ছেড়ে দিয়েছিল। সেই দিনই লোকসভায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবন বললেন যে, রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষকদলকে পাকিস্তান কোনো আমলই দেয়নি।

কার্গিলে যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করে পাকিস্তানকে প্রথম স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হল যে, যেখানে যখনই দরকার হোক, ভারত সীমারেখা অতিক্রম করবে এবং হানাদারদের আস্তানা পর্যন্ত তাদের তাড়া করবে। ঘটনার গতি দেখে শিগগিরই বোঝা গেল যে, পাকিস্তান এই সাবধানবাণী গ্রাহ্য করেনি এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের যে সমস্ত জায়গা থেকে হানাদারদের উপত্যকায় পাঠানো হতো এবং তাদের খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখা হতো, সেখানকার বেশ কিছু অঞ্চল ভারতকে দখল করে নিতে হল।

॥ তিন ॥

কার্গিলে ভারতের এই ব্যবস্থাবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে আরও তীব্র কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়ে গেল, কারণ একটা কথা ততক্ষণে খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, দুই দেশের মধ্যে একটা বড় রকমের সংঘর্ষের দিকে পরিস্থিতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে। উ থান্ট অবিলম্বে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের

সঙ্গে আলাদাভাবে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁদের রাষ্ট্রসঙ্ঘে আহ্বান করলেন। পাক-ভারত বিষয়ে ব্রিটিশ ফরেন অফিসের বিশেষজ্ঞ মিঃ সিরিল পিকওয়ার্ড মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে পরামর্শের জন্য তাড়াহুড়ো ওয়াশিংটন দৌড়োলেন। বিশ্বস্তসূত্রে ভারত জানতে পারল যে মিঃ পিকওয়ার্ডের কাজ ছিল ভারতের বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনকে ক্ষেপিয়ে তোলা। এই সময় থেকেই ভারত-ব্রিটেন সম্পর্কের দ্রুত অবনতি হতে লাগল এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব তিল থেকে তাল হয়ে উঠল। কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবী ব্যাপক এবং জরুরী হয়ে উঠল। ৩০ জুন তারিখের কচ্ছ চুক্তিতে, বিরোধ মীমাংসার জন্য যে পাক-ভারত পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠক হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, তা এর ফলেই বিনষ্ট হয়ে গেল। আমেরিকার খয়রাতি অস্ত্র কাশ্মীরে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে ভারত পাকিস্তানের নামে আমেরিকার কাছে অভিযোগ পাঠাল, কিন্তু কচ্ছের বেলায় যেমন, এ ক্ষেত্রেও তেমনি আমেরিকার কুলুপ-আঁটা মুখ দিয়ে একটি শব্দও নির্গত হল না এমনকি ভারতীয় জওয়ানদের হাতে তাঁদের বহু সাধের স্যাবার-প্যাটনের নিদারুণ সদ্গতির কথা প্রকাশ হয়ে পড়ার পরেও না!

লাদকে চীনাদের প্রতিরোধে নিযুক্ত ভারতীয় সৈন্যদলের জন্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিরাপদ রাখতে গিয়ে কি অবস্থায় কারগিলের ঘাটিগুলি অধিকার করা ভারতের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল, তা ব্যাখ্যা করবার জন্য ভারতীয় বাহিনীর প্রধান জেনারেল জে এন চৌধুরী শ্রীনগরে পর্যবেক্ষকদলের জেনারেল নিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। নতুন সংঘর্ষ সম্পর্কে আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন এবং অন্য কয়েকটি দেশের কাছে ভারত দ্বিতীয়বার আর একটি নোট পাঠাল। যুদ্ধবিরতি সীমারেখা কঠোরভাবে মেনে চলার আবেদন নিয়ে উ থান্ট আবার ভারতীয় ও পাকিস্তানী প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এই উত্তপ্ত মুহূর্তে যখন অন্যান্য দেশেরা কেউ ভারত-পাকিস্তানকে সংযত হবার সাধু উপদেশ বিলোচ্ছেন, কেউবা "নির্বাক কূটনীতির" আশ্রয় নিয়ে বসে রয়েছেন, তখন যুগোস্লাভিয়া স্বার্থহীন আশ্বাস জানিয়ে বলল যে, সে পাকিস্তানকেই উত্তেজনার মূলে ইন্ধন যোগাবার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করছে। পরে সফররত রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণাণের সঙ্গে এক যুক্ত ইস্তাহারে প্রেসিডেন্ট টিটো কাশ্মীর প্রসঙ্গে ভারতের বক্তব্যের প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন জানালেন। ইতিমধ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে ভারতের কারগিল-ঘাটি দখল করার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছে।

সোভিয়েতও তাদের নির্লিপ্ত মনোভাব ত্যাগ করল এবং ক্রমে ক্রমে এই জীইয়ে-তোলা সংঘর্ষ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ আগ্রহ দেখাতে লাগল। ইন্দোনেশীয় স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দিয়ে ফিরে যাবার পথে সোভিয়েত সহকারী প্রধানমন্ত্রী

মিঃ মাজুরফ কাশ্মীর পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে এবং কিভাবে তাঁর দেশ অবস্থার উন্নতি ঘটাবার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে, তা নিরূপণ করতে দিল্লিতে নামলেন। তিনি দুই দেশের মধ্যে মধুর সম্পর্কের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করলেন এবং জানালেন, কাশ্মীর যে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংগ, সে সম্বন্ধে রাশিয়ার বক্তব্য অপরিবর্তিত।

দিল্লিতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সংগে মিঃ মাজুরফের আলোচনা যখন চলছে, তখন এব বৃহৎ যুদ্ধের সম্ভাবনায় রাষ্ট্রসংঘে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। উ থান্ট তাঁর সংকল্পিত বিবৃতি প্রদান স্থগিত রাখলেন। ভারতীয় দূত শ্রী জি. পার্থসারথি রাষ্ট্রসংঘের নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে নয়াদিল্লির গভীর উদ্বেগের কথা সেক্রেটারী জেনারেলের কাছে ব্যক্ত করলেন। ইতিমধ্যে একথা জানাজানি হয়ে গেছে যে, প্রাথমিক রিপোর্ট পড়ে উ থান্ট পাকিস্তানের দুরভিসন্ধি এবং চক্রান্ত সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়েছিলেন, কিন্তু পাকিস্তানী উপরোধে তাঁকে বিবৃতিপ্রদান থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে রাজি হতে হয়েছিল। এই পক্ষপাত-দুষ্ট, পরিবর্তিত মনোভাব ভারতকে রীতিমত আহত করল।

২১ আগস্ট কারগিল খণ্ডে পাকিস্তানীরা এক ব্যর্থ আঘাত হানল। দুদিন পর লোকসভায় শ্রীচ্যবন তাঁর বিবৃতিতে আবার সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন যে, দরকার হলে ভারত যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করবে। পরদিন শাস্ত্রীজী ভারতের মনোভাব আরো স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করলেন। লোকসভায় তিনি বললেন, যেসব জায়গা থেকে হানাদাররা কাশ্মীরে আসছে, সেখানে হানা দিতেও ভারত পিছপা হবে না। তার অনতিবিলম্বেই উরি, পুনচ, তিথোয়াল, হাজি পীর এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি এলাকায় শত্রুর অন্বেষণে ভারতীয় বাহিনী যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করে এগোতে থাকল।

॥ চার ॥

২৪ আগস্ট উ থান্ট এক বিবৃতি দিলেন, কিন্তু কাশ্মীর সম্পর্কে জেনারেল নিমোর রিপোর্টটি তিনি চেপে রাখলেন। সেক্রেটারী জেনারেল এই পরিস্থিতিকে শান্তির পক্ষে এক মারাত্মক বিপদ বলে বর্ণনা করলেন। তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের রাজনৈতিক বিষয়ের আন্ডার সেক্রেটারীকে করাচী এবং দিল্লি পাঠানোর চিন্তা পরিত্যাগ করলেন; তাঁর উক্তি অনুযায়ী এর কারণ, প্রতিনিধি প্রেরণ সম্পর্কে দুই সরকারের পক্ষ থেকে আরোপিত বিভিন্ন সর্ত। পরিবর্তে এ ব্যাপারে কিভাবে অগ্রসর হওয়া যায়, তা স্থির করার জন্য তিনি জেনারেল নিমোকে লেক সাকসেসে ডেকে পাঠালেন।

কাশ্মীর বিরোধের দ্রুত মীমাংসা কামনা করে মস্কোর পক্ষ থেকে এই প্রথম এক বিবৃতি প্রচারিত হল। "অবজারভার" স্বাক্ষরিত এবং প্রাভদায় প্রকাশিত এই বিবৃতিতে বলা হল যে, ভারত-পাক সম্পর্কের যদি আরও অবনতি হয়, তাহলে এশিয়ার শান্তি বিঘ্নিত হবে এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে। বিবৃতিটি এমন সাবধানে রচিত হল যাতে মনে না হয় যে সোভিয়েত কোনো বিশেষ পক্ষ অবলম্বন করছে। শ্রীশাস্ত্রী এবং প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের হাতে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের বার্তা অর্পণ করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে মধ্যস্থতা করবার প্রস্তাব দিয়েছে, এইরকম সংবাদের উপর নয়াদিল্লি গুরুত্ব আরোপ করল না। কিন্তু কয়েকদিন পর, ৭ সেপ্টেম্বর, উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার আগ্রহে সোভিয়েতের যে উদ্বেগ ছিল, তার প্রতিফলন হল তার সালিশীর প্রস্তাবের মধ্যে। তার পরপরই মিঃ কোসিগিনের কাছ থেকে শ্রীশাস্ত্রী এবং প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের মধ্যে তাসখন্দে এক সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব এল।

ভারত যখন হাজি পীরের দিকে অগ্রগতি অব্যাহত রেখে উরি-পুনচ খণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ করতে ব্যস্ত, পাকিস্তান তখন ছাম্ব এলাকায় আন্তর্জাতিক সীমানা ডিঙিয়ে সংঘর্ষকে বিস্তৃত করার পরিকল্পনা ফাঁদছে। ২৬ আগস্ট তারিখে, মাত্র একদিনেই পাকিস্তানী ক্যাবিনেট ছ বার আলোচনায় মিলিত হয়। তার আগের দিন ভারতীয় বাহিনী নতুন দুটি জায়গায় যুদ্ধবিরতি সীমারেখা অতিক্রম করেছে। ব্রিটেন অবশ্য প্রকাশ্যে উভয় পক্ষকে নিরস্ত হতে অনুরোধ করছিল, কিন্তু অনেকগুলি ব্যাপারে, বিশেষত ভারতীয় হাইকমিশনার পাকিস্তানী অনুপ্রবেশের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির কথা ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অফিসে জানাতে গিয়ে যে দুর্ব্যবহার পান, তার জন্য উভয় দেশের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় লণ্ডন মধ্যস্থতার পথে পা বাড়ায়নি। ব্রিটিশ হাই কমিশনার মিঃ জন ফ্রিম্যান ভারতের বহির্বিষয়ক সেক্রেটারী শ্রী সি এস ঝা-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সরকারের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং ওয়াশিংটনকে পাকিস্তানের পক্ষে প্রভাবিত করতে ব্রিটেন যে একজনকে নিযুক্ত করেছিল, সে কথা অস্বীকার করেন।

হানাদার পাঠানোর সমস্ত দায়িত্ব পাকিস্তান যখন সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে লাগল, ভারত তখন সেক্রেটারী জেনারেলের উপর বার বার চাপ দিতে লাগল জেনারেল নিমোর রিপোর্টটি প্রকাশ করার জন্য, যাতে সরাসরি পাকিস্তানকে দায়ী করা হয়েছে বলে ভারত আগেই জানতে পেরেছিল। ভারত ঘোষণা করল যে, পাকিস্তানের প্রদত্ত চ্যালেঞ্জ সে গ্রহণ করেছে। অপরপক্ষে পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী বললেন, ভারত তাঁদের পরীক্ষার সম্মুখীন করেছে এবং পাকিস্তান সেই চ্যালেঞ্জের সামনাসামনি দাঁড়াতে প্রস্তুত। তিনি পাকিস্তানের পূর্ণ

সামরিক প্রস্তুতির কথাও জাহির করলেন এবং পাক সশস্ত্র বাহিনীকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাদল বলে দাবি করলেন।

এই সময়ে মার্কিন পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ডীন রাস্‌ক বললেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ফিরিয়ে আনতে তাঁর দেশ খুবই আগ্রহী। এই উপমহাদেশে উত্তেজনার সুযোগে আমেরিকা লাভবান হতে ব্যস্ত—এই মর্মে প্রাভদায় প্রকাশিত এক সোভিয়েত অভিযোগ তিনি অস্বীকার করলেন। মস্কোর মতো ওয়াশিংটনও প্রকাশ্যে এমন ধারণার সৃষ্টি করতে চাইল না, যাতে মনে হতে পারে যে এই বিরোধে আমেরিকা কারুর পক্ষাবলম্বন করছে। পাকিস্তানকে মার্কিন সাহায্য দেওয়ার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য প্রেসিডেণ্ট জনসন আদেশ দিয়েছেন বলে যে খবর প্রচারিত হয়েছিল, ওয়াশিংটন সরকারীভাবে তাকে কল্পিত বলে অভিহিত করল। এইসব খবরে প্রকাশ পেল যে, পাকিস্তান যার কাছ থেকে বেশ কয়েক বছরে ২,০০০ কোটি টাকারও বেশি সামরিক সাহায্য পেয়েছে, সেই আমেরিকা নাকি পাকিস্তানকে তার চিরাচরিত পশ্চিম-প্রীতি ও কম্যুনিস্ট-বিদ্বেষী মনোভাব থেকে বিচ্যুত হতে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে।

পাকিস্তান কিন্তু ক্রমেই মারাত্মক ধরনের ক্ষতিকর কূটনীতির আশ্রয় নিতে শুরু করল এবং তার ফলে পাক-ভারত সংঘর্ষের ক্ষেত্রে আর একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। ৩১ আগস্ট লণ্ডন থেকে এই মর্মে সংবাদ এল যে পাকিস্তান কাশ্মীর সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন বসাবার জন্য দরবার শুরু করেছে এবং পরিষদ যাতে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, তার জন্য ব্রিটিশ সরকার আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। ব্রিটেন জানাল যে, ভারত ও পাকিস্তান উ থাণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করবে বলে সে আশা করে এবং পরিষদের বৈঠক আহ্বান করার প্রয়োজন আছে কিনা, তা স্থির করার ভার উ থাণ্টের উপরই ন্যস্ত করতে হবে। পাকিস্তানের কূটনৈতিক তৎপরতার পেছনে মদত যোগাতে লাগল তার নেতৃবৃন্দের চোখরাঙানো বক্তৃতা। তাঁদের মধ্যে একজন, তথ্যমন্ত্রী খাজা সাহাবুদ্দিন বললেন, "ভারতীয় সাম্রাজ্যলিপ্সার কবল থেকে কাশ্মীরী ভাইদের উদ্ধার করবার জন্য পাকিস্তানীদের আত্মোৎসর্গের সময় এসেছে।" একই দিনে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব তাঁর সোয়াত সফরকাল হ্রাস করলেন এবং ক্যাবিনেটের এক জরুরী সভায় বসতে রাওয়ালপিণ্ডিতে ফিরে গেলেন। পাকিস্তানের এইসব আস্ফালন শূন্যগর্ভ ছিল না, পরদিন সকালে (১ সেপ্টেম্বর) ছাম্ব এলাকায় আন্তর্জাতিক সীমারেখা পেরিয়ে পাকিস্তান এক ব্যাপক আক্রমণ শুরু করল।

॥ পাঁচ ॥

শেষ পর্যন্ত, যাকে বলে গরম লড়াই, তাই আরম্ভ হল। এই ব্যাপক যুদ্ধ যদিও পাকিস্তানই চাপিয়ে দিল ভারতের উপর, তবু প্রেসিডেণ্ট আয়ুব তাঁর দেশকে এবং এক বেতার বক্তৃতায় সমস্ত পৃথিবীকে একথা বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হলেন না যে, পাকিস্তান "কাশ্মীরে যুদ্ধের সম্মুখীন, যে যুদ্ধ ভারত আমাদের উপর বলপূর্বক চাপিয়ে দিয়েছে।" ভারতীয় ক্যাবিনেটের জরুরী কমিটি ব্যস্ততার সঙ্গে আহুত এক অধিবেশনে মিলিত হলেন, যার সমাপ্তিতে শ্রীশাস্ত্রী ঘোষণা করলেন যে, পাকিস্তান "বড় রকমের আক্রমণ শুরু করেছে এবং আমরা তার মোকাবিলা করব।" পাকিস্তান তার আক্রমণ চালাতে গিয়ে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র এবং বিমান ব্যবহার করছে বলে ভারত আমেরিকার কাছে প্রবল প্রতিবাদ জানাল। জবাবে আমেরিকা নিতান্ত মামুলী চালে এই-টুকুই শুধু জানাল যে, যুদ্ধে মার্কিন খয়রাতি অস্ত্র ব্যবহারের সত্যতা সম্পর্কে "আরও খবরাখবর" জোগাড় করার চেষ্টা চলছে। এদিকে ভারত সুস্পষ্ট আশ্বাস দিল যে চীনাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য পাওয়া মার্কিন অস্ত্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়নি এবং হবেও না।

মারাত্মক সমরাস্ত্রে সজ্জিত দুই দেশের বাহিনীর এই মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠল এবং উ থাণ্ট নতুন করে আর একবার শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করতে গিয়ে দুই দেশের কাছে যুদ্ধবিরতি ব্যবস্থার প্রতি সম্মান দেখাবার এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের পর্যবেক্ষকদলের সঙ্গে সহ-যোগিতা করবার আবেদন জানালেন। শ্রীশাস্ত্রী এবং আয়ুব খানের কাছেও অনুরূপ তারবার্তা পাঠান হল। আমেরিকা এবং ব্রিটেন তৎক্ষণাৎ এই আবেদন অনুমোদন করল। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী তাঁর দুশ্চিন্তা ব্যক্ত করে উভয় দেশের নায়কদ্বয়কে পৃথকভাবে চিঠি লিখলেন।

উ থাণ্টের আবেদনের উত্তরে শ্রীশাস্ত্রীর মনোভাব ৩ সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে প্রচারিত এক বেতার ভাষণের মধ্যে দিয়ে প্রকট হয়ে উঠল। তিনি বললেন : "যুদ্ধবিরতির অর্থ শান্তি নয়। পাকিস্তানের মরজিমাফিক নতুন এক একটা আক্রমণের ফাঁকে ফাঁকে ভারত একটি যুদ্ধবিরতি থেকে নিছক আর একটি যুদ্ধবিরতিতে উপনীত হতে পারে না।" কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের পাকিস্তানী দাবী প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, পাকিস্তানের একনায়ক-তন্ত্রী সরকার কি পাখতুন এলাকায় এবং পূর্ব পাকিস্তানে গণভোট নেওয়ার প্রস্তাবে সম্মত হবেন?

পাকিস্তানের সহায়তায় এগিয়ে আসবার জন্য ইন্দোনেশিয়া উসখুস করছিল। ঐ দেশের জনৈক মন্ত্রী ভারতের সমালোচনা এবং কাশ্মীরীদের "মুক্তি

সংগ্রামে" লিপ্ত থাকা সম্পর্কে পাক-দাবীর সমর্থন করে এক বিবৃতি দিয়েছিলেন। জাকার্তায় এক বিরাট ভারতবিরোধী বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য সমস্ত দেশ তখনো এই সংঘর্ষ সম্পর্কে প্রকাশ্য মন্তব্য পরিহার করে চলছিল। কয়েকদিন পর নিরাপত্তা পরিষদে মালয়েশিয়া প্রকাশ্যভাবে আমাদের প্রতি সুদৃঢ় সমর্থন নিয়ে এগিয়ে এল এ ং এই ঘটনায় পাকিস্তান এমনই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল যে, সে মালয়েশিয়ার সঙ্গে তার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দিল। সিঙ্গাপুরও আমাদের দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রতি স্বীকৃতি জানাল। কানাডার প্রধানমন্ত্রী লেসটার পীয়ারসন যুদ্ধ-বিরতি এবং দুই দেশের সম্পর্ককে স্বাভাবিক করে তোলার পক্ষে অনুকূল ব্যবস্থা সম্পন্ন করার ব্যাপারে সাহায্য করবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন, যদিও এই আবেদনে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারের উদ্বেগ ব্যক্ত করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্টের কাছে ব্যক্তিগত বার্তা পাঠালেন। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নাসের এবং যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট টিটো নয়াদিল্লি এবং করাচীতে এক যুক্ত শান্তি মিশন পাঠাবার কথা বিবেচনা করছেন বলে জানা গেল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তা কাজে পরিণত হয়নি।

নিরাপত্তা পবিষদের তখনকার সভাপতি আমেরিকার মিঃ গোলডবারগ পরিস্থিতিব "উদ্বেগজনক ধরন" (উ থান্টের ভাষায়) সম্পর্কে আলোচনার জন্য পরিষদের বৈঠক আহ্বান করা যায় কিনা, সে বিষযে সেকরেটারী জেনারেল ও পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। এই ধবনের বৈঠকের জন্য পাকিস্তান মুখিয়েই ছিল, কিন্তু ভারতের মতে তার কোনো যুক্তিসংগত প্রয়োজন ছিল না।

৪ সেপ্টেম্বর তারিখে নিরাপত্তা পরিযদেব বৈঠক বসল। বৈঠকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলশ্রুতি হল উ থান্টের সেই রিপোর্ট, যাতে বর্তমান সংঘর্ষেব জন্য পাকিস্তানকে এক নম্বর আসামী হিসেবে দাঁড় করান হল। সেক্রেটারী জেনারেল বললেন : "জেনারেল নিমো আমাকে জানিয়েছেন যে, ৫ আগস্ট ধারাবাহিকভাবে যুদ্ধবিরতি রেখা লঙ্ঘন শুরু হয়। পরের দিনগুলিতে পাকিস্তানের দিক থেকে সশস্ত্র লোকেরা, যারা সাধারণত উর্দি-পরা ছিল না, ব্যাপকভাবে যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করে সশস্ত্র আক্রমণের জন্য ভারতের দিকে আসে।" উ থান্ট তাঁর শান্তিপ্রচেষ্টার পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন : "অতঃপর যুদ্ধবিরতি রেখা মেনে চলার ব্যাপারে অথবা ঐ রেখা বরাবর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সচেষ্ট হওয়া সম্পর্কে আমি পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি পাইনি।"

সঙ্কটের এই চরম মুহূর্তে, ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে আরও ভালভাবে জড়িয়ে

পড়ার ব্যাপারে চীন পাকিস্তানকে উৎসাহিত করতে শুরু করল। ৩ সেপ্টেম্বর তারিখে চীনা প্রধানমন্ত্রী চু-এন-লাই এবং পাক রাষ্ট্রদূত মিঃ রাজা "উভয় পক্ষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে" আলোচনার জন্য পিকিংয়ে মিলিত হলেন। তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটল ৪ সেপ্টেম্বর, যখন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী মারশাল চেন-ঈ পাকিস্তানের মামলাবাজ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ভুট্টোর সঙ্গে মন্ত্রণার জন্য করাচীতে হাজির হলেন। পাকিস্তানের চীনা মুরুব্বির পক্ষে যা স্বাভাবিক, পররাষ্ট্রমন্ত্রী চেন-ঈ সেই বাণী আওড়াতে গিয়ে "কাশ্মীরে ভারতের সশস্ত্র হানা প্রতিরোধে" পাকিস্তানের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের ভূয়সী প্রশংসায় গদ্‌গদ হয়ে পড়লেন!

॥ ছয় ॥

অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান এবং ১৯৪৯ সালের যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রমকারী ভারতীয় ও পাকিস্তানী সৈন্য অপসারণের দাবি জানিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মতভাবে এক প্রস্তাবে ভোট দিলেন। প্রস্তাবটি কার্য-ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হল কিনা, তিনদিনের মধ্যে তা পরিষদকে জ্ঞাপন করতে উ থান্‌টকে নির্দেশ দেওয়া হল। প্রস্তাবের উদ্যোক্তা ছিল মালয়েশিয়া, জরডান, নেদারল্যান্ডস, উরুগুয়ে, আইভরি কোস্‌ট ও বলিভিয়া এবং এটি মালয়েশিয়ার প্রতিনিধি মিঃ রাধাকৃষ্ণ রামানি কর্তৃক পরিষদে উত্থাপিত হয়েছিল। রাশিয়ার মিঃ মাজুরফ সাম্রাজ্যবাদীদের অভিযুক্ত করে বললেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদকে উস্কে দিতে তারা সর্বদাই কাশ্মীর সমস্যাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছে এবং উভয় দেশের যে জনগণ তাদের কাঁধ থেকে ঔপনিবেশিক জোয়াল খুলে ফেলে দিয়েছে, তাদের মধ্যে অহি-নকুল সম্পর্ক সৃষ্টি করে নিজেদের মতলব হাসিল করতে চেয়েছে।

নিরাপত্তা পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হল, তা এই রকম :

"নিরাপত্তা পরিষদ,

"সেক্রেটারী জেনারেলের ৩ সেপটেমবর, ১৯৬৫ তারিখের রিপোর্ট জ্ঞাত হইয়া

"ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিগণের বিবৃতি শ্রবণ করিয়া

"কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতি রেখা বরাবর পরিস্থিতির ক্রমাবনতিতে উদ্বিগ্ন;

"১। এখনই যুদ্ধবিরতির জন্য অবিলম্বে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের নিমিত্ত ভারত ও পাকিস্তান সরকারকে আহ্বান জানাইতেছে;

"২। যুদ্ধবিরতি রেখা মান্য করিতে এবং উভয় পক্ষের সশস্ত্র ব্যক্তিগণকে

উক্ত রেখার দুই দিকস্থ নিজ নিজ দিকে সরাইয়া লইবার জন্য উভয় সরকারকে আহ্বান জানাইতেছে।

"৩। যুদ্ধবিরতি পালিত হইতেছে কিনা, তাহা দেখিবার মূল দায়িত্ব ভারত ও পাকিস্তানে রাষ্ট্রসংঘের যে সামরিক পর্যবেক্ষকদলের উপর ন্যস্ত, তাহাদের সহিত পূর্ণ সহযোগিতার জন্য উভয় সরকারকে আহ্বান জানাইতেছে,

"৪। প্রস্তাবটির বাস্তব রূপায়ণ সম্পর্কে পরিষদকে তিন দিনের মধ্যে ফলাফল জানাইতে সেকরেটারী জেনারেলকে অনুরোধ করিতেছে।"

৫ সেপটেমবর তারিখে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের এক সভায় শ্রীশাস্ত্রী বললেন যে তার আগের দিন সেকরেটারী জেনারেলের কাছে লিখিত তার চিঠিতে যে সব সর্ত তিনি আরোপ করেছেন, তা পাকিস্তান গ্রহণ না করলে ভারত যুদ্ধবিরতির আহ্বানে সাড়া দেবে না। এই চিঠিতে শাস্ত্রীজী দাবি করেছিলেন যে পাকিস্তানকে আরও অনুপ্রবেশকারী পাঠানর ব্যাপারে বিরত হতে হবে এবং যে সমস্ত অনুপ্রবেশকারী ও সশস্ত্র সৈন্য যুদ্ধবিরতি রেখা এবং আন্তর্জাতিক সীমানা লংঘন করেছে, তাদেরকে সরিয়ে নিতে হবে। তিনি বলেন, "পাকিস্তান যদি বলপ্রয়োগের সাহায্যে কাশ্মীর প্রশ্নের আলোচনার জন্য আমাদের বাধ্য করতে চায়, তাহলে আমি বলব যে সে চেষ্টা অর্থহীন। আমরা তাতে রাজি হতে পারি না, এবং রাজি হবও না, তার জন্য যে পরিণামই আসুক না কেন।" লেক সাকসেসে শ্রীপার্থসারথি পাকিস্তানের কাছ থেকে এই মর্মে এক গ্যারানটি চেয়েছিলেন যে, আর কখনো এধরনের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হবে না। এই প্রস্তাব গ্রহণ করায় পাকিস্তান ইচ্ছুক ছিল না। মিঃ আমজাদ আলি বলেন, যেহেতু এই প্রস্তাবের সঙ্গে গণভোট এবং "যুদ্ধবিরতির ভিত্তি" স্বরূপ অন্যান্য সর্তের কোনো সম্পর্ক নেই, সেই কারণে এই প্রস্তাব তাঁর সরকারের মনে অতি সামান্যই সাড়া জাগাতে পারবে। রাষ্ট্রসংঘে ভারতের বক্তব্য উত্থাপন করতে নিউইয়র্ক যাত্রার প্রাক্কালে দিল্লিতে শ্রীচাগলা বলেন যে, পরিষদের সামনে যে সরল কর্তব্যটি রয়েছে, তা হল "পাকিস্তান যে আমাদের দেশের উপর সুস্পষ্ট এবং নির্লজ্জভাবে আক্রমণ করেছে, তা উপলব্ধি করা এবং আক্রমণকারীকে দোষী সাব্যস্ত করা।"

॥ সাত ॥

ছাম্বের বড় রকমের আক্রমণে তুষ্ট না হয়ে, অমৃতসর এলাকায় আমাদের সামরিক ব্যবস্থার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে পাকিস্তান এবার সংঘর্ষের এলাকাকে বিস্তৃত করার মতলব আঁটতে লাগল। ৫ সেপটেমবর দুপুরে

পাকিস্তানী বিমান অমৃতসরের কাছে আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করল এবং বিমানবহরের একটি ইউনিটের উপর রকেট নিক্ষেপ করল। সীমানা লঙ্ঘনের ঘটনা আরও ঘটল। দেশের নিরাপত্তার সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ৬ সেপটেম্বর সকালে লাহোর খণ্ডে পশ্চিম পাঞ্জাবের সীমান্ত অতিক্রম করল। লোকসভায় এই খবর জানিয়ে শ্রীচ্যবন বললেন . একথা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে পাকিস্তানের পরবর্তী পদক্ষেপ হত পাঞ্জাব আক্রমণ। এই ব্যাপার যে ঘটতে চলেছিল, তার লক্ষণ বেশ কিছু কাল ধরে প্রকট হয়ে উঠেছিল। পাকিস্তানের আর একটি ফ্রন্ট খুলবার ফন্দী বানচাল করে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষার জন্যই আমাদের বাহিনী সীমান্ত পেরিয়ে লাহোর খণ্ডে অগ্রসর হয়েছে।" শ্রীশাস্ত্রীও বললেন, এক "পুরো-দস্তুর যুদ্ধাবস্থা" দেখা দিয়েছে। ওদিকে রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হুংকার দিয়ে উঠলেন : "আমরা ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত।"

কূটনৈতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান প্রথম ধাক্কা খেল তখন, যখন দক্ষিণপূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থার সেকরেটারী জেনারেল ব্যাংককে ঘোষণা করলেন যে কাশ্মীর সিয়াটোর আওতায় পড়ে না এবং সেজন্য এই সংস্থা ভারত-পাক যুদ্ধে নাক গলাতে পারে না। পাকিস্তানের সাহায্য প্রার্থনার উত্তরে সেনটোও উদাসীন রইল, যদিও তুর্কী এবং ইরান সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল। কিন্তু পাকিস্তানের প্রকৃত প্রভু ব্রিটেন অবশ্য পাকিস্তানী মনোবল অটুট রাখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। ভারতের আত্মরক্ষামূলক প্রয়াসকে বি. বি সি "আক্রমণ" বলে বর্ণনা করল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, কচ্ছ এলাকায় পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সীমানা ডিঙিয়ে আক্রমণ করা বেলায় মৌনীবাবা সেজে বসেছিলেন, তিনিই লাহোর খণ্ডের সমস্ত ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ জানবার তর সইতে না পেরে এমন এক জঘন্য ভারত-বিরোধী বিবৃতি বমন করলেন, যা ১৯৪৭ সালের পর এই প্রথম ভারত-ব্রিটিশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াল।

৬ সেপটেম্বর তারিখে মিঃ উইলসন বললেন : "ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আকারে যে যুদ্ধ চলছে তার জন্য এবং বিশেষত এই সংবাদে আমি গভীর উদ্বেগ বোধ করছি যে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী আজ পাঞ্জাবের আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে পাকিস্তানী অঞ্চল আক্রমণ করেছে। ৪ সেপটেম্বর নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের এ এক দুঃখজনক অবমাননা। যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি বর্তমানে দেখা দিয়েছে, তা শুধু ভারত ও পাকিস্তানের পক্ষে নয়, বিশ্বশান্তির পক্ষেও মারাত্মক পরিণাম ডেকে আনতে পারে।" দিল্লিতে মিঃ উইলসনের হাই কমিশনার পরে বলেছিলেন যে, এই বিবৃতি নাকি অজ্ঞতাবশতঃ দেওয়া হয়েছিল! কূটনীতির ইতিহাসে,

বলাবাহুল্য, এহেন অজ্ঞতা এক অপূর্ব নজীর!!

১ লোকসভায় শ্রী চাবন বললেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে সাবমেরিন সরবরাহ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তিনি আরও বললেন যে, ব্রিটেনও সাবমেরিন দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু লেনদেনের ব্যাপারে অবশ্য লাহোর ফ্রন্টে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটেন এবং আমেরিকা, ভারত-পাকিস্তান উভয়কে অস্ত্রশস্ত্র এবং স্পেয়ার পার্টস সরবরাহ করা বন্ধ করেছিল। এমনকি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে জিনিষ সরবরাহের জন্য ভারতের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল, ভারত তাতেই বেশি আগ্রহশীল হওয়া সত্ত্বেও, তা স্থগিত রাখা হয়। কেবল-মাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের সোসালিসট দেশগুলি চুক্তি অনুযায়ী সমস্ত সরবরাহ অক্ষুণ্ন রাখল।

প্রেসিডেনট আয়ুবের এক বার্তা প্রদান করবার জন্য পাকিস্থানী রাষ্ট্রদূত মিঃ ইকবাল আতহার ৭ সেপটেমবর সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে বলেন যে সোভিয়েত সব সময়েই উভয় পক্ষকে সংযত হবার পরামর্শ দেবে। দুদিন পর মস্কো উপমহাদেশে শান্তি স্থাপনের জন্য তার ইচ্ছার পুনরাবৃত্তি করল। ৬ সেপটেমবর তারিখে উ থান্ট বলেছিলেন, পাকিস্তান অথবা ভারত, কেউই যুদ্ধবিরতির আহবানে সাড়া দেয়নি, এবং শান্তি ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্য নিয়ে সেকরেটারী জেনারেলের উপমহাদেশ সফরের প্রস্তাবটি লেক সাকসেসে আলোচিত হচ্ছে। ভুট্টো অবশ্য নিরাপত্তা পরিষদের কাছে "ভারতীয় আক্রমণ রোধ কবার জন্য" ব্যবস্থা অবলম্বনের আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানী নষ্টামি ক্রমেই নতুন নতুন পথ অবলম্বন করছিল। পাকিস্তানী দরিয়ার উপর দিয়ে অথবা তাদের বন্দর ছুঁয়ে যে সব ভারতীয় জাহাজ চলাচল করছিল, পাকিস্তান সেগুলি আটক করতে শুরু করল এবং তার থেকে ভারতীয় মালপত্র নামিয়ে বাজেয়াপ্ত করতে লাগল। ভারতকে বাধ্য হয়েই পালটা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হল।

॥ আট ॥

৮ সেপটেমবর পাক প্রেসিডেনট তাঁর এক পত্রে উ থানটকে জানালেন যে, শুধুমাত্র কাশ্মীরে গণভোট সিদ্ধান্তের দ্বারাই তাঁর দেশ ও ভারতের মধ্যে চলতি যুদ্ধকে থামান সম্ভব। একই দিন পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে, কাশ্মীর সমস্যার চিরকালের মত সমাধান না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি হতে পারে না। এর আগের সপ্তাহ থেকে চীন ভারতকে অপদস্থ করার এবং বিভিন্ন অজুহাতে ভীতি প্রদর্শনের নোঙরা খেলা শুরু করেছিল। চীনের একটি নোটের উত্তরে, যে নোটে চীন তিব্বত অঞ্চলে ভারতের অনধিকার

প্রবেশের একটি তালিকা দিয়ে অভিযোগ এনেছিল, ২ সেপ্টেম্বর তারিখে ভারত এইসব অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করল এবং জানাল যে চীনের এই সব কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ভারতের কুৎসা রটনা এবং "ভারতের বিরুদ্ধে যে সব অবৈধ কুকর্মের ফন্দী চীন সরকার সম্ভবতঃ আঁটছেন, তার উপযুক্ত ভূমিকা তৈরী করা।" চীন পাকিস্তানের সমর্থনে এবং ভারতের বিরুদ্ধে উৎকট প্রচারকে আরও জোরদার করে তুলল। মিঃ চু এন-লাই ভারতের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাকে "পাকিস্তানের উপর এক বিরাট সশস্ত্র আক্রমণ" বলে বর্ণনা করলেন। এর পর-পরই ৯ সেপ্টেম্বর চীন এক নোটে এই বলে ভারতকে শাসাল যে, "চীন-সিকিম সীমান্ত বা তার ওপারে অন্যায়-ভাবে আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্যে যে সব সামরিক কাঠামো ভারত তৈরী করেছে, তা তাকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে।" অবশ্য বহু গর্জনের পর বর্ষণ যখন শেষ পর্যন্ত একবিন্দুও হল না, তখন যুদ্ধের সেই উত্তপ্ত গুরুগম্ভীর পরিস্থিতিতেও বেশ কিছুটা হাসির খোরাক পাওয়া গিয়েছিল! যে অভিযোগ মিথ্যা, তার প্রতিকারের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং চীনের হুমকীকে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে ভারত যখন হাত গুটিয়ে বসে রইল, চীন তখন ঘোষণা করল যে, ভারত ঐসব ঘাটি ভেঙ্গে ফেলায় চীন সন্তুষ্ট হয়েছে! আফিম-খোরদের দস্তুর বোধহয় এইরকমই। তারা কল্পনায় ঘাটি বানায়, আবার কল্পনাতেই তা উড়িয়ে দেয়! সে যাই হোক, চীন কিন্তু অন্যান্য দাবির সঙ্গে একপাল ভেড়ার জন্যও ক্ষতিপূরণ দাবি করতে ভোলেনি। তার জবাব হিসেবে অবশ্যি দিল্লির চীনা দূতাবাসে সেই ঐতিহাসিক ভেড়ার মিছিলটি হাজির করা হয়েছিল!!

নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে ভারত ও পাকিস্তানকে সম্মত করিয়ে উপমহাদেশে শান্তি স্থাপনের অভিপ্রায়ে ৯ সেপ্টেম্বর উ থান্ট রাওয়াল-পিনডিতে পেঁছলেন। মস্কোতে সোভিয়েত কম্যুনিসট পার্টির সেকরেটারী মিঃ ব্রেজনেভ ভারত ও পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ থামাবার এবং সীমান্তের নিজের নিজের দিকে সৈন্য অপসারণের জন্য আহ্বান জানালেন। কাশ্মীর যে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—এই কথার উপর জোর দিয়ে প্রাভদায় একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হল। ওয়াশিংটন থেকে প্রাপ্ত বেসরকারী সংবাদে জানা গেল যে, চীন যদি ভারত আক্রমণের চেষ্টা শুরু তাহলে সে ব্যাপারে আমেরিকার সরাসরি হস্তক্ষেপ করার সম্ভাবনা রয়েছে। ওদিকে লনডনের মনোভাব হল, চীনা নোটের মধ্যে ব্যাপকভাবে ভারত আক্রমণের কোনো মতলব নেই। উ থান্টের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রেসিডেনট আয়ুব "শত্রুপক্ষের মাটিতে যুদ্ধকে বিস্তৃত" করবার জন্য পাকিস্তানীদের উদ্দীপ্ত করলেন। পাকিস্তানকে তুর্কী ও ইরাণের অস্ত্রসাহায্য দানের প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে লোক-

সভায় ভারতের বহির্বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং ঘোষণা করলেন যে, যে কোনো দেশের পক্ষ থেকে পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহের চেষ্টাকে ভারতের সঙ্গে শত্রুতা হিসেবে গণ্য করা হবে।

১১ সেপটেমবর তারিখে, রাশিয়া যেদিন সেক্রেটারী জেনারেলের মীমাংসাপ্রয়াসের প্রতি তার পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করল, সেদিন উ থান্ট রাওয়ালপিন্ডি থেকে ভারতে পৌঁছলেন। সেক্রেটারী জেনারেল বিরোধ মীমাংসার জন্য পাকিস্তানের দেওয়া তিন দফা প্রস্তাব সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। সেগুলি হল : (১) যুদ্ধবিরতি এবং তার অব্যবহিত পর সমগ্র কাশ্মীর থেকে সম্পূর্ণভাবে ভারত ও পাকিস্তানের সৈন্যাপসরণ; (২) যতদিন না গণভোট গৃহীত হয়, ততদিন কাশ্মীরের নিরাপত্তার ভার এক আফরো-এশীয় রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর হাতে অর্পণ; এবং (৩) ১৯৪৯ সালের ৫ জানুয়ারী তারিখের রাষ্ট্রপুঞ্জের কাশ্মীর সম্পর্কিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে তিন মাসের মধ্যে এক গণভোট গ্রহণ। পাক-পরিকল্পনার জবাবে নয়াদিল্লির প্রতিক্রিয়া ১৩ সেপটেমবর তারিখে সরকারী মুখপাত্রের দ্বারা ব্যক্ত হল এই মর্মে যে, "কাশ্মীরের রাজনৈতিক অবস্থাকে বর্তমান সংঘর্ষের সঙ্গে একত্রিত করার এই পাকিস্তানী অভিপ্রায়, রাষ্ট্রপুঞ্জের শান্তিপ্রয়াস ব্যর্থ করে দেওয়ার ইচ্ছাকৃত অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের এক অবিচ্ছেদ্য অংগ, এবং বলপ্রয়োগের দ্বারা এই অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটান যাবে না।"

ব্যর্থমনোরথ উ থান্ট নয়াদিল্লি ত্যাগ করলেন ১৫ সেপটেমবর, কিন্তু বলে গেলেন, "যদিও সংঘর্ষের বিরতিতে পৌঁছনোর চেষ্টা এখনো ফলবতী হয়নি, তবু সেই লক্ষ্যে উপনীত হতে আগ্রহশীল সকল শুভাকাংক্ষীদের পক্ষে তাঁদের প্রয়াস স্থগিত রাখারও কোনো কারণ নেই।" "এই বেদনাদায়ক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং যুদ্ধবিরতির জন্য" তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতিও দিলেন। রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেনট আয়ুব এই ব্যাপারে প্রেসিডেনট জনসনের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করলেন। এদিকে নয়াদিল্লিতে শাস্ত্রীজী ঘোষণা করলেন যে, ভারতের আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। শ্রীস্বর্ণ সিং বললেন, শান্তির খাতিরে ভারত অবিলম্বে আক্রমণ বন্ধ করতে প্রস্তুত, কিন্তু পাকিস্তানের মনোভাবই উ থান্টের শান্তি প্রচেষ্টার ব্যর্থতার জন্য দায়ী। পরদিন লোকসভায় ভাষণপ্রসঙ্গে শ্রী শাস্ত্রী পাকিস্তানের তিন দফা পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করেন, কিন্তু জানান, "আমরা সেক্রেটারী জেনারেলের যুদ্ধবিরতি-প্রস্তাব গ্রহণ করেছি।" কিন্তু ভারত যদিও উ থান্টের প্রস্তাবের ইতিবাচক সাড়া দিয়েছিল অথচ পাকিস্তান দেয়নি, তবু সেক্রেটারী জেনারেলের বিবৃতিতে দুই সরকারের মনোভাবের এই মৌলিক প্রভেদটুকুও

স্বীকৃত হতে না দেখে দিল্লি বিস্ময়ে বিমূঢ় হল।

উ থান্ট লেক সাকসেসের পথে উপমহাদেশ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে ভুট্টো যথারীতি লম্ফঝম্ফসহকারে হল্লা করতে থাকলেন এই বলে যে, রাষ্ট্রপুঞ্জ যদি তার কাশ্মীর সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতির মর্যাদা না দেয়, তাহলে পাকিস্তান রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতি তার মনোভাব পুনর্বিবেচনা করবে। এর একদিন আগেই পিকিং আর জাকারতা নাকি রাষ্ট্রপুঞ্জকে এই মর্মে ধমক দিতে পাকিস্তানকে পরামর্শ দিয়েছিল বলে শোনা যায় যে, এই বিরোধের মীমাংসা যদি করাচির অনুকূলে না যায়, তাহলে পাকিস্তান রাষ্ট্রপুঞ্জ ত্যাগ করবে।

॥ নয় ॥

১৬ সেপটেমবর শাস্ত্রীজী এবং উ থান্টের মধ্যে পত্রালাপের বিবরণ প্রকাশিত হল। এর প্রস্তাবনায় ১২ সেপটেমবর তারিখে সেকরেটারী জেনারেলের লেখা একটি চিঠি ছিল। তাতে তিনি বলেছিলেন যে, ভারত-পাকিস্তান উভয় পক্ষের সমস্যাগুলির এক স্থায়ী মীমাংসা অনুসন্ধানের পথে প্রথম অত্যাবশ্যক পদক্ষেপ হল, "সংঘর্ষের সমগ্র এলাকাকে বিনাসর্তে আক্রমণ-মুক্ত করা.... বিগত কয়েক দিনে রাওয়ালপিনডি এবং নয়াদিল্লিতে যে খোলাখুলি এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আমি অংশগ্রহণ করি, তার ভিত্তিতে আমি আপনাকে ১৯৬৫ সালের ১৪ সেপটেমবর সন্ধ্যা ৬-৩০টা (নয়াদিল্লি সময়) থেকে বিনাসর্তে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দিতে এবং চলতি সংঘর্ষের সমগ্র এলাকাকে আক্রমণমুক্ত করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি একই রকম আর একটি অনুরোধ প্রেসিডেনট আয়ুব খানের কাছে পাঠিয়েছি।" তিনি আরও বলেন যে, "পরিষদের ৬ সেপটেমবর তারিখের প্রস্তাবে যে আহ্বান জানান হয়েছে, সেই অনুযায়ী যুদ্ধবিরতি ব্যবস্থা তত্ত্বাবধানকে নিশ্চিত করার জন্য এবং ১৯৬৫ সালের ৫ আগসটের আগে তাঁরা যেখানে যেখানে ছিলেন, উভয় পক্ষের সকল সশস্ত্র ব্যক্তিকে সেইখানে সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে" নিরাপত্তা পরিষদ সহায়তা করবেন।

১৪ সেপটেমবর-এ চিঠির জবাবে শ্রী শাস্ত্রী সেকরেটারী জেনারেলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, "বিগত বছরগুলিতে আমরা সক্রিয়ভাবে এবং উদ্দেশ্য-বশতঃ জোটনিরপেক্ষতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে অবিচল থেকেছি। আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমরা শান্তি ও বন্ধুত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করেছি।......পাকিস্তানের দিক থেকে তার প্রত্যুত্তর চরম হতাশা-ব্যঞ্জক হয়ে দেখা দিয়েছে।......১৯৪৭ সালের পর দুবার আমাদের জম্মু ও

কাশ্মীর রাজ্যে এবং একবার গুজরাটে—মোট তিনবার, পাকিস্তানী শাসকরা ভারতের বিরুদ্ধে নগ্ন আক্রমণ চালিয়েছে।......পাকিস্তানের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আমরা নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলাম।"

শাস্ত্রীজী অতঃপর অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে বললেন : "১৯৬৫ সালের ১৬ সেপটেমবর বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় সকাল ৬-৩০টা থেকে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে আমরা প্রস্তুত থাকব, অবশ্য যদি আগামী কাল সকাল ৯টার মধ্যে আপনি এই মর্মে আমাকে আশ্বস্ত করেন যে পাকিস্তানও এই কাজে সম্মত আছে।" প্রসঙ্গত প্রধানমন্ত্রী হাজার হাজার সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীর সমস্যা সম্পর্কে লেখেন : "আপনার কাছ থেকে জানা গেল যে পাকিস্তান সমস্ত দায়িত্ব, অস্বীকার করে চলেছে। এই অস্বীকৃতিতে আমরা বিস্মিত হইনি, কেননা ইতিপূর্বে পাকিস্তান যখন আর একবার অনুরূপ কৌশল অবলম্বন করে আক্রমণ চালিয়েছিল, তখনও প্রথমটা সে তার দুষ্কর্মের দায়িত্ব অস্বীকার করেছিল- যদিও পরবর্তী সময়ে তাকে এ ব্যাপারে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করতে হয়েছিল। সুতরাং দাবী আমাদের অবশ্যই জানান কর্তব্য যে পাকিস্তানকে অবিলম্বে এই সশস্ত্র অনুপ্রবেশ-কারীদের সরিয়ে নিতে বলতে হবে।......একটি কথা আমি খুব স্পষ্টভাবেই জানাতে চাই যে যুদ্ধবিরতি ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ার অব্যবহিত পরই যখন অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা শুরু হবে, তখন আমরা এমন কোন ব্যবস্থা স্বীকার করে নেব না, যার ফলে পুনরায় অনুপ্রবেশের পথ খোলা থেকে যায় অথবা যা অনুপ্রবেশকারীদের যথার্থ শিক্ষা দেওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেই সঙ্গে আমি সুনিশ্চিতভাবে এ কথাও জানিয়ে দিতে চাই যে কোনপ্রকার চাপ বা আক্রমণ, আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষার সংকল্প থেকে আমাদের বিচ্যুত করতে পারবে না - যে দেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য।"

শাস্ত্রীজীর চিঠিতে "যুদ্ধবিরতির অনুকূলে যে মনোভাব" ব্যক্ত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে ১৪ সেপটেমবর শাস্ত্রীজীকে লেখা পত্রে সেকরেটারী জেনারেল জানালেন যে প্রেসিডেনট আয়ুবও ঐ একই মনোভাব প্রকাশ করেছেন। "অবশ্য আমি লক্ষ্য করেছি যে, উভয় সরকারই আমার বিনা-সর্তে যুদ্ধবিরতি-পস্তাবের প্রত্যুত্তরে কিছু সর্ত ও সংশোধন জুড়ে দিয়েছেন, যার সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী আমার কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অধিকার নেই।" তিনি আবার ১৬ সেপটেমবর সকাল ৬-৩০টা থেকে লড়াই বন্ধের পরামর্শ দেন। শাস্ত্রীজী তাঁর ১৫ সেপটেমবরের জবাবে উ থান্টকে জানান যে ভারত কোনো প্রতিশ্রুতি দাবি করেনি। তিনি তাঁর

সদিচ্ছার কথা পুনরায় জ্ঞাপন করে লেখেন যে, যে মুহূর্তে উ থান্ট তাঁকে জানালেন যে পাক সরকার এই প্রস্তাবে সম্মত আছেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রস্তাব-মতো অস্ত্রসংবরণ করতে এবং লড়াই থামাতে ভারত প্রস্তুত আছে।

আশ্চর্যের কথা, পালাম বিমানঘাটি থেকে বিদায়ের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে, শাস্ত্রীজী সেই তারিখের চিঠি পাওয়া সত্ত্বেও, উ থান্ট শ্রীশাস্ত্রীর কাছে প্রেরিত এক দীর্ঘ চিঠিতে তাঁর আগের কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন যে উভয় দেশই এমনভাবে সর্ত আরোপ করছে যাতে অপর দিকের পক্ষে যুদ্ধবিরতি গ্রহণ করা খুবই দুরূহ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেকরেটারী জেনারেল অতঃপর বলেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন যে এক সম্মানজনক ও ন্যায়সঙ্গত সমাধানে পৌঁছবার জন্য দুই সরকার যদি নিজেরাই নতুন করে চেষ্টা শুরু করেন, তাহলে বর্তমান সঙ্কটের সবচেয়ে সার্থক নিরসন সম্ভব হবে।......"আমার দিক থেকে, আমি এমন যে কোনো প্রচেষ্টায় দুই সরকারকে সাহায্য করতে রাজি আছি, যা যুদ্ধ থামাতে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করতে পারে। এই প্রসঙ্গে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে আপনাদের সহায়তা করার আগ্রহ প্রকাশ করে যে বহুসংখ্যক প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, তার কথাও আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে, আপনারা যদি শান্তি স্থাপনের পথে এগোতে চান, তাহলে অধিকাংশ দেশই আপনাদের সহায়তা করতে প্রস্তুত।"

উ থান্টের শান্তিদৌত্য সম্পর্কে ১৬ সেপটেমবর শাস্ত্রীজী লোকসভায় বললেন : "অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির অনুকূলে সেকরেটারী জেনারেলের প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করেছি। কিন্তু পাকিস্তানের দিক থেকে সেইরকম সম্মতি ব্যক্ত হয়নি। বস্তুত, লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে যে, সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য থেকে ভারত-পাকিস্তানের সশস্ত্র সৈন্য অপসারণ, রাষ্ট্রপুঞ্জের এক সেনাবাহিনী নিয়োগ করা এবং তার তিন মাসের মধ্যে গণভোট গ্রহণের ব্যাপারে পাকিস্তানী আবদার স্বীকৃত না হলে সে অব্যাহতভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। কিন্তু আমি স্পষ্টভাবে জানাচ্ছি যে এর একটা সর্তও ভারতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। একথা এখন আর গোপন নেই যে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের থিতিয়ে-পড়া প্রশ্নকে খুঁচিয়ে তোলার জন্য ১৯৬৫ সালের ৫ আগস্ট তারিখের মধ্যে পাকিস্তান আক্রমণ শুরু করে। এই রকম নগ্ন আক্রমণের দ্বারাই সে জোর করে মীমাংসা চাপিয়ে দিতে চায়। আমরা নিশ্চয়ই সে সুযোগ দিতে পারি না। সুতরাং এই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের সামনে আর কোনো পথ নেই।"

॥ দশ ॥

১৭ সেপটেমবর সেকরেটারী জেনারেল রাষ্ট্রপুঞ্জ সনদের ৪০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্তানকে সামরিক সংঘর্ষ থেকে বিরত হতে এবং তাদের সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দিতে অবিলম্বে আদেশ প্রচার করবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে আহ্বান জানালেন। উ থান্ট তাঁর রিপোরটে বললেন, দুই সরকারকে পরিষদের এ কথাও জানান প্রয়োজন যে, এই আদেশে তাঁদের সম্মত হতে না পারার অর্থই শান্তিভঙ্গের নিঃসংশয় প্রমাণ এবং এর ফলে সনদের ৩৯ অনুচ্ছেদমতে পরিষদ পুনরায় বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাবলম্বনের অধিকারী হবেন। তিনি আরও বলেন যে, দুই দেশের মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয়ে মতভেদ দূর করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বর্তমান পরিস্থিতি এবং তার অন্তর্নিহিত সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব দুই সরকারের প্রধানদের মধ্যে সাক্ষাতের ববস্থা করার জন্য পরিষদের অনুরোধ জানান কর্তব্য।

রাষ্ট্রপুঞ্জ সনদের ৭ম পরিচ্ছেদের বিধানবলে অবিলম্বে ভারত ও পাকিস্তানকে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করবার আদেশ দেওয়ার জন্য বৃহৎ শক্তিবর্গ এক প্রস্তাব গ্রহণের চেষ্টা করছিল। রাষ্ট্রপুঞ্জের দ্বারা জবরদস্তি ব্যবস্থা অবলম্বনের ব্যাপারে পরিষদের এই প্রস্তাব পাক-ভারত অঘোষিত যুদ্ধের সমাপ্তি আনতে পারবে কিনা, সে বিষয়ে পাক প্রতিনিধি সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চীনের সহযোগিতায় বলপূর্বক কাশ্মীর অধিকার করার অভিযোগও অস্বীকার করেন।

৪৮ ঘণ্টার মধ্যে, অর্থাৎ ২২ সেপটেমবর বেলা ১২-৩০টার মধ্যে (ভারতীয় সময়) ভারত-পাকিস্তানকে যুদ্ধ বন্ধ করতে আহ্বান জানিয়ে পরিষদ আবার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। নেদারল্যানডস এই প্রস্তাবের উদ্যোক্তা এবং খসড়া-প্রস্তুতকারী। ১০টি ভোট প্রস্তাবের পক্ষে পড়ল, বিপক্ষে একটিও না। জরডান ভোটদানে বিরত থাকল। যুদ্ধবিরতি তত্ত্বাবধানকে সফল করার জন্য এবং সমস্ত সশস্ত্র ব্যক্তিকে উভয় দিকে ৫ আগস্ট তারিখের পূর্বের জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবার জন্য পরিষদ সেকরেটারী জেনারেলকে অনুরোধ জানালেন। "নিরাপত্তা পরিষদের ৬ সেপটেমবর তারিখের ২১০ নং প্রস্তাবের কার্যক্রম-সম্পর্কিত ১ম অনুচ্ছেদটি কার্যকরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সংঘর্ষের অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়" তা পরিষদ বিবেচনা করে দেখবেন বলে স্থির করেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জের শান্তিপ্রয়াস সম্পর্কে চীন তার বিরূপতা গোপন করতে পারল না এবং এই ঘোলাটে পরিস্থিতির সুযোগ নেবার চেষ্টা করতে লাগল।

ইনদোনেশিয়ায়, যেখানে কয়েকদিন আগে ভারত-বিরোধী উন্মত্ত জনতার হাতে ভারতীয় দূতাবাস লণ্ডভণ্ড হয়েছিল, সেখানে চীনা-পদাঙ্ক অনুসরণের প্রাণপণ চেষ্টা দেখা গেল। মসকো জানাল যে চীন এবং ইনদোনেশিয়া যাতে পাক-ভারত সংঘর্ষে নাক না গলায়, তার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের উভয়কে কূটনৈতিক পর্যায়ে সতর্ক করে দিয়েছে। চীন তার চরমপত্রের মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়ে যে দ্বিতীয় নোট পাঠিয়েছিল, সে সম্বন্ধে লোকসভায় বিবৃতি দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী জানালেন যে, চীনা সৈন্যরা লাদক ও সিকিমে গুলিবর্ষণ শুরু করেছে। প্রসংগত তিনি বললেন যে চীনাদের পত্রালাপের মধ্যে দিয়ে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে "পিকিং তার সত্য অথবা কাল্পনিক বিক্ষোভের প্রশমন চায় না, চায় তার পাকিস্তানী সাকরেদকে সংগে নিয়ে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ শুরু করার জন্য একটা যেমন তেমন ফিকির।" সীমান্ত যেখানে চিহ্নিত এবং চীনের মতেও যে জায়গা নিয়ে কোনো বিবাদ নেই, সেখানে যদি আমাদের কোনো সামরিক সরঞ্জাম থেকেও থাকে, তাহলে তাদের এলাকায় ঢুকে সেগুলি আমাদের ভেংগে দিয়ে আসতে না বলে চীন সরকারই তো অনায়াসে সেগুলি অপসারণ করতে পারেন।

॥ এগার ॥

রাওয়ালপিনডি থেকে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ পেল যে পাকিস্তান কালহরণের চেষ্টা করছে এবং ভুট্টো বৃহৎ শক্তিবর্গের কাছ থেকে এই গ্যারানটি আদায়ের চেষ্টা করছেন যে যুদ্ধবিরতি কার্যকরী হওয়ার সংগে সংগে ভারতের সংগে কাশ্মীর সম্পর্কে দূতিয়ালি শুরু হবে। উ থান্টের উপমহাদেশ সফরের সময় ভারত যেমন যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে অতি দ্রুত সাড়া দিয়েছিল, তেমনি এবারও নিরাপত্তা পরিষদের লড়াই বন্ধের দাবিতে ভারতই প্রথম আগ্রহ প্রকাশ করল। ২১ সেপটেমবর পূর্বাহ্নে পরিষদকে তার মনোভাব জ্ঞাপন করতে গিয়ে ভারত সেকরেটারী জেনারেলকে বলল যে তিনি যদি সেই দিন বেলা ৪-৩০টার (ভারতীয় সময়) মধ্যে পাকিস্তানের সম্মতির কথা জানাতে পারেন, তবে ২২ সেপটেমবরের মধ্যাহ্ন থেকে যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য সৈন্যাধ্যক্ষদের নির্দেশ দেওয়া হবে। কিন্তু ২২ সেপটেমবর যুদ্ধবিরতি হল না, কেননা পাকিস্তান তখনো সময় নেবার প্যাঁচ কষছে। শেষ পর্যন্ত বৃহৎ শক্তিবর্গের দিক থেকে চাপের ফলে পাকিস্তানের স্বীকৃতি এল অনেক দেরিতে এবং ২৩ সেপটেমবর বেলা ৩-৩০টায় (ভারতীয় সময়) যুদ্ধবিরতি কার্যকর হল। সেপটেমবরের ১ তারিখ থেকে যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে শুরু হয়েছিল, তা

২২ দিন স্থায়ী হল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী পৌনঃপুনিক উক্তি অনুযায়ী এ এক অস্বস্তিকর যুদ্ধবিরতি এবং পাকিস্তান যাতে যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করে হঠাৎ সশস্ত্র হানাদার পাঠিয়ে অথবা সোজাসুজি আক্রমণ করে আমাদের বিঘ্নিত করতে না পারে, তার জন্য পুরোপুরি সতর্কতা বজায় রাখতে হয়েছে। ইতিমধ্যে চীনের চরমপত্র কিন্তু বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

পাকিস্তান যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল যুদ্ধকে পূর্বাঞ্চলে বিস্তৃত করতে। ভারত পূর্ব-পাকিস্তান সীমান্ত এলাকার উপর ক্ষণে ক্ষণে গুলিবর্ষণ ছাড়াও, পাকিস্তান ভারতের এই অঞ্চলের কয়েকটি বিমানক্ষেত্রে বড় রকমের বিমান আক্রমণও চালিয়েছিল। কিন্তু ভারত তা সত্ত্বেও প্ররোচিত হয়নি এই জন্য যে পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা শোষিত এবং অত্যাচারিত পূর্ব পাকিস্তানের জন-গণের সঙ্গে ভারতের কোন বিবাদ নেই। অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানেরও এক ইন্চি মাটি কুক্ষিগত করার ইচ্ছা ভারতের ছিল না—তার উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের সামরিক সামর্থ্যকে চূর্ণ করে দেওয়া। পশ্চিমাঞ্চলের যুদ্ধে ভারতের সেই লক্ষ্য অনেকাংশে পূর্ণ হয়েছে।

ভারত কিংবা পাকিস্তান, কেউই যুদ্ধ ঘোষণা করেনি এবং স্বভাবতই তাদের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কথা নয়। কিন্তু পাকিস্তান এমনই অবস্থার সৃষ্টি করল যাতে ভারতীয় কূটনৈতিক মিশনের পক্ষে কাজ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। লাহোর খণ্ডে যুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক পরই পাকিস্তান তার ইনদোনেশীয় স্যাঙাতদের দেখাদেখি সমস্ত কূটনৈতিক শিষ্টাচারকে অগ্রাহ্য করে কিছু উচ্ছৃঙ্খল ভাড়াটে গুণ্ডাকে করাচির ভারতীয় দূতাবাসের উপর লেলিয়ে দিল। তাদের সাহায্যকারী পুলিশ দূতাবাস এবং কূটনৈতিক কর্মচারীদের বাসভবনে ঢুকে তাঁদের পরিবারবর্গের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ চালাল।

পাকিস্তান বর্তমান যুদ্ধবিরতি মুখেই স্বীকার করেছে, কিন্তু কার্যত তার সীমালঙ্ঘন এখনও চলছে এবং তার প্রতিকার হিসেবে ভারতকেও পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হচ্ছে। তবু এই বিরোধের মধ্যে অস্ত্রের ভূমিকা এখন আর মুখ্য নয়—মুখ্য হল কূটনৈতিক লড়াই, যে লড়াই প্রবলভাবে চলছে রাষ্ট্রপুঞ্জে, চলছে বিশ্বের বড় বড় রাজধানীতে।

ঘরে-বাইরে

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারত শান্তির পথ বেছে নেয়। যে কটি মুষ্টিমেয় দেশ যুদ্ধ রোধ করার জন্য এবং জাতিতে জাতিতে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অবিশ্রাম চেষ্টা চালিয়েছে, ভারত তাদের মধ্যে একটি। ঘটনা-সমাকীর্ণ যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে নতুন যুদ্ধের সম্ভাবনা-প্রতিরোধের ব্যাপারে ভারতের অবদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নানা রকম বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারত তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সংগে, বিশেষত চীন ও পাকিস্তানের সংগে, বছরের পর বছর মধুর সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে এসেছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করে বসে; তারপর থেকে সে-দেশ পূর্ব এবং পশ্চিম—উভয় সীমান্ত এলাকায় প্ররোচনামূলক আক্রমণ অনবরত চালিয়ে এসেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ লোককে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভিখারীর মত জোর করে বের করে দেওয়া হয়। তবু ভারত পাকিস্তানের সংগে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। নবজাগ্রত কমিউনিস্ট চীন এবং উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সংগেও ভারত পরিপূর্ণ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার তিব্বতের উপর ভারতকে কিছু অধিকার দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নেহরুর নেতৃত্বের সময় অনতিবিলম্বে স্বেচ্ছায় আমরা ঐ সব অধিকার চীনকে দিয়ে দিয়েছিলাম। রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য ভারতের মত আর কোন বৃহৎ রাষ্ট্রই চেষ্টা করেনি। অবিচলিত শান্তির নীতি এবং এ দু দেশের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে গিয়ে নেহরুজীকে বহুবার সমালোচনার

সম্মুখীন হতে হয়েছে : তাঁর বিরুদ্ধে অনেকে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার অভিযোগও এনেছেন। কিন্তু তিনি যে-পথ বেছে নিয়েছিলেন তাঁর দেশ যে শান্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, তা থেকে তিনি বিচ্যুত হতে চাননি। অন্য কোন পথ বেছে নেওয়ার অর্থ জাতি-গঠনের মহান ব্রত থেকে সরে যাওয়া। দু শতকের বিদেশী শাসন এবং শোষণের ফলে ভারতের মত স্বর্ণপ্রসূ দেশ কঙ্কালসার হয়ে পড়েছিল; তাই সে-দেশকে পুনর্গঠনের কাজেই তিনি সর্বাগ্রে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

নেহরুজী তাঁর জীবনের গভীরতম দুঃখ পেয়েছেন চীনের বিশ্বাস-ঘাতকতায়; যে-চীনকে তিনি পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে বন্ধু হিসাবে পাবার চেষ্টা করেছেন, সেই চীনদেশ ১৯৬২ সালের অকটোবর-নবেমবর মাসে ভারত আক্রমণ করে বসল। আমরা এ ধরনের আক্রমণের জন্য আদৌ তৈরি ছিলাম না - আমাদের সৈন্যরা সহজেই পর্যুদস্ত হয়ে পড়লেন। পাছে চীন আবার আক্রমণ করে সেজন্য প্রতিরক্ষার ব্যয় দ্বিগুণ করা হল। চীন অনবরত যুদ্ধের হুমকি দিতে লাগল, আর সে-দেশের সঙ্গে আমাদের বৈরিতার সুযোগে পাকিস্তান ভারত আক্রমণের জন্য তৈরি হতে শুরু করল। কমিউনিজম প্রতিরোধের নামে মারকিনী অস্ত্রে পাকিস্তান ছেয়ে গেল; সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনকে পরিবেষ্টনের জন্য যে মারকিনী শিকল তৈরি করা হল, পাকিস্তান সেই শিকলে গাঁটছড়া বাঁধল—পাকিস্তান সিয়াটো এবং সেনটোর সদস্য হল। পাকিস্তান কিন্তু অন্য প্যাঁচ কষছিল—ভারতের পিছনে লাগবার জন্য পাকিস্তান ক্রমেই চীনের দিকে ঝুঁকতে লাগল। এ বছর এপরিল মাসে পাকিস্তান কচ্ছের উপর লুব্ধ থাবা মেলে ধরে। পৃথিবীর সকলেই জানেন, কচ্ছে আমরা কেবল প্রতিরক্ষা-মূলক লড়াই করেছি। সেখানে প্রকৃতি ছিল আমাদের পরিপন্থী, তাই আমাদের সেনাদল সেখানে কিছুটা ভূমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। রাজনৈতিক নেতারা তখন কচ্ছ ছাড়া অন্য কোন এলাকায় প্রতিআক্রমণ চালাবার সুযোগ সেনাদলকে দেন-নি। আমাদের শান্তিকামী মনোভাব এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলাপ-আলোচনার দ্বারা বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য আমাদের আন্তরিক প্রয়াসের কথা পৃথিবীর লোকে বুঝুক আর না বুঝুক—আমাদের সৈন্যদলের সম্মান বহুলাংশে বিনষ্ট হয়ে গেল। তাদের সম্মান সর্বাধিক বিনষ্ট হয় ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণের সময়। কচ্ছের যুদ্ধে যত ক্ষুদ্রাকারই হোক সেনাদলের বিপর্যয়কে জনমন অনেক বড় করেই দেখল; কারণ তাদের মনে নেফার পরাজয়ের স্মৃতি জেগে রয়েছে।

কিন্তু ভারতের ধৈর্য অপরিসীম এবং ভারত মুখ বুজে চিরদিন মার সহ্য করবে—এ কথা যারা ভেবেছিলেন তাদের ভুল ভাঙার পালা এবার এসেছে। এবার আগসট মাসে কাশ্মীরে হাজার হাজার সুনির্বাচিত, ট্রেনিংপ্রদত্ত, সশস্ত্র

হানাদার পাঠিয়ে পাকিস্তান যখন বিদ্রোহ ঘটাবার চক্রান্ত শুরু করল, তখন হানাদার দমনে ভারত কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বনে দ্বিধা বোধ করেনি। ১ সেপটেম্বর থেকে পাকিস্তান পুরোপুরি যুদ্ধ শুরু করার পরও ভারতও নিজেকে এবার আর গুটিয়ে নেয়নি; বরং দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে চ্যালেনজের সম্মুখীন হয়েছে। পাকিস্তান এবং সমগ্র বিশ্ব এবার বোধহয় টের পেয়েছে যে, শান্তির নীতিতে আমরা আস্থা না হারালেও, আমাদের শান্তিপ্রিয়তা দুর্বলতাজনিত নয়। (অবশ্য পাকিস্তানের নেতাদের যুদ্ধবাজী আস্ফালন এবং অনবরত যুদ্ধ-বিরতি লঙ্ঘন থেকে উলটোটাই মনে হতে পারে।) এবারের যুদ্ধের মাধ্যমে ভারত তার শত্রুদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে তাদের অন্যায় প্ররোচনা ভারত মুখ বুজে সহ্য করবে না। ভারত পূর্ণ শক্তিতে তার ভৌম সংহতি রক্ষা করবে।

যুদ্ধের ফলাফল বিচারে যে-কথা সর্বাগ্রে মনে হয় তা হল জনগণের কাছে সেনাদলের মর্যাদার পুনরুজ্জীবন। জনগণ সৈন্যদেব প্রতি অপরিমেয় প্রীতি এবং স্নেহ বর্ষণ করেছে। সৈন্যগণ নিজেদের শক্তির প্রতি পুনবায় আস্থা ফিরে পেয়েছেন এটাও কম কথা নয়। ১৯৬২ সালের অকটোবর-নবেম্বর মাসে চীনা আক্রমণের পর এবং এ বছর এপরিল মাসে কচ্ছ আক্রমণের পর যে-অবস্থাব উদ্ভব হয়েছিল, তা আমূল পালটে গিয়েছে। নৌবহরকে যুদ্ধে নামতে হয় নি; কিন্তু ভারতেব সুবিস্তৃর্ণ উপকূলভাগ সুরক্ষায় নৌবহর অতুলনীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষব বেখেছেন। সশস্ত্র বাহিনী এবং বিমানবহর তাঁদের কৃতিত্বেব উজ্জ্বল পবিচয় দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী গর্বের সঙ্গে তাদেব কৃতিত্বের কথা ঘোষণা করেছেন। মারকিনী অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানের কাছে ভাবতের তুলনায় অনেক বেশি আধুনিক সমরাস্ত্র এবং যুদ্ধবিমান ছিল, কিন্তু স্থলে এবং অন্তরীক্ষে ভারতের অপ্রতিহত প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিরক্ষা-মূলক এবং আক্রমণাত্মক উভয় ধরনেব কাজে যাবা পরিকল্পনা করেছেন আব যারা তাকে রূপ দিয়েছেন—তারা সকলেই কৃতিত্বের অংশভাগী। পাকিস্তানীদের সঙ্গে তুলনায় আমাদের প্রত্যেক জওয়ান এবং প্রত্যেক অফিসার অনেক বেশি বুদ্ধিমত্তা এবং নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। পাকিস্তান আক্রমণ শুরু করলেও আমাদের সেনারা শত্রুদের নিজ দেশে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছেন এবং এই সর্বপ্রথম শত্রুব মাটিতে যুদ্ধ করে তাদের ভূভাগের বেশ কিছু অংশ দখল করেছেন। আমাদের আঞ্চলিক ক্ষতি হয়েছে যৎসামান্য- তাও আবার রাজস্থানের মরুভূমি অঞ্চলে। জনগণ এবং সেনাদলের মধ্যে যে সখ্যসূত্র গড়ে উঠেছে তা বজায় থাকবে এবং ভবিষ্যতে তা দেশের সংহতি রক্ষার কাজে আসবে বলে আশা করা যায়। যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদনের পরের দিন ২৪ সেপটেম্বর তারিখে জেনাবেল চৌধুরী অসামরিক জনগণের প্রতি সশস্ত্র বাহিনীকে নানাভাবে সাহায্য করার জন্য গভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বিশেষ করে অসামরিক

গাড়িচালকদের কথা উল্লেখ করেন, যারা শত্রুসৈন্যের গোলাগুলি তুচ্ছ করে অসম সাহসে সেনাদলের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করেছেন।

সৈন্যদল বিরাট কৃতিত্বের নিদর্শন রেখেছেন সন্দেহ নেই; কিন্তু সমগ্র দেশও ঐক্যবন্ধ হয়ে শাস্ত্রীজীর এবং সরকারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে; পরিস্থিতির ডাকে উপযুক্তভাবে সাড়া দিয়েছে। তিন বছর আগে চীনা আক্রমণের সময় এতটা সাড়া পাওয়া যায়নি। পারলামেনটও একটি ঐক্যবন্ধ সংস্থা হিসাবে কাজ করেছে। যে সব বিষয় নিয়ে বিতণ্ডার ঝড় ওঠে, এক দল বা এক রাজ্য অপরের পিছনে লাগে, সেইসব বিবাদের কথাও সকলে ভুলে গিয়েছেন। জুলাই মাসে খাদ্য সম্পর্কে যে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠিছিল তা স্তব্ধ হয়ে যায়, ভাষাগত বিরোধের প্রশ্ন প্রকাশ্যে একটিবারও উচ্চারিত হতে শোনা যায়নি। রেডিও পাকিস্তান ধর্ম, জাতি এবং আর্থিক বৈষম্যের ধুয়া তুলে শিখদের তাতিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে; বিশেষত পাঞ্জাব এবং দক্ষিণাঞ্চলের যে সব জওয়ান এবং অফিসার সৈন্যদলে যোগ দিয়েছেন, তাদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির চেষ্টা করেছে—কিন্তু তার সব চেষ্টা, সব প্রচার একেবারে ব্যর্থ। পাকিস্তান ভেবেছিল—সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল দেখা দিতে বাধ্য; আর তা ঘটাবার জন্য পাকিস্তানের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু স্বল্পকালীন যুদ্ধের সময় আমরা এ কথা ভালোভাবেই প্রমাণ করেছি যে, স্বাভাবিক সময়ে আমাদের মধ্যে যত অনৈক্য এবং বিবাদই থাকুক না কেন, শত্রুর আক্রমণে দেশের আঞ্চলিক সংহতি বিপন্ন হলে আমরা সব অনৈক্যের কথা ভুলে গিয়ে ঐক্যবন্ধ হয়ে দাঁড়াতে জানি। যদি পাকিস্তান, চীন বা অন্য কোন দেশ এ কথা ভেবে থাকে যে, অতীত যুগের মত এখনও বহিরাক্রমণের মুখে ভারত টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, তাহলে তাদের নতুন করে শিক্ষা গ্রহণের দরকার আছে। বহিরাক্রমণের মুখে কী করে আভ্যন্তরীণ বিবাদ বিসংবাদ তুলে রাখতে হয়, তা আমরা জানি।

বিগত কয়েক মাসের ঘটনাবলীর আর একটি প্রত্যক্ষ ফল, নেতা হিসাবে শাস্ত্রীজীর প্রভূত মর্যাদা লাভ। একে জাতীয় গৌরব বলবেন, না নিছক কংগ্রেস দলের লাভ হিসাবে দেখবেন সেটা ব্যক্তিগত অভিরুচি। 'নেহরুর পর কে?' - এই প্রশ্ন নিয়ে যারা বহুবছর ধরে গবেষণা চালিয়ে আসছিলেন, তারা ১৯৬৪ সালের ২ জুন তারিখে তাদের প্রশ্নের উত্তর পান। ঐ তারিখে পৃথিবীর ইতিহাসে শান্তিপূর্ণতম নেতা নির্বাচন অনুষ্ঠানে শাস্ত্রীজী নেহরুর শূন্য আসন পূর্ণ করার জন্য নির্বাচিত হন। তবু অনেকের মনে অন্যতর প্রশ্ন জেগেছিল—'নেহরুর পর কী?' এবার তারা নিশ্চয়ই প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন। এপরিল-মে মাসে কচ্ছে আমাদের পরাজয়ের পর একটা প্রশ্নই সোচ্চার হয়ে উঠিছিল—শাস্ত্রীজীর নেতৃত্ব কতদিন টিকবে? অথচ আজ ওরকম প্রশ্নের কথা ভাবাই যায় না। সে সময় কিন্তু কংগ্রেস পারলামেনটারি পারটির সদস্যরাও এ

প্রশ্ন নিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ উত্তেজনার আগুন পুইয়েছেন। কারণ, সে-দলে শাস্ত্রীজীর বিরোধীর সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য ছিল না। কিন্তু ধাপে ধাপে শাস্ত্রীজী রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কিত সকল সংশয় মুছে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

এই ছোটখাটো নিরুত্তেজ মানুষটিকে বাইরে থেকে বুঝে ওঠা সত্যিই কঠিন। যুদ্ধ এড়িয়ে চলা যাবে এমন প্রত্যাশার বশবর্তী ছিলেন বলেই কচ্ছে তিনি পাকিস্তানের মার সহ্য করেছেন। তিনি নিজেকে শান্তিপ্রিয় মানুষ বলে ঘোষণা করেন; বস্তুতপক্ষে তিনি তা-ই। কিন্তু কাশ্মীরে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের ব্যাপার যখন সরকারের নজরে এল, তখন তিনি কথায় এবং কাজে প্রমাণ করে দিলেন যে তিনি আদৌ ভয়গ্রস্ত নন, আমাদের ভূমি এবং সার্বভৌমত্ব নিয়ে কাউকে জুয়া খেলার সুযোগ দিতে তিনি রাজী নন। পরিপূর্ণ তেজ এবং স্থির সংকল্প নিয়ে অনড় পাথরের মত তিনি পাকিস্তানী আক্রমণের সম্মুখীন হলেন; তার চেয়ে বড় কথা—বিপদের মুখে সমগ্র দেশকে জাগিয়ে তুললেন, ঐক্যবদ্ধ করলেন, সরকারের সাহচর্য নিয়োগ করলেন। শুধু পাকিস্তানের সঙ্গেই নয়, অন্যান্য দেশের সঙ্গে বোঝাপড়ার ব্যাপারেও তিনি অপ্রত্যাশিত দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। যুদ্ধ যখন এসেই পড়ল, তখন তিনি পুরোপুরি যুদ্ধে নামতে ইতস্তত করেন নি; কোন মুহূর্তেই তাকে বিন্দুমাত্র হতাশ হতে দেখা যায়নি।

আর একজন নেতার ক্রমোন্নতির কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি হচ্ছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চ্যবন। ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণের সময় তিনি শ্রী ভি কে কৃষ্ণ মেননের কাছ থেকে প্রতিরক্ষা দফতরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর পরিচালনায় সেনাবাহিনীর আকারগত এবং গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। কচ্ছ আক্রমণের সময় পাকিস্তানী শত্রুর মোকাবিলায় সেনা-দলকে কতটুকু অগ্রসর হবার সুযোগ দেওয়া যায়—সে সম্পর্কে তাঁর মনে হয়ত দ্বিধা ছিল; কিন্তু আগসট-সেপটেমবর মাসে তাঁর সব দ্বিধা মুছে গিয়েছে—দেশের মাটি থেকে শত্রু বিতাড়নের জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প হয়ে উঠেছেন। অনেকের দুঃখ—তিনি শুধু পাকিস্তানীদের অপকৌশল বানচাল করার আদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন; লাহোর এবং শিয়ালকোটের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক শহর দখলের অনুমতি দেননি। এ দুটো শহর দখলের অনুমতি দিলে যুদ্ধক্ষেত্রে পাকিস্তানীদের চরম পরাজয়ের চিত্রটাই শুধু প্রকট হয়ে উঠত না; সেক্ষেত্রে পাকিস্তানী নেতারা পরাজয়ের প্রকৃত চেহারাটা দেশের লোকের কাছ থেকে গোপন করতে পারতেন না।

১৯৪৮ সালে যে প্রতিশ্রুতিই দেওয়া হোক না কেন, এ সিদ্ধান্তে ভারত

বহু বছর আগেই উপনীত হয়েছে যে, কাশ্মীরে গণভোট নেওয়া চলবে না। কারণ, পাকিস্তান তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে; তাছাড়া কাশ্মীরের পরিস্থিতির আমূল রূপান্তর ঘটেছে। শাস্ত্রীজী পাকিস্তান এবং অন্যান্য বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর কানের কাছে ঢাক পিটিয়ে এ কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন যে, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; সেখানে কোন রকম বাহ্য হস্তক্ষেপ সহ্য করা হবে না। এই দৃঢ় মনোভাবে সুফল ফলেছে বলেই মনে হয়। কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে গণভোট প্রয়োগের বিষয়ে পশ্চিমা শক্তিগোষ্ঠীর গোঁ স্পষ্টই কমে এসেছে।

ভারত পাকিস্তানের এক ইনচি জমিও গ্রাস করতে চায় না; তার নিজের এক ইনচি জমিও সে ছেড়ে দিতে রাজী নয়। পাকিস্তানের ভূমি কতটুকু দখল করা হয়েছে, সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু এই স্বল্পকাল স্থায়ী যুদ্ধে আমরা যে পরিমাণ সামরিক এবং নৈতিক শক্তির অধিকারী হয়েছি তার মূল্য অপরিমেয়। এই শক্তি আমাদের জাতিগত গৌরব ও মহত্ত্ব রক্ষা করবে, আর শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেই নয়, পৃথিবীর সমগ্র জাতিপুঞ্জের মধ্যে আমাদের জন্য একটি গৌরবের আসন সুচিহ্নিত হয়ে থাকবে। হোম ফ্রনটে যেসব সমস্যা রয়েছে, যে-গুলি যুদ্ধের সময় আরো প্রকট হয়ে উঠেছে, সেগুলিকে অবহেলা করা উচিত হবে না। সরকার এ বিষয়ে সচেতন, আর সে জন্যই নেতারা জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছেন। আমরা ভালোভাবেই দেখেছি, কয়েকটি দেশ কীভাবে আমাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমাদের উপর তাদের নীতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

চীন এবং পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ আমাদের উন্নয়ন যোজনার উপর কতটা প্রভাব ফেলেছে তা ভেবে দেখা দরকার। চীনা আক্রমণের পর আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যয় দ্বিগুণ করা হয় -বার্ষিক প্রতিরক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৮০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পাঁচ বছরের যোজনার হিসাব ধরলে, এই ব্যয় বৃদ্ধি তৃতীয় যোজনায় এক বছরে আভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে লভ্য মোট বিনিয়োগের সমান। শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন বেড়েছে যতটা আশা করা হয়েছিল তার অর্ধেক; কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন এক জায়গাতেই থেমে রয়েছে। ফল দাঁড়াল এই : প্রতিরক্ষার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় মূল্যস্তরের উপর চাপ সৃষ্টি করল, মুদ্রাস্ফীতির ঝোঁক স্পষ্ট হয়ে উঠল; আর তার ফলে অসংখ্য লোকের জীবনযাত্রার মান শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। মুদ্রাস্ফীতির চাপটা এত তীব্র এবং ব্যবসায়ী মহল জাতীয় স্বার্থের চেয়ে নিজেদের স্বার্থকে এত বেশি বড় করে দেখছে যে তার ফলে গত বছর রেকরড পরিমাণ উৎপাদন, বিদেশ থেকে রেকরড পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি এবং সরকারের পুরোনো সঞ্চয় থেকে রেকরড পরিমাণ শস্য খরচ করেও মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বগতি দমন করা যায়নি; মূল্যস্তর সাম্প্রতিক

কালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠে অনড় হয়ে রয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধার ফলে প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে এখন বার্ষিক ১০০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। আমাদের দুই কুচক্রী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের যুদ্ধলিপ্সার মোকাবিলার জন্য তৈরি থাকতে হলে ঐ ব্যয় আরো ২০০ কোটি টাকা বাড়াবার দরকার হতে পারে। অন্যভাবে বলতে গেলে ১৯৬২ সালের তুলনায় ১৯৬৬-৬৭ সালে আমরা প্রতিরক্ষা খাতে ৮০০ কোটি টাকা বেশি খরচ করতে বাধ্য হব। চতুর্থ যোজনার পাঁচ বছরে এই ব্যয়ের মোট পরিমাণ দাঁড়াবে ৪০০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ প্রস্তাবিত ২১৫০০ কোটি টাকার যোজনার প্রায় এক বছরের বিনিয়োগের সমান। যোজনায় বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৪০০০ কোটি টাকা। কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধার পর থেকে পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী আমাদের সাহায্য দেওয়া বন্ধ করেছে; সুতরাং ভবিষ্যতে বিদেশী সাহায্য সম্পর্কে কম আশাবাদী হওয়াই ভালো। প্রথমত, আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বিষয়ের চাপে এবং দ্বিতীয়ত যুদ্ধের চাপে, চতুর্থ যোজনা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ১৯৬৬-৬৭ সালের জন্য এমন একটি যোজনা ঠিক করা হয়েছে যাকে 'প্ল্যান হলিডে' বলা চলে। এ সময়ে সম্পদের প্রধান অংশ ব্যয়িত হবে প্রতিরক্ষা-শিল্পের খাতে এবং কৃষি খাতে।

রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকে কৃষিই বর্তমানে দেশের প্রধান সমস্যা। রাজনীতির দিক থেকে যে পি এল ৪৮০ খাদ্য চুক্তির উপর আমরা অসহায়ভাবে নির্ভরশীল, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে পাকিস্তানের সঙ্গে মিটমাটের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতে চাইছে। মিটমাটের সর্তটা হবে তাদের পছন্দমাফিক, যা মেনে নিতে গেলে 'আমরা নিজেদের সর্ত ছাড়া' অন্য কোন সর্তে মিটমাটে রাজী হব না — প্রধানমন্ত্রীর এই প্রকাশ্য ঘোষণা লংঘন করতে হয়। আমাদের যোজনার লক্ষ্য যাতে শিল্প থেকে কৃষির দিকে সরে আসে—এ উদ্দেশ্যেও মারকিন যুক্তরাষ্ট্র খাদ্য সাহায্য চুক্তিটিকে কাজে লাগাতে চাচ্ছে। বস্তুতপক্ষে লক্ষ্যের পরিবর্তন ইতিমধ্যেই হয়েছে বলে মনে হয়। আমাদের নেতারা যখন স্বয়ংভরতার কথা বলেন, তখন খাদ্যের কথাটাই তাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। কিন্তু শুধু কথায় কোন কাজ হবে না। উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপন্ন দ্রব্যের সুষম বণ্টনের পথে যে-সব কায়েমী স্বার্থ প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়, সে-গুলিকে কঠোর হস্তে অপসারণ করতে হবে; জাতীয় স্বার্থকে ব্যক্তি স্বার্থ, দলীয় স্বার্থ বা শ্রেণী স্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখতে হবে। লোকজন কোমরের দড়ি কষে বাঁধবেন, কিন্তু তার আগে এ গ্যারানটি দিতে হবে যে সকল শ্রেণীর লোক কষ্টটা সমানভাগে ভাগ করে নেবেন। দিল্লিতে মন্ত্রীদের ফুলের বাগান চাষ করার সংবাদে যেন কারো কিছু অভিযোগ করার না থাকে। (অবশ্য, স্পষ্ট কারণেই, এ কাজে সরকারী অর্থ কী বিপুল পরিমাণ

ব্যয় হয়, সে সম্পর্কে কিছু বলা হয় না।) ভূমি কর্ষকের হাতে জমি তুলে দেওয়ার পুরোনো কংগ্রেসী প্রতিজ্ঞাটা রূপায়িত করার সময় এসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানে, খাদ্যই আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। শাস্ত্রীজীকেই প্রমাণ করতে হবে যে শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই নয়, খাদ্যের ক্ষেত্রেও তিনি দেশকে সাফল্যের অভিমুখী করার ক্ষমতা রাখেন। শুধু ক্ষুধার্ত মুখে অন্ন জোগাবার জন্যই নয়, পশ্চিমী দেশগুলি আমাদের উপর যে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, তা বানচাল করে দেবার জন্যও খাদ্যোৎপাদন বাড়ানো অবশ্যকর্তব্য। প্রত্যেক দেশেই যুদ্ধের সময় শিল্পোৎপাদন অত্যন্ত জোরদার হয়ে ওঠে। কিন্তু ভারতে শিল্পোৎপাদন ঢিমে গতিতেই চলছে; অনেক উৎপাদন শক্তি অলস হয়ে পড়ে আছে। এ কারণ, বিদেশী মুদ্রার কড়াকড়ি হেতু সরকার যন্ত্রপাতি, কাঁচা-মাল, যন্ত্রাংশ প্রভৃতি দ্রব্যের আমদানির পরিমাণ অনেক কাটছাট করতে বাধ্য হয়েছেন। অন্যান্য কারণও আছে। কী সরকারী আর কী বেসরকারী সব রকম শিল্পেই দক্ষতা এবং উদ্ভাবনামূলক কাজের একান্ত অভাব। দেশীয় সম্পদ এবং প্রতিভা না খুঁজে প্রায় সকলেই হাজারো রকম লাইসেন্সের জন্যে উদ্যোগ-ভবনে ধর্ণা দিচ্ছেন। (উদ্যোগ-ভবনে বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের অফিস-গুলি অবস্থিত।) বর্তমান অবস্থাতেও যদি প্রকৃত আত্মবিশ্বাস না জন্মায়, তাহলে হোম ফ্রন্টে আমাদের অবস্থাটা উদ্বেগজনক হয়েই থাকবে, আর তার ফলে আমাদের পররাষ্ট্রনীতিতে বিপর্যয় দেখা দেবে।

যেমন পাকিস্তানের পক্ষে তেমনি আমাদের পক্ষে যুদ্ধটা একটা কূটনৈতিক শিক্ষাদাতার কাজ করেছে। এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, আজকের পৃথিবীতে তথাকথিত আদর্শভিত্তিক জোট, বন্ধুত্ব কিংবা শত্রুতা সব সময়েই একরকম থাকবে -এ আশা করা ভুল। সিয়াটো এবং সেনটোর অন্যতম প্রধান অংশীদার পাকিস্তান সামরিক দিক থেকে অনেক দেশের কাছে বাঁধা পড়ে গিয়েছে। সে-সব দেশের মধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং পশ্চিম এশিয়ার কয়েকটি ঐশ্লামিক রাষ্ট্র। অনেকেই পাকিস্তানকে নীতিগতভাবে হয়ত সমর্থন করেছে; কিন্তু তার প্রকৃত সাহায্যে কেউই এগিয়ে আসেনি। যুদ্ধ চালনার পক্ষে পাকিস্তানের তুলনায় ভারতের শিল্প-সম্পদ অনেক বেশি; গত সেপ্টেমবর মাসের যুদ্ধের তুলনায় আরো দীর্ঘস্থায়ী কোন যুদ্ধ সংগঠিত হলে আমাদের প্রাধান্য আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠতো। পশ্চিমী দেশগুলি ভারত এবং পাকিস্তান দু দেশকেই সামরিক সরঞ্জাম দেওয়া বন্ধ করেছে। কেবল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিই তাদের কথার দাম রেখেছেন; আর তাই যুদ্ধবিরতির পর নতুন চুক্তির জন্য আমরা এ সব দেশের দিকেই ঝুঁকেছি। অবশ্য, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ—এই পুরোনো মনোভাব থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এক সময় অন্য দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলেই

মনে হচ্ছিল। তাদের এই মৌলিক মনোভাব অপরিবর্তিত রয়েছে কিনা, সে সম্পর্কে কোন সোভিয়েত নেতা ঐ সময় কোন প্রকাশ্য বিবৃতি দেননি। চীনা আক্রমণের সময়কালীন কয়েকটি ঘটনার মধ্যেই বোধহয় এর কারণ নিহিত রয়েছে। তখন ব্রিটেন এবং আমেরিকার প্রত্যক্ষ চাপে পড়ে সেই সময়কালীন যুদ্ধবিরতি রেখার ভিত্তিতে ন্যায্য সামঞ্জস্য বিধান করে কাশ্মীর সমস্যা মিটিয়ে ফেলার জন্য ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে বহুবার বৈঠকে বসেছিল। ভারতের অবস্থা ঐ রকম হওয়ায় (যা এখনও হতে পারে) রাশিয়ানরা বোধহয় এ বাপারে সতর্ক হওয়াটাই বুদ্ধিমত্তার কাজ বলে মনে করেছিলেন। পাকিস্তানকে বিরক্ত না করে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের সঙ্গে বরাবর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে চেয়েছে। এতে আমাদের চেতনা জাগা উচিত। রাশিয়ার সমর্থন চির-কাল পাওয়া যাবে—এ রকম প্রত্যাশা ঠিক নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন সন্দেহ করছে যে, আমরা পশ্চিমী ক্যাম্পের দিকে ঝুঁকছি এবং এ ব্যাপারে সে-দেশ অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে আমাদের খুব একটা শ্রদ্ধার মনোভাব নেই। গত এক দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে পাকিস্তানকে প্রদত্ত মারকিনী অস্ত্রশস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে কাজ লাগানো হবে না। অথচ এবারের যুদ্ধে পাকিস্তান মার্কিনী পাটন ট্যাংক, স্যাবার জেট, এফ ১০৪ ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা সত্ত্বেও মারকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যে পাকিস্তানকে দোষারোপ করার প্রয়োজন বোধ করেনি। এতে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে ভারতে তিক্ততা দানা বেঁধেছে। আমাদের অতি প্রয়োজনীয় পি এল ৪৮০কে সে-দেশ ভারতের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির জন্য কাজে লাগাচ্ছে; তাছাড়া মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৫-৬৬ সালে ভারতকে প্রদেয় আর্থিক সাহায্য দান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, 'এড ইন্ডিয়া কনসরটিয়ামের' অন্যান্য সদস্যও যাতে ভারতকে সাহায্য না দেয়, তার জন্য ওকালতি করা শুরু করেছে।

পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে ব্রিটেনের সংগে আমাদের সম্পর্ক তিক্ততম হয়ে উঠেছে। ভারতের দৃঢ় বিশ্বাস : ব্রিটেন শুধু নিজেই ভারত বিরোধী তথা পাকিস্তান ঘেঁসা নীতি অনুসরণ করছে না; মারকিন যুক্তরাষ্ট্রকেও অনুরূপ নীতি অনুসরণ করার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অফিসের ভারত-পাকিস্তান বিশেষজ্ঞ শ্রীসিরিল পিকওয়ারড আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আমেরিকান নেতাদের সঙ্গে ভারত-পাক বিবাদ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য মারকিন যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শনে যাওয়ায় ভারতের সন্দেহ আরো দৃঢ় হয়েছে। ৬ সেপটেমবর তারিখে ভারত আত্মরক্ষার প্রয়োজনে লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পর উইলসন যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে ভারতের সুরে

ব্রিটেনের মতানৈক্য প্রকট হয়ে ওঠে। পাকিস্তান ছাম্বে আন্তর্জাতিক সীমারেখা লঙ্ঘন করলেও উইলসন মুখ বন্ধ করে বসেছিলেন; কিন্তু ভারত লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হলেই তিনি তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত করে বসলেন, "ভারত আজ পাঞ্জাব সীমান্তে আন্তর্জাতিক সীমারেখা বরাবর পাকিস্তানে আক্রমণ চালিয়েছে" এবং এই আক্রমণ "৪ সেপটেম্বর নিরাপত্তা পরিষদ যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, তার পরিপন্থী।" ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ছাড়ার জন্য ভারতে যে প্রস্তাব ইতিপূর্বেই উঠেছিল, এবার তা সোচ্চার হয়ে উঠলো; অন্যান্য কংগ্রেসী সদস্যের সমর্থন পেয়ে জনৈক কংগ্রেসী সদস্য লোকসভায় এ মর্মে বেসরকারী প্রস্তাব আনলেন। এ প্রস্তাবের আলোচনার সময় যে ক্রুদ্ধ বক্তৃতা শোনা গেল তা ব্রিটেনের প্রতি সতর্কবাণী। ব্রিটেন ভারতের প্রতি শত্রুতাচরণ বন্ধ না করলে কী ঘটতে পারে এতে তারই ইংগিত পাওয়া গেল। অবশ্য কমনওয়েলথ এর সংগে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার কোন আশু সম্ভাবনা নেই। সম্প্রতি ভারতের প্রতি ব্রিটেন এবং আমেরিকার আচরণ অনেকটা নরম হয়ে আসার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে; শাস্ত্রীজী এ বিষয়ে প্রকাশ্য উক্তিও করেছেন। আমাদের তরফেও এ দুটি পশ্চিমী দেশের অনুকূলে আমাদের মনোভাবে লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে। আমাদের দৃঢ় মনোভাবের ফলে কিছুটা সুফল হয়েছে বলেই মনে হয়।

পাকিস্তান কারো কারো কাছ থেকে নৈতিক সমর্থন পেয়েছে; তেমনি ভারতের পক্ষেও অনেকে সমর্থন করেছেন। এদের মধ্যে আছে যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইথিওপিয়া, মালয়েশিয়া এবং সিংগাপুর। এশিয়ার এবং আফ্রিকার দেশগুলি বিবাদের নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবেই রয়েছে; প্রত্যক্ষত তারা বিবাদে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। অপ্রকাশ্যভাবে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র এবং অন্য কয়েকটি দেশ উভয় পক্ষকে সংযত হবার এবং বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধান খোঁজার পরামর্শ দিয়েছে। ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধের সময় প্রধান প্রধান আফরো-এশীয় দেশগুলি যে মনোভাব নিয়ে কাজ করেছিলেন এবারের আচরণের সংগে তার তফাৎটা সুস্পষ্ট। সে সময় কলম্বো শক্তিগোষ্ঠী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন এবং বৈঠকে মিলিত হয়ে ভারত চীন বিবাদের অবসান ঘটানোর জন্য বহু প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। এ পর্যন্ত কোন সমাধান না হয়ে থাকলে সে-দায় চীনের, কারণ চীন বিনা সর্তে প্রস্তাবগুলি মেনে নেয়নি। আমাদের দিক থেকে ধ্যানধারণা দৃঢ়ীভূত হয়ে এসেছে এবং আমাদের নীতি নমনীয়তা হারিয়েছে বলেই মনে হয়– অথচ নমনীয়তা না থাকলে কোন বৈদেশিক নীতির সার্থক হবার আশা করা যায় না। চীনের সংগে আমাদের বিবাদের কিছু কৌতূহলজনক ফলাফল দেখা দিয়েছে। পাকিস্তান চীনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এর ফলেই ভারত যাতে আমেরিকার

দিকে ঝোঁকে তার ভূমি প্রস্তুত হয়েছে; আর আমেরিকাও পাকিস্তানকে পুরোপুরি ড্রাগনের কবলে ঠেলে না দিয়েও নিজের কক্ষের মধ্যে ভারতকে পাবার আশা পোষণ করতে শুরু করেছে।

চীন আফরো-এশীয় শীর্ষ সম্মেলন দ্বিতীয়বার স্থগিত রাখার প্রস্তাব তোলায় নয়া দিল্লির সাউথ ব্লকে (বহির্বিষয়ক দপ্তরে) যে আশার সঞ্চার হয়েছিল, এখন তা মুছে গিয়েছে। আমরা আফরো-এশীয় জগৎ থেকে চীনের বিদায় হিসাবেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছিলাম এবং যেন সে-দেশকে কোনঠাসা করার জন্যই নির্দিষ্ট দিনে সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিলাম।

আমাদের সিদ্ধান্তটা একটু বেশি তাড়াহুড়ো করে নেওয়া হয়েছিল; আলজিয়ারসে পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের প্রস্তুতি সভায় দ্বিতীয় বাদুং স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তেই এ কথা একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ বৈঠক পুনরায় কবে হবে তা কেউ বলতে পারে না। ভারতের সরকারী মহলে এ রকম একটা মনোভাব নানা কারণে বলে মনে হয় যে, বৈঠক এর পর হলেও তেমন কিছু করার থাকবে না। এ মনোভাব বিপজ্জনক; কারণ এর ফলে আফরো-এশীয় জগৎ থেকে আমরা আরো দূরে সরে যেতে পারি। চীন এবং পাকিস্তান এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে এ সব দেশে ভারতবিরোধী মনোভাব গড়ে তোলার চেষ্টা চালাবে।

পাকিস্তান কাশ্মীরে বিদ্রোহ ঘটাতে সক্ষম হয়নি; কিন্তু আমাদের এ কথা ভুললে চলবে না যে তারা কাশ্মীর সমস্যাকে আবার তাজা করে তুলতে পেরেছে। নিরাপত্তা পরিষদ নিজেই ২০ সেপটেম্বরের প্রস্তাবে "বিবাদের অন্তরালস্থিত রাজনৈতিক সমস্যার" [illegible] এবং "[illegible]নের সহায়ক" উপায় গ্রহণের কথা বলেছে। যুদ্ধবিরতির অবস্থায় অস্বস্তিজনক ভাব এখনও বজায় রয়েছে; ভারত প্রস্তাব অনুযায়ী কোন কিছু করার আগে যুদ্ধবিরতিকে পুরোপুরি কার্যকর করার জন্য বেশ দৃঢ়তার সংগে দাবি তুলেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ শেষ পর্যন্ত কীভাবে সমস্যার সমাধান করবে তা বলা দুষ্কর। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ—কারো চাপে পড়ে ভারত এই মনোভাব থেকে যে আদৌ টলবে না, সে সম্পর্কে ভারত সন্দেহের অবকাশ রাখেনি।

ঘটনাপঞ্জী

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

সকালবেলায় পাক্‌ গোলন্দাজ বাহিনী জানগড় এলাকায় ভারতীয় ব্যাটেলিয়ান হেড কোয়ার্টারসের উপর গোলাবর্ষণ করে। জানগড়, যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা থেকে ২৫ মাইল দূরে।

শ্রীনগরে

আবার ঐ দিনই, শ্রীনগর-লে রোডে একটি ভারতীয় কনভয়ের ওপর সশস্ত্র হামলাবাজরা অতর্কিতে আক্রমণ করে। শ্রীনগর-লে রোড যুদ্ধবিরতি সীমা-রেখা থেকে ২৫ মাইল দূরে।

ধৃত একজন হানাদার রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষকদের কাছে স্বীকার করেছে যে, সে কারাকোরাম স্কাউটসের একজন সদস্য। তাকে এবং আরও কয়েক-জনকে গুন্ড অঞ্চলে শ্রীনগর-লে রোডে ব্রীজ ধ্বংস করার জন্যে পাঠানো হয়েছিল।

তাড়া-খাওয়া হানাদাররা যেসব অস্ত্রশস্ত্র এবং যন্ত্রপাতি ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়েছিল সেগুলি দেখে রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষকদের স্থির বিশ্বাস, অস্ত্র ও যন্ত্রপাতিগুলি পাকিস্তান থেকে এসেছে।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

ভারতীয় বিমান বাহিনীর ২৮টি বিমান ছাম্ব এলাকায় গিয়ে পাকিস্তানের প্রচন্ড আক্রমণকে প্রতিহত করে। শত্রুপক্ষের ১০টি ট্যাংক বিধ্বস্ত।

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

ভারত-পশ্চিম পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্তে ছাম্ব এলাকায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর পর্যবেক্ষক বিমানটির সঙ্গে আক্রমণোদ্যোত পাক বিমান এফ-৮৬ সাবার জেটের সংঘর্ষ।

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

ছাম্ব আখনুর খন্ডে ভারতীয় বাহিনী অগ্রসরদ্যোত পাকিস্তান হানাদারদের ঘিরে ফেলেছে। ভারতীয় বিমান বাহিনী আকাশযুদ্ধে পাক্ জেট বিমান-গুলিকে পরাভূত করেছে। ১৮টি পাকিস্তানী ট্যাংককে বিধ্বস্ত এবং চারটে এ্যান্টি এয়ারগানকে অকেজো করে ফেলা হয়েছে। পাকিস্তান মস্জিদে বোমা বর্ষণ করেছে এবং ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

পাকিস্তান দাবী করেছিল ছাম্ব সেকটরে ১৮টি ভারতীয় ট্যাংক তারা দখল করেছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবন পাকিস্তানের এই দাবী উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, একেবারে বাজে, আসলে যুদ্ধে আমরা মাত্র ৫টি ট্যাংক হারিয়েছি। রাষ্ট্রদূত বি, কে, নেহরু ইউ, এস সেক্রেটারী অফ স্টেট ডিন রাস্কের কাছে এই বলে অভিযোগ করেছেন যে পাকিস্তান কাশ্মীর যুদ্ধে ইউ এস ট্যাংক ও বিমান ব্যবহার করছে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

ছাম্ব-জাউরিয়ান খন্ডে প্রচন্ড যুদ্ধ। তিনটি প্যাটন ট্যাংক বিকল। পাকিস্তানী বাহিনীর হেড কোয়ার্টার্সে ভারতীয় ফৌজের আক্রমণ। আরো দুটো এফ-৮৬ সাবার জেট ভূ-পাতিত।

একটি আর্মি কনভয় যখন ছাম্ব খণ্ড দিয়ে যাচ্ছিল তখন পাক জেট বিমান তার উপর বোমা বর্ষণ করে।

৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

স্কোয়াড্রন লীডার কীলার ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট পাথানিয়াকে বীরচক্র উপাধি দান।

রাওয়ালপিণ্ডি ও লাহোরে নিষ্প্রদীপের মহড়া।

পাকিস্তান সামরিক কর্মচারীদের ছুটি বাতিল করে দিয়েছে।

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

পাকিস্তানী বিমান রণবীরসিংপুরা এলাকায় একটি গ্রামে বোমা বর্ষণ ক'রে ৫ জন নিহত এবং অন্য ৭ জনকে আহত করেছে।

পাক-বিমানের লুধিয়ানা থেকে ৯ মাইল দূরে ম্যাচিওযাবা গুরুদ্বারের উপর রকেট নিক্ষেপ।

ছাম্ব খণ্ডে ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রচণ্ড আঘাতে পাকিস্তানীরা পালাচ্ছে। যাবার আগে ট্রাক্টরের সাহায্যে বিকল প্যাটন ও শেরম্যান ট্যাঙ্ক-গুলোকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে।

পাকিস্তান ছাম্ব খণ্ডে রাজাউরী এলাকায় নাপাম বোমা ব্যবহার করেছে. - একজন সরকারী মুখপাত্র বলেছেন।

ছাম্ব খণ্ডে জাউরিয়ানের পশ্চিমে প্রচণ্ড লড়াই চলছে। শত্রুপক্ষ ক্রমশই পিছিয়ে যাচ্ছে। ওদের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর কয়েকটি পাক জেট বিমান জম্মু জেলার উপর দিয়ে পর্যবেক্ষণ ক'রে গেছে। তারা কয়েকটা গ্রামের উপর রকেট

নিক্ষেপ করেছে।-২৫টি বাড়ি ধ্বংস হয়েছে। ৪ জন বে-সামরিক অধিবাসী গুরুতর আহত হয়েছে।

ভারতীয় বিমান বাহিনী আজ রাওয়ালপিণ্ডির কাছে চাকলালা বিমান ঘাঁটির বিরাট ক্ষতি করেছে। এছাড়াও পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় বিমান ঘাঁটি সারগোদায় তারা দুবার আক্রমণ করে এসেছে।

জরুরী আহবানে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসে। সেক্রেটারী জেনারেল ভারতে ও পাকিস্তানে আসতে চেয়েছেন।

পাকিস্তান পাঠানকোট, অম্বালা ও পাতিয়ালায় ছত্রীবাহিনী ছেড়ে দিয়েছে। পাক প্রেসিডেণ্ট আয়ুব দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন। সামরিক কর্মচারীদের ছুটি বাতিল করে দেয়া হয়েছে এবং আমরা যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছি বলে ঘোষণা করেছেন।

পূর্ব পাকিস্তানে এক জনতা মোগলহাটে ভারতীয় একটি ট্রেনকে থামিয়ে যাত্রী ও রেলের কর্মচারীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে।

পুঞ্চ সেকটরে আমাদের ভারতীয় বাহিনী বীরত্ব সহকারে এগিয়ে এসেছে। তারা গুরুত্বপূর্ণ তিনটি ঘাঁটি এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র দখল করতে সমর্থ হয়েছে। অধিকৃত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে আছে, ২টি ৮১-এম এম মর্টার, ৬টি এম এম জি এস, ৭টি এল এম জি এস, ২৪টি রাইফেল, ১৫টি খাদ্য ও অস্ত্র বোঝাই ৩ টনের লরি। খাদ্যের পরিমাণ এত বিপুল যে হাজার জন এক মাস ধরে খেতে পারে। এ ছাড়াও ৪৭ জন পাকিস্তানীকে বন্দী করা হয়েছে।

শ্রীনগর বিমানঘাটি আক্রমণ করতে গিয়ে পাকিস্তানী বিমান অপেক্ষমান রাষ্ট্রসংঘের একটি বিমানের উপর বোমা নিক্ষেপ করেছে।

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

ভারতীয় বাহিনী লাহোর খণ্ডে পাঞ্জাব সীমান্ত পার হয়েছে।

ভারতীয় বিমান বাহিনী পাঞ্জাব সীমান্তের অপর পারে সামরিক ঘাঁটি-সমূহে আঘাত হানতে শুরু করেছে।

ছাম্ব খণ্ডে আমাদের সৈন্যরা কয়েকটি পাকিস্তানী ট্যাঙ্ক ধ্বংস করে আরো এগিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান লোকজন ও যন্ত্রপাতি সরিয়ে নিতে আরম্ভ করেছে।

পশ্চিম পাকিস্তানে কী স্থলে, কী আকাশে আমাদের ভারতীয় বাহিনী বিপুল বিক্রমে জয়লাভ ক'রে চলেছে।

আমাদের সৈন্যরা যখন অমৃতসর থেকে লাহোরে এগিয়ে যাচ্ছিল, পাকিস্তান তখন প্রতিআক্রমণ চালায়। ভারতীয় বাহিনী তা স্তব্ধ করে দিয়েছে।

আমাদের বিমান বাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক ঘাঁটিগুলির উপর জোর আক্রমণ চালাচ্ছে।

ভারত একদিনেই মোট ২৬টি পাক জেটকে ভূপাতিত ক'রে দিয়েছে। এদের মধ্যে আছে ২টি সুপারসনিক এফ-১০৪, ৩টি এফ-৮৬ সাবার, ২টি দু-ইঞ্জিন যুক্ত মালবাহী বিমান এবং দুটি বি-৫৭ বোমারু বিমান। এছাড়াও ২১টি ট্যাংক, ১৪টি আরটিলারি পাইপ, দুটো হালকা এ্যাণ্টি এয়ার ক্রাফট্ গান ও বিপুল পরিমাণ সাঁজোয়া গাড়ি। পক্ষান্তরে ভারত হারিয়েছে মোট ৮টি বিমান।

লাহোরের পশ্চিমখণ্ডে সীমান্ত সংলগ্ন ডেরা বাবা নানক ব্রীজটি পাকিস্তান উড়িয়ে দিয়েছে। এই এলাকায় শত্রুপক্ষের ৪টি ট্যাঙ্ককে ভারতীয় সৈন্যরা অকেজো করে দিয়েছে।

১৬৯

পাঞ্জাবের কয়েকটি শহর থেকে অনেক ছত্রীসৈন্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়াও পাঠানকোট অঞ্চলে একজন মেজর সহ ৩২ জনকে এবং আম্বালায় ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কেউ কি ছত্রীসৈন্যদের সম্পর্কে তল্লাশ দিতে পারলে, সরকার পুরস্কৃত করবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

পাকিস্তানীরা হুসনীওয়ালা সীমান্তের অপর পারে একাধিক ঘাঁটি খালি করে দিয়ে লাহোরের দিকে পশ্চাদপসরণ করছে।

সরকারী খবরে বলা হয়েছে, কাশ্মীরের দক্ষিণ-পশ্চিমে হানাদার অধ্যুষিত অঞ্চল ব'লে অখ্যাত রাইথান এলাকাটি এখন হানাদারমুক্ত হয়েছে। প্রকাশ, হানাদাররা এখন কাশ্মীর উপত্যকার আরো উত্তর-পশ্চিমে সরে গেছে। কুচবিহার সীমান্তে কয়েকটি পাকিস্তানী জেট্‌কে উড়তে দেখা গেছে। উত্তর বাঙলায় মোগলঘাটে গুলির আওয়াজ শোনা গেছে।

কী পশ্চিম, কী পূর্ব, উভয় দিকেই, সমগ্র পাক-ভারত সীমান্ত বরাবর, পাকিস্তান আকাশ-যুদ্ধকে বিস্তৃত করে দিচ্ছে। গত ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তান পাঞ্জাবের পাঠানকোটে, অমৃতসরে, জলন্ধরে, ফিরোজপুরে এবং অন্যান্য স্থানে, কাশ্মীরের শ্রীনগরে, গুজরাটের জামনগরে এবং পশ্চিম বাংলায় কলাইকুণ্ডায় বিমান আক্রমণ করেছে।

সরকার পাঞ্জাবের জলন্ধর ডিভিসনে কোনও বিদেশীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

উত্তর প্রদেশ সরকার কারগিলের বীর যোদ্ধা মেজর এস. কে. মাথুরকে নগদ প্রায় ৭,৫০০ শত টাকা পুরস্কার দিয়েছেন।

ভারত সরকার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ছত্রীসৈন্যদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলেছেন।

দিল্লীতে ওয়াজিরাবাদ ব্রীজের নিকটবর্তী যমুনার ধারে কোনো অপরিচিত ব্যক্তির প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

পাকিস্তান সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশনের দুটি ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজকে করাচী বন্দরে আটক করেছে।

পাকিস্তানে ভারতীয় কূটনীতিকদের গতিবিধি সম্পর্কে বিধি-নিষেধ জারী করা হয়েছে।

পাক নৌ-বাহিনী গুজরাটে দ্বারকা বন্দরে আক্রমণ করেছে।

পাক নৌ-বাহিনী গুজরাটে ওখা বন্দরে হানা দিলে প্রতিরোধের জন্য ভারতীয় নৌ-বাহিনীকেও পাল্টা আক্রমণ চালাতে হয়।

লুধিয়ানার কাছে হালওয়ারা বিমান ঘাটিতে পাকিস্তান দুবার আক্রমণ করেছে।

ফিরোজপুর থেকে ৩০ মাইল দূরে জেরায় পাক-বিমানহানায় ৭ জন বে-সামরিক লোক নিহত হয়েছে। মোগাসার ডিভিসনে বোদেতেও বোমা বর্ষিত হয়েছে।

হোসিয়ারপুর এলাকায়, জলন্ধর, আদামপুর ও দাসাগেতে প্রচুর পরিমাণে ছত্রীসৈন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

শত্রু-বিমান বারাকপুর বিমান ঘাটিতে আক্রমণ করতে এলে, ভারতীয় বাহিনী প্রতিহত করে। শেষপর্যন্ত তারা পালিয়ে যায়।

ভারতীয় বিমান বাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন বিমান ঘাঁটিতে কয়েকবার সাফল্যপূর্ণ আক্রমণ করে এসেছে।

জম্মু শহরে পাকিস্তান দুবার বিমান হানা দিলে ভারতীয় বাহিনী তার প্রতিরোধ করে। দুটি পাক সাবার জেটকে ভূপাতিত করা হয়েছে।

গাজিয়াবাদ ও মীবাটে ছত্রীসৈন্যদের দেখতে পাওযা গেছে।

পাক বিমান যোধপুর বিমান ঘাঁটির উপর বোমা বর্ষণ করে গেছে।

পাক-বিমানহানায় ফিরোজপুর ক্যান্টনমেন্ট রেল স্টেশনের লোকো শেড ও ইয়ার্ডটি ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে।

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

ছাম্ব-জাউরিয়ান সেকটারে ভারতীয় বাহিনী শত্রু সৈন্যকে প্রতিহত ক'রে পর্যাপ্ত খাদ্য ছাড়াও, প্রচুর পরিমাণ সাঁজোয়া গাড়ি দখল ক'রে নিয়েছে।

ভারতীয় বাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে।

আখনুর এলাকায় নূতন করে পাক অনুপ্রবেশকারীদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

যেসব পাক হানাদার বাদগাম, তৌশিলে অনুপ্রবেশ করেছিল, ভারতীয় বাহিনীর ব্যাপক তল্লাশের ফলে এখন তারা উত্তর-পশ্চিমে গভীর অরণ্যের মধ্যে গিয়ে ঢুকছে।

ভারতীয় বাহিনী দুই দিক দিয়ে সাঁড়াশী অভিযান করে পাকিস্তানের মধ্যে ঢুকছে। (১) বারমার খণ্ডে রাজস্থান বারমার সীমান্ত পার হয়ে (২) শিয়ালকোট খণ্ডে জম্মু ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে আন্ত-র্জাতিক সীমানা পার হয়ে ভারতীয় বাহিনী হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু)এর দিকে অগ্রসর হতে হতে গাদরা দখল ক'রে নিয়েছে। এখন তারা কোহারপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

লাহোর খণ্ডে আমাদের জওয়ানরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। পাকিস্তান বার বার পাল্টা আক্রমণ চালালে, প্রতিহত ক'রে আমাদের জওয়ানরা তাদের তাড়িয়ে দেয়। শত্রুপক্ষের বিপুল ক্ষতি হয়েছে।

পাঞ্জাবে দু'জন পাক ছত্রীসৈন্যকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে এবং ৫০ জন গ্রেফতার হয়েছে।

শত্রুপক্ষের একটি সাবার জেট বিমান অমৃতসরের আকাশসীমার মধ্যে অনুপ্রবেশ করলে আমাদের স্থলবাহিনী গুলি বর্ষণ ক'রে বিমানটিকে তাড়িয়ে দেয়।

আদামপুর খণ্ডে চিরবে আরও ২৫ জন ছত্রীসৈন্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর বিমানটিকে শত্রুপক্ষের একটি বিমান গুলি চালিয়ে ভূপাতিত করে। কুচ এলাকায় এই ঘটনার পর, আক্রমণকারী বিমানটি পাকিস্তানের দিকে পালিয়ে যায়।

লাহোর খণ্ডে বারকি এলাকায় গ্রাণ্ড রোডের উপর ইছোগিল খালের একটি ফেরীকে ভারতীয় বাহিনী ভেঙে দিয়েছে।

ভারতীয় বিমান বাহিনী আকাশ-যুদ্ধে এফ বি এফ-৮৬ সাবার জেটকে ভূ-পাতিত করেছে। বারকি যুদ্ধে পাকিস্তান প্রথম ট্যাংক বিধ্বংসী ক্ষেপণ অস্ত্র ব্যবহার করেছে। ক্ষেপণ অস্ত্রটির গায়ে 'ন্যাটো'র ছাপ লাগানো আছে।

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

ভারত ও পাকিস্তান বৃহস্পতিবার ভোর ৩-৩০ মিনিট থেকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনে নিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী লোকসভায় বলেছেন, ভারতের যুদ্ধ-প্রধানদের যুদ্ধ-বিরতির কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

প্রেসিডেণ্ট আয়ুব একটি বেতার ভাষণে বলেছেন, পাক-বাহিনীকে যুদ্ধ-বিরতির আদেশ দেয়া হয়েছে।

চাইন্দা এলাকায় ভারতীয় বিমান বাহিনী ১২টি ট্যাংক ও একাধিক সাঁজোয়া গাড়ি বিকল করে দিয়েছে।

সমগ্র শিয়ালকোট রণাঙ্গনে ভারতীয় বাহিনী শত্রুপক্ষকে চারপাশ থেকে চেপে ধরেছে। ভারতীয় বাহিনী এগিয়ে যাচ্ছে।

হুসানিওয়ালা খণ্ডে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী শত্রুপক্ষের দুটো শেরম্যান দখল ক'রে নিয়েছে। দুটি ট্যাঙ্কই সচল আছে।

ফিরোজপুরে পাক-বিমান থেকে ৪টি রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছে। এখানে গোলাও ছোঁড়া হয়েছে।

আম্বালা ক্যাণ্টনমেণ্টে ক্যাথেড্রাল গীর্জার উপর পাক-বিমান গোলা বর্ষণ করে। দেড়শো বছরের পুরোনো এই গীর্জাটির উপর পাকিস্তান দুবার দু হাজার পাউণ্ড ওজনের বোমা ফেলেছে। ফলে ক্ষতি হয়েছে খুব।

বে-সামরিক অধিবাসীদের উপর পাকিস্তান দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে বোমা বর্ষণ করেছে।

ভারতীয় এলাকার ৭ মাইল অভ্যন্তরে তিনা বিড়ি চাঁদে দুটি পাক সাবার জেট প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ ক'রে গেছে। একটি গুরুদ্বারের ভীষণ ক্ষতি করেছে।

লাহোর এলাকায় একটি আকাশ-যুদ্ধে একটি পাক-বিমানকে ভূপাতিত করা হয়েছে। বারমারে গাডরা রোড ও গাডরা সিটিতে পাক-বিমান ৩ বার বোমা ফেলে গেছে।

ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল বাহিনী কুচবিহার সীমান্তের এপারে, আমাদের এলাকায়, গুলি চালিয়েছে।

৫টি সাবার জেটকে অমৃতসর জেলায় ভূপাতিত করা হয়েছে।

পাক-বিমান ৪৯ বার যোধপুর সিটিতে হানা দেয়। বোমা ফেলেছে মোট ১৫৯টা। শত্রুপক্ষ হাসপাতালেও বোমা বর্ষণ করেছে।

গঙ্গানগরের বিপরীত দিকে ভাওয়ালপুরে বিশাল পাক সৈন্যের সমাবেশ।

যুদ্ধবিরতির প্রাক্কালে ৩টি রণাঙ্গনেই ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানের একেবারে নিভৃত প্রদেশে ঢুকে পড়েছিল। শিয়ালকোট ও লাহোর খণ্ডে আমাদের জওয়ানরা যথাক্রমে ১৫ ও ৮ মাইল ঢুকে এসেছিল। এখন রাজস্থান খণ্ডে, পশ্চিম পাকিস্তান এলাকায় সিন্ধু প্রদেশে ভারতীয় বাহিনী প্রায় ৩০ মাইল দখল ক'রে বসে আছে।

যুদ্ধবিরতির কয়েক ঘণ্টা আগে পাক-বিমান অমৃতসরের বিভিন্ন এলাকায় বোমা ফেলেছে। প্রচুর হতাহত হয়েছে। এই ধরনের আক্রমণ যোধপুর ও গাডরাতেও চালানো হয়েছে।

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

যুদ্ধবিরতির কয়েক ঘণ্টা পরেই ট্যাঙ্ক সজ্জিত পাক-বাহিনী শিয়ালকোট-পাশুর রেল লাইনের কাছে, চায়িন্দা থেকে দু মাইল উত্তরে আসল নিয়ন্ত্রণ লাইন (actual control line) পার হয়ে ভারত অধিকৃত এলাকায় একটি

ঘাঁটি স্থাপন করতে চেষ্টা করে। ভারতীয় জওয়ানরা সতর্ক করে দিলে, হানাদাররা চম্পট দেয়।

পাক এলাকার বিভিন্ন খণ্ডে ভারতীয় বাহিনী যেখানে যেখানে ঘাঁটি গেড়েছিল, পাক হানাদাররা হামলা চালিয়ে হৃত ঘাঁটিগুলি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিল। ব্যর্থ হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি ভারতীয় বিমানবাহিনীর ৮ জন অফিসারকে বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্যে পুরস্কৃত করেছেন।

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

পাকিস্তান জম্মু ও কাশ্মীরে, রাজস্থানে একাধিকবার যুদ্ধবিরতি সীমা-রেখা লংঘন করেছে।

পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী ফিরোজপুরের উত্তর-দক্ষিণে ফাজিলকা এলাকায় জোর করে ঢুকে পড়েছে।

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

জয়সালমারের ২০ মাইল উত্তরে একটি এলাকায় ভারতীয় বাহিনী পাক হানাদারদের পিটিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

রাজস্থান সীমান্তে ভারতীয় সাঁজোয়া গাড়ির ওপর হানাদারদের গুলিবর্ষণ।

পূর্বখণ্ডে, ত্রিপুরার বাগলপুরের উপর পাক-সৈন্যবাহিনীর গুলিবর্ষণ।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

সুলাই মানকির উত্তরে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে পাক হানাদারদের সংঘর্ষ বাঁধে।

ভারত অধিকৃত শিয়ালকোট-পাশরুর রেল লাইনের ৫০ গজের মধ্যে পাক সৈন্যবাহিনী ট্রেঞ্চ ও বাঙ্কার নির্মাণ করছে।

একটি সময়ানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী

১

১১ই অক্টোবর, ১৯৬৫

পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী তিথ্‌ওয়াল খণ্ডে টাঙধব এলাকায় ভারতীয় ঘাঁটিগুলির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়।

মেন্ধাব এলাকায় পনেরো জন পাকিস্তানী হামলাবাজ নিহত হ'য়েছে।

নউসেরা খণ্ডে জানগড়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা জবরদস্তি ঢুকে প'ড়েছে।

শত্রুপক্ষ জাউরিআনের উত্তর-পূর্ব থেকে গুলিবর্ষণ করে।

শিয়ালকোট খণ্ডে চায়িন্দা এলাকায় পাকিস্তানী সৈন্যবা জববদস্তি ঢুকে পড়ে আজনালার উত্তরে ভারতীয় ঘাঁটির উপর গুলিবর্ষণ করে।

লাহোবখণ্ডে ইছোগিল খালের পূর্ব তীবে শত্রুপক্ষেব একজন টহলদাব অনুপ্রবেশ করে। খেম করণ থেকে সাড়ে চার মাইল পূর্বে রামুয়াল গ্রামে পাকিস্তানীরা অগ্নিসংযোগ করে।

পূর্ব প্রান্তে

আত্মনিযন্ত্রণাধিকারের দাবী ক'রে পূর্ব বাঙলায় দিন দিন বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে। একে চাপা দেবার জন্যে সরকারের তরফ থেকে চেষ্টার ত্রুটি হচ্ছে না।

কাশ্মীর

শ্রীনগরে সামান্য গোলযোগ। ভারতবিরোধী রাজনৈতিক দলের ৫ জন নেতা গ্রেফতার।

১২ই অক্টোবর, ১৯৬৫
যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন

লাহোর ও শিয়ালকোট খণ্ডে পাকিস্তানীরা হৃত ঘাঁটিগুলিকে পুনরুদ্ধারের জন্যে বার বার চেষ্টা চালাচ্ছে।

উরীর দক্ষিণ-পশ্চিমের একটি স্থানে শত্রুপক্ষ ভারতীয় টহলদারদের উপর গুলিবর্ষণ করে।

ভারতীয় সৈন্যবাহিনী মাণ্ডি শহর পুনর্দখল করে নিয়ে হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

.ন্দ করণের উত্তর-পূর্বে এবং বার্কির দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি এলাকায় পাকিস্তানী সৈন্যদের মাইন পাততে দেখা গেছে।

জালালাবাদের উত্তর-পশ্চিমে ও উত্তর-পূর্বে ভারতীয় ঘাঁটিগুলির দিকে লক্ষ্য করে পাকিস্তানী সৈন্যরা গুলিবর্ষণ করেছে।

আখনুর সেক্টর, আখনুরের কয়েক মাইল উত্তর-পশ্চিমের কয়েকটি নূতন ঘাঁটি দখল করে পাকিস্তানী সৈন্যদের মাইন পাততে দেখা গেছে।

রাজস্থানস্থিত বারমার থেকে প্রায় ৪৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সোজালে থেকে ভারতীয় সৈন্যরা পাকিস্তানীদের হটিয়ে দিয়েছে।

পূর্বপ্রান্ত

১৭৭

ফুলকুমারীতে বিনা প্ররোচনায় ভারতীয় সীমান্ত টহলদারদের উপর পাকিস্তানীরা গুলিবর্ষণ করেছে।

১৩ই অক্টোবর, ১৯৬৫

বার্কির প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে ইছোগিল খালের পশ্চিম ধার থেকে শত্রুপক্ষ ভারতীয় ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্য ক'রে গুলিবর্ষণ ক'রেছে।

শত্রুসৈন্যরা চায়িন্দার উত্তর-পূর্বে ভারতের এলাকায় প্রবেশ ক'রেছে

রাজস্থানে গাডরা রোডেব ২৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে কেলনর এলাকায় পাক সৈন্যরা গোলাবর্ষণ ক'রেছে।

ভারতীয় পুলিশ কেলনব থেকে ৪ মাইল পশ্চিমে রোজ ঘাঁটি থেকে অনুপ্রবেশকারীদের হটিয়ে দিয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের তিথওয়াল খণ্ডে টাঙধর এলাকায় ভারতীয় সৈন্যরা তিনটি প্রচণ্ড পাকিস্তানী আক্রমণকে প্রতিহত করেছে।

পুঞ্চের উত্তব-পশ্চিমে পাকিস্তানীবা কয়েকটি নূতন ঘাঁটি দখল ক'রে নিয়েছে।

পাকিস্তানী বিমান, সীমান্ত থেকে ২৬ মাইল দূরে জয়সালমাব জেলায় মরু অঞ্চলে ঢুকে বোমাবর্ষণ করেছে। তারা যুদ্ধবিরতি সীমা লংঘন করেছিল।

পূর্বপ্রান্ত

পূর্ব বাঙলাব জনসাধারণেব মধ্যে ক্রমশই অসন্তোষ বাড়ছে। এমন কী সামরিক বাহিনীর মধ্যেও তা বিস্তৃতি লাভ করছে।

১৪ই অক্টোবর, ১৯৬৫
যুদ্ধবিরতি চুক্তি লংঘন

পাকিস্তানী সৈন্য সিফন এলাকায় ভারতীয় সৈন্যদের উপর গুলিবর্ষণ করেছে।

বার্কি এলাকায় পাকিস্তানী সৈন্যরা **ট্যাঙ্ক থেকে গুলিবর্ষণ করে।**

চায়িন্দার উত্তর-পশ্চিমে পাকিস্তানীদের বাঙ্কার নির্মাণ করতে দেখা গেছে।

মেন্ধার ও জানগড়ে ভারতীয় বাহিনীর পাকিস্তানী সৈন্যদের সংগে সংঘর্ষ হয়েছে।

কারোণ, তিথওয়াল ও নউসেরা খণ্ডে ভারতীয় ঘাঁটিগুলির ওপর পাক সৈন্যবা গুলিবর্ষণ করে।

শিয়ালকোট খণ্ডে দু ডিভিসন পাক সৈন্য দখলীকৃত ভারতীয় এলাকায় প্রবেশ করেছে।

আখনুর খণ্ডে পাক সৈন্যদের মাইন পাততে দেখা গেছে। এই অঞ্চলে কয়েকটি নূতন ঘাঁটিও তারা দখল করেছে।

১৫ই অক্টোবর, ১৯৬৫
যুদ্ধবিরতি চুক্তি লংঘন

বার্কির দক্ষিণে ও বিডিয়ানের উত্তর-পূর্বে শত্রুপক্ষ গুলিবর্ষণ করেছে।

রাজস্থানের গাডবা শহর থেকে ২৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে কেলনার-নায়াতালা অঞ্চলে পাকসৈন্যবা ভারতের ঘাঁটিগুলির উপর আক্রমণ চালাচ্ছে।

বিডিয়ান এলাকায় ইছোগিল খালেব পূর্ব তীরে একটি ভারতীয় ঘাঁটির উপর পাকিস্তান গোলাবর্ষণ করেছে।

শিয়ালকোট সেকটরে রণবীরসিংপুরার পশ্চিমে পাকিস্তানীদের নূতন করে ট্রেঞ্চ খুঁড়তে দেখা যাচ্ছে।

হুসাইনিওয়ালার উত্তর-পশ্চিমে পাকিস্তানী সৈন্যরা ভারতীয় এলাকায় অনুপ্রবেশ করেছে।

১৬ই অক্টোবর, ১৯৬৫

লাহোর সেকটর, রাজস্থান এলাকায় এবং জম্মু ও কাশ্মীরের অন্যান্য সেকটরে শত্রুপক্ষ গুলিবর্ষণ করেছে।

শিয়ালকোট খণ্ডে চায়িন্দার উত্তর-পশ্চিমের একটি স্থানে শত্রুপক্ষকে ব্যাঙ্কার নির্মাণ ক'রতে দেখা গেছে।

বারমারে নয়াতালা ঘাঁটি থেকে পাক হানাদারদের হটিয়ে দেয়া হয়েছে। যুদ্ধবিরতি চুক্তির পরে তারা এই ঘাঁটিটি দখল করেছিল।

১৭ই অক্টোবর, ১৯৬৫
যুদ্ধবিরতি চুক্তি

পাকিস্থান কাবেন, উবী, পুঞ্চ, মেন্ধার ও রাজাউবী খণ্ডে, বিভিন্ন ভারতীয় ঘাঁটিগুলির উপর মর্টার ও মেসিনগান ছুঁড়ে নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা কবছে।

পাকিস্তানে

বেলুচিস্থানে উপজাতিরা পাকিস্তানী সামরিক শিবিরগুলিব উপব আক্রমণ করে প্রচণ্ড ক্ষতি ক'রেছে।

ভারতে

ভাবত সরকাব সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্যে সামরিক কর্মচাবীদের পুরস্কৃত করেছেন।

লাহোর খণ্ডে ভারতীয় ঘাঁটিগুলির উপর পাকিস্তানীরা গুলি চালায়।

পাক সৈন্যবা হুসানিওয়ালার উত্তর-পূর্বে ভারতীয় এলাকার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে।

তিথওয়াল, হাজিপীর, নউসেরা ও জানগড় খণ্ডে পাকিস্তানী সৈন্যরা ভারতের ঘাঁটিগুলির উপর গুলি চালায়।